

CHETANA LAHAR - Bengali Magazine of DAFODWAM
(Democratic Action Forum Of Dalits, Women & Minorities.)



একটি ত্রৈমাসিক বাংলা পত্রিকা

- অবহেলা যতদিন, সংরক্ষণ ততদিন
- শ্রেণী সংগ্রাম-শ্রেণী ঐক্য বজায় রেখে এস.সি., এস.টি. ও.বি.সি., সংখ্যালঘু, মহিলাদের অধিকার আন্দোলন গড়ে তুলুন
- সাম্রাজ্যবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদের কবল থেকে ভারতবাসীদের মুক্ত করুন
- উন্নয়নের বাহানায় অমানবিক উচ্ছেদ বন্ধ হোক
- বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ ঘটান

DAFODWAM thinks that India is a de facto upper caste Hindu state and Brahminism derived from MANU SMRITI is still the guiding philosophy of the Indian ruling classes. Until the abolition of the caste system and discrimination based on gender and community there is no chance of the victory of class struggle in whatever form.

Beside taking programmes of rights of Dalits, Women and Minorities (Religious and Linguistics) DAFODWAM is in the area of publication of books on concerned subjects in different languages without support from any foreign / Government(s) fund.

For Correspondence :

ananta acharya
DAFODWAM
30/2, N. P. Road, Kolkata - 700 055
West Bengal, India
Ph : (0) 9331858854

E-mail : dafodwam.dafodwam@gmail.com
chetanalahar@rediffmail.com

Exchange Price : 95/-

Exchange Price : 125/- (by Post)

Edited and Published by ananta acharya on behalf of DAFODWAM
30/2, N. P. Road, Kolkata - 700 055, and Printed at Sankhita Mudran - 4, D.P.S. Rd., Kolkata - 700 033



বর্ষ - ৬ • যুগ্ম সংখ্যা - জানুয়ারী ২০১৬ - জুন ২০১৬

Combined Issue CHETANA LAHAR

Year - 6, No. - 1 & 2

চেতনা
লাহর

— : সূচিপত্র : —

সংবাদকীয়

৩

পাঠ্য :

৫-১২৫

প্রাবন্ধিক—

আশ্বেদকর, পেরিয়ার, সুকুমারী ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য,
মনোরঞ্জন ব্যাপারী, আশীষ লাহিড়ী, সুনীল কুমার রায়,
গুরুপ্রসাদ কর, কণিক চৌধুরী, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প :

১২৬-১৭১

গল্পকার—

প্রতিভা মণ্ডল, সব্যসাচী গোস্বামী, দুলালকৃষ্ণ বিশ্বাস,
সমুদ্র বিশ্বাস, স্বপন বিশ্বাস

কবিতা :

১৭২-১৮৫

কবি—

স্মৃতিকণা হাওলাদার, মায়া ভট্টাচার্য, গৌতম আলি,
নিতাই নস্কর, গালিব ইসলাম, দীপঙ্কর সাঁতরা,
সৌগত চট্টোপাধ্যায়, অপূর্ব পাল, রঞ্জন চৌধুরী,
কিশোর বিশ্বাস, রুদ্র গোস্বামী, অনুপ মেটে,
জয়ন্ত মাহতো, সফল হালদার

কবিগান :

১৮৬

উত্তম সরকার

ছড়া :

১৮৭

ছড়াকার—

নবেন্দু রায়

প্রবন্ধ :

১৮৮-২৭৫

প্রাবন্ধিক —

মনোহরমৌলি বিশ্বাস, হর্ষবর্দ্ধন চৌধুরী, দিলীপ গায়েন,
তুহিন কুমার মৈত্র, নোরা মজদুর, দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল,
সুশান্ত কুমার, রৌণক রায়, অনন্ত আচার্য

সম্পাদকীয়

স্বল্পজনের আধিপত্য ভাঙতে হবে

যাঁরা সংরক্ষণ-এর পক্ষে বা বিপক্ষে কথা বলেন তাঁদের মধ্যে বিবাদ থাকলেও একটি বিষয়ে বেশ মিল পাওয়া যায়। উভয় পক্ষই সংরক্ষণকে সুযোগ (Chance) বা সুবিধা (Privilege) বা অধিকার (Right) বা দয়া (Favour) বা সহনুভূতি (Sympathy) হিসাবে দেখতে ভালবাসেন। ইতিহাস অনুসারে ৩-৩^১/_২ হাজার বছরের বর্ণভেদ ভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যবাদী সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বর্তমানের সংরক্ষণ ব্যবস্থা যে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক (Representation) সামান্য পদক্ষেপ মাত্র তা অনেকের ভাবনায় থাকে না। ইদানীংকালের রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র (Participatory democracy) শব্দবন্ধটি বহু আলোচিত যা আশ্বেদকর-এর পরিকল্পনার মধ্যেও ছিল। আশ্বেদকর আশাবাদী এবং আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন তবুও তাঁর সমাজকে ফিরিয়ে দাও (Pay back to the society) উপদেশটি তাঁর অনুগামীদের এক শতাংশও মনে রাখেনি। তদুপরি যখন ভারতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বেসরকারিকরণের ফলে দিনের পর দিন এত কমে আসছে যে সমস্ত সংরক্ষণপন্থীরা একযোগে আন্দোলন করলেও সামাজিক অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ১০ শতাংশের চাকুরি মিলবে না। শিকড়ের সাথে সম্পর্কহীন সামান্য কিছু পরগাছা মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে পারে যারা অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আঞ্জাবহ দাস ছাড়া কিছুই হতে পারবে না। রাজনৈতিক জগতেও একই অবস্থা। অবদমিত দলিত, আদিবাসী, ও.বি.সি., সংখ্যালঘু এবং মহিলাদের যে প্রতিনিধিগণ ক্ষমতার অলিন্দে যেতে পেরেছেন তাঁরা নিজ পরিবারে স্বাচ্ছন্দ এনে 'সাইনিং ইন্ডিয়া'য় ঢুকতে পেরেছেন কিন্তু 'অন্ধকার ভারত'-এর সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিল হয়েছে। স্বঘোষিত মার্কসবাদী বা

প্রসূতির প্রাপ্য

আত্মদেবকর

ভাষান্তর : উৎসাহ আহমেদ

আমি প্রসূতাবের প্রথম খসড়া পাঠ সমর্থন করতে চাই এবং সেটা করার জন্য তর্ক-বিতর্কে উদ্বৃত্ত কয়েকটি বিষয়ের উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছি। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলার সময়ে মাননীয় সাধারণ সন্য জানিয়েছেন যে, এটা কোনও দৃষ্টান্ত নয়—যে দৃষ্টান্ত আমরা কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ আইনানুসারে জানি। সুতরাং যে-সব মহিলা সুবিধা পাওয়ার যোগ্য, তাদের ক্ষেত্রে কর্মচারী ক্ষতিপূরণ আইনের নীতি প্রযোজ্য নয়। মহাশয়, আমি স্বীকার করি যে, এটা কোনও দৃষ্টান্ত নয়। কিন্তু সেটার ফল এই নয় যে, মহিলাদের জন্য অভিপ্রেত সুবিধাগুলি তারা পাওয়ার যোগ্য নয়। এই নীতি পুরোপুরি পক্ষপাতদুষ্ট। প্রসব-পূর্ব অবস্থায় মায়ের ওপর প্রভাব এবং পরবর্তীকালে শিশুর লালন-পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি বিশ্বাস করি যে, জাতির স্বার্থে প্রাক-প্রসবকালে এবং পরবর্তী সময়েও মায়ের কিছু পরিমাণে বিশ্রাম পাওয়া উচিত এবং এই প্রস্তাবের কর্মপন্থা সম্পূর্ণভাবে সেই নীতির ভিত্তিতে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, এর ভার মূলত সরকারের বহন করা উচিত। আমি এটা স্বীকার করতে প্রস্তুত, কারণ, প্রাথমিকভাবে জনতাহকর কার্যসাধনে সরকার-ই সংশ্লিষ্ট। যে-সব দেশে মাতৃত্বজনিত সুবিধাগুলি প্রবর্তিত হয়েছে, সে-সব দেশে, মাতৃত্বজনিত সুবিধাগুলির জন্য সরকারের ওপর কিছু পরিমাণ দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। এই রকম ঘটনা হলে যে-সব নিয়োগকর্তা স্বীলোকদের কাজে নিযুক্ত করে, স্বীলোকদের এই রকম সুবিধাদানের দায়িত্ব থেকে তারা একেবারে মুক্ত সেটা স্বীকার করতে আমি প্রস্তুত নই। কারণটা এরকম-ই। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, কোনও-কোনও শিল্পে একজন নিয়োগকারীর স্বীলোকদের নিয়োগ করার কারণ, পুরুষদের নিয়োগ করলে তার যে লাভ হয় তার থেকে বেশি লাভ হয় স্বীলোকদের নিয়োগ করলে। পুরুষদের নিয়োগের চেয়ে তার প্রাপ্য থেকে আনুপাতিক হারে অনেক বেশি উপকার পাবে সে স্বীলোকদের নিয়োগ করে। সেই কারণে যখন সে পুরুষের বদলে স্বীলোক নিয়োগ

৫ ৫২৫

সমাজবাদীদের অবস্থা আরও করুণাদায়ক। জাতভেদ ব্যবস্থা, বর্ণহিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বা পুরুষতান্ত্রিকতা এদের কাছে এতই গুরুত্বহীন বিষয় যে প্রতিদিনের কর্মসূচীতে যে এই সমস্যাসমূহলিকে বিরোধ করতে হয় তা এদের মাথায় থাকে না। ভারতের সমাজ ব্যবস্থা যখন প্রাক পুঁজিবাদী এবং নয়া ঔপনিবেশিক স্তরে আটকে আছে সেই জগদল পাথর ভেঙ্গে প্রাথমিক ধাপের গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করতে না পারলে আমূল সমাজ পরিবর্তনের লড়াই-এ প্রান্তবাসীদের নেতৃত্বদানের কোনও সম্ভাবনা দেখা যাবে না। 'শহুরে ভদ্রলোক'-দের হাত থেকে নীতি নির্ধারণের একচেটিয়া অধিকার কেড়ে নিতে হবে। হিন্দুত্ববাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের দুরত্ব যখন কমে এসেছে এবং এদের হাত ধরে স্বৈরতন্ত্র আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে তখন এদের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম যুক্ত মোর্চা তৈরি করা এখনই পবিত্র। ব্রাহ্মণ্যবাদ টিকে আছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আর্থিক শোষণ, আধুনিক ক্ষত্রিয়দের সামরিক শাসনে। রাষ্ট্রের অর্থ-অস্ত্রের সহযোগিতা ছাড়া আধুনিক ব্রাহ্মণ্যবাদ নির্বিষ সাপ মাত্র।

শ্রেণী শোষণকে অস্বীকার না করে জাতভেদ ব্যবস্থার ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শন + ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র প্রয়োগ + বৈশ্যের উদবৃত্ত মূল্য ভোগ) বিপক্ষে যারা নিয়মিত কলম ধরেছেন বা এখনও ক্লান্ত হননি, তাঁদের নাম তালিকাটি দাঁধ। ডি. ডি. কোসম্বী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, সুকুমারী ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যসহ অনেকেই রচনা আমাদের পথ দেখায়। জ্যোতি বা ফুলে, আত্মদেবকর, পেরিয়ার-এর শিক্ষাকে বিফলে দেওয়া যাবে না।

করে বিশেষ উপকার পাচ্ছে তখন এটা প্রকৃতই যুক্তিযুক্ত যে, প্রসূতির সুবিধাদানে অসন্তোষকে কিছু পরিমাণ দাখিল নিয়োগকারীর থাকবে।

অতএব প্রসূতি সংক্রান্ত সুবিধা বিষয়ে সরকারের ওপর কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত হলেও, আমি মনে করি যে, বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নিয়োগকারীর ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করতে চাওয়াতে এই একেবারেই কোনও ক্রটি হয়নি।

এটা বলা হয়েছে যে, এই প্রহর কেবলমাত্র কল-কারখানার প্রযোজ্য হবে এবং অন্য কোনও শিল্পে বা ক্ষেত্রে-মজুরদের ওপর প্রযুক্ত হবে না। এর উদ্ভূত অতি সংজ্ঞা। যে-সব শিল্পের অবস্থা এই রকম যে, সেই পরিকল্পনা স্বীকৃতিদের স্বাস্থ্যে প্রভাব বিস্তার করে, সেই সব শিল্পে এই সুবিধা প্রযোজ্য হবে। কল-কারখানায় নিযুক্ত ঠাঁলোকের যে-রকম বিপদের সম্মুখীন হতে হয় এবং তাদের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে, কৃষিকর্মে বা অন্য কোনও পেশায় নিযুক্ত ঠাঁলোকদের সেগুলি তেমন ভোগ করতে হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এই কারণে এই রকম আইন প্রণয়ন স্বাভাবিক ভাবে কেবল কল-কারখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। উদাহরণ হিসাবে একে-ই কথা বলা যায়, কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ আইন বিক্রে। একে-ই যুক্তিতে শ্রমিকদের কার্য-সময়ে দুর্ঘটনা হলে ওই আইন প্রযোজ্য হয় এবং আপনারা দেখেন যে, ওই আইনটি কল-কারখানায় প্রযোজ্য হয়।

এখন শিল্পের ওপর দায়িত্ব সম্পর্কে মাননীয় সাধারণ সদস্য বলেছেন যে, এতে মজুরি কমে যাবে। আমি নিশ্চিত নই যে, এর ফলে মজুরি কমে যাবে। যদি এটা কমেও, তার অর্থ হল শিল্পের ওপর থেকে দায়িত্ব কিছু পরিমাণে অন্যের সুরে যাবে। অতএব মাননীয় সদস্যর এই যুক্তিতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। এই প্রস্তাব গৃহীত হলে আমার নিবেদন, দায়িত্বটা সম্ভবত উপভোক্তাদের ওপর আরোপিত হবে এবং যদি এটাকে উপভোক্তাদের ওপর আরোপ করা হয়, উৎপাদিত বস্তুর অধিক মূল্য দিতে সমাজের পক্ষে আপত্তি করা উচিত নয়। যেহেতু এতে যারা উৎপাদন করে তাদের-ই উপকার হবে।

এই প্রস্তাব বোঝাই প্রেসিডেন্সিতে সীমাবদ্ধ রাখা অর্থোক্তিক এবং এই প্রস্তাবের সুবিধাগুলি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রযোজ্য হওয়া উচিত এবং ভারতবর্ষের অন্য প্রেসিডেন্সি ও প্রদেশে এই সুবিধাগুলি বোঝাই প্রেসিডেন্সির সমাবস্থায় থাকা উচিত। আমি মনে করি, যে-সব পরিবর্তন ঠাঁলোক আমাদের এই প্রেসিডেন্সির কল-কারখানায় পরিশ্রম করে, এই সভার উচিত প্রস্তাবিত সুবিধাগুলি তাদের দেওয়া।

নারী

পেরিয়ার

ভাষান্তর : দেবী চ্যাটার্জী

এখন নারীমর্যাদা কিছুটা উন্নতি লাভ করেছে। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত একজন পুরুষ যত খুশি সংখ্যক বিয়ে করতে পারত। সম্ভবতঃ ঐরূপ লোকেরা (রামায়ণের) দশরথের বা (মহাভারতের) কৃষ্ণের দ্বারা স্থাপিত প্রথাটির কথা ভাবছিলেন। দশরথের ছয় হাজার রাণী ছিলেন এবং কৃষ্ণ বহুসংখ্যক গোপিনীর সঙ্গে প্রেম ভাঙবাসা করেছেন।

কয়েক বছর আগে, এমনকি কোন পুরুষের যদি পাঁচটি স্ত্রী থাকতও, তাহলেও কিছু লোক তার বৃষ্টি স্ত্রী হওয়ার জন্য আর একটি মেয়েকে প্রদান করত। তখন স্ত্রীরা চাকরানীর চেয়ে খারাপ অবস্থায় ছিলেন। একজন চাকরানীর যেখানে খুশি যাওয়ার স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু একজন স্ত্রীর তাও ছিল না। যদি বাড়ির সদর দরজা খোলা থাকত, তাহলে পুরুষটি তার জন্য তার স্ত্রীকে ভর্তসনা করত। স্ত্রীর কাছে কোনো টাকা থাকার কথা ছিল না। স্বামী যদি দেখতে পান যে, স্ত্রীর কাছে কিছু নগদ টাকা আছে, তিনি কর্তৃত্বসুলভ ভাবে জিজ্ঞাস করবেন, “এ টাকা তুমি কি করে পেলে?”। কয়েক যা পেলেন এবং টাকাটা ছিনিয়ে নেন। এখন অবশ্য যে কোন স্ত্রী সাহস করে বলবেন, “আমি এটা আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি” বা “আমার মা এটা আমাকে দিয়েছেন।”

আগে কোন নারী তার বাপের বাড়ি এলে, তার ভাইয়ের বৌ তাকে আসার জন্য বকাবকি করত। এখন কেউ যদি কোন আপত্তি জানায়, নারীটি মুখের মত জবাব দেবে, “আমি আমার বাপের বাড়ি এসেছি। তুমি প্রশ্ন করার কে? আমার বাবার সম্পত্তিতে আমার অংশ আছে।” যে শাস্ত্র ও চিরায়িত প্রথাগুলি নারীদের নিম্ন মর্যাদা দিয়ে আসছিল, সেগুলির কী হয়েছে?

পৃথিবী ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে—উন্নতি লাভ করেছে। কয়েক বছর আগেও আপনি এধরনের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করতে পারার জন্য প্রস্তুত থাকতেন না। এখন লোকে বুঝতে পেরেছে কিসে কী হয় এবং এই ধরনের বিয়ে গ্রামেও

অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ ধরনের বিয়েগুলিকে আমরা উৎসাহিত করছি কেন? একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই প্রজন্ম ও ভাবী প্রজন্মগুলিকে, যে দাসত্বমূলক প্রথাগুলি আমার প্রজন্মকে অত্যাচারে আকর্ষণ করে রেখেছিল, তা থেকে মুক্ত করা।

কয়েক বছরের মধ্যে যে দম্পতির বিবাহিত হতে চান তারা আমাদেরকে লিখে জানান যে অত্যুক্ত অমূল্য দিনে তারা পরস্পরের জীবনসঙ্গী হতে যাচ্ছেন এবং আমাদের অকাঙ্ক্ষিত সেখানে তাদেরকে আশীর্বাদ করতে যেতে হবে। এখনও আমি সে ধরনের নিমন্ত্রণ পাচ্ছি।

আজকের মেয়েরা তাদের সঙ্গী বেছে নেওয়ার মত প্রগতি লাভ করেছে। যদি কোন মেয়ের বাবা বলেন যে তিনি তার মেয়ের জন্য অমূল্য যুবককে বেছেছেন, মেয়েটি মুখের উপর জবাব দেবে, "আমি নিজের জন্য উপযুক্ত বর বেছে নিতে পারি। তোমাকে এ নিয়ে ব্যামোলা করতে হবে না।" পাশ্চাত্যদেশীরা তাদের ছেলে বা মেয়ের জন্য পাত্র বা পার্শী দেবে না। যুবক-যুবতীরা নিজেদের সঙ্গী বেছে নেয়।

জ্যোতিষীর সাথে পরামর্শ করা, লক্ষ্য দেখা, দেবতার উপর ফুল চড়ানো বা কোন ধানি থেকে ফুল তুলে নেওয়া — এগুলি হচ্ছে কিছু পুরনো প্রথা যা এখনো চলছে। এই প্রথাগুলি অমর্যাদাকর। কত যত্ন করেই না আমরা পশুদের জুড়ি মেলাই। যদি আমাদের গরুর পাড়ির একটা বলদ থাকে, তাহলে অনেক কষ্ট স্বীকার করেই আমরা আরেকটা বলদ বাছি যাতে আমাদের পরিবারে ছেলে বা মেয়ের জুড়ি মেলাতে আমরা একজন ব্রাহ্মণের সাহায্য চাই কেন? যুবক-যুবতীদের মেলামেশা করতে বা পরস্পরকে জানতে না দিয়ে, আমরা কি করে ঠিকজি কোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত হতে পারি?

বিবাহেচ্ছু কোন যুবকের যদি কোষ্ঠী না থাকে, তাহলে জ্যোতিষী তথা হস্তশ্রেণাবিদ তার হাতের তালুর রেখা দেখতে শুরু করেন। এই পদ্ধতিকে আমরা কি করে মেনে নিতে পারি? তারপর জ্যোতিষী যুবকটিকে একটা খুলি থেকে একটা ফুল বাছতে বলেন ও বাছ ফুল থেকে তার ভবিষ্যত নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকেন। এই ১৯৫৬ সালেও লোকে নিজেদের এত নির্বোধ বলে দেখাবে কেন?

১৭৭৭ খ্রিঃ প্রথাগুলির ব্যাপারে ও বিবাহ করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দাম্পত্য-পণ্য ব্যাপারে আমাদের সমাজে কিছু জাগরণ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণ না গুলো, পুরোহিতরা এগিয়ে আসত এবং যোগ্য করতে যে, ওরকম আত্মমর্যাদার পণ্যও বাতিল। দাস্তবিকপক্ষে, কয়েক বছর আগে হাইকোর্ট নিজেই ঘোষণা করেছিল যে, চিরায়িত প্রথা (যেগুলোকে মনে করা হয় নারাদার, বিয়াসার ও পাশপের সাধুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) অগ্রাহ্য করে হওয়া আত্মসম্মানের বিবাহগুলি খারজ। কেউই নিশ্চিত নয়, তবে নারাদার জীবিত ছিলেন, কিন্তু তথাপি, তাঁর মৃত্যুও, বা তাঁর মৃত্যুও হলে যা করা হয়, তা স্বজাতির হাজার বছর ধরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আত্ম-মর্যাদার বিবাহ অবলম্বন করা থেকে আটকাবার জন্য নানা পদ্ধতিতে চেষ্টা করেছে কিন্তু তবুও ওরকম বিয়ে হয়ে চলেছে।

যখন নারীদের সম্পত্তির অধিকার মঞ্জুর করার আইনের বসড়া পার্লামেন্টে আলোচনার জন্য আসে, তামিলনাড়ুর সদস্যরা তার বিরোধিতা করেননি। তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণদের উদ্ভাবনী পেরে কিছু উত্তর ভারতের সদস্য তার বিরোধিতা করেন।

এখনো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে আমাদের সমাজকে উন্নতি করতে হবে। বর্তমানে কর্মে নিযুক্ত নারীদের শতাংশ খুবই কম। আমরা যদি ক্রমতায় আসি, তাহলে পুরুষদের কাজ দেওয়া হবে না — কিছু সময়ের জন্য, এমন একটা আদেশাঙ্ক জারিও হতে পারে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে নারীদের টাইলি হিসেবে নিয়োগ করা হয়, ওখানে সম্পূর্ণ নারীচালিত বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু এখানে, আমাদের নারীরা প্রধানত কৃষি সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত হন, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ মহিলাদের অফিসে নিযুক্ত করা হয়। এটা কী ধরনের যুক্তিসঙ্গত হয়?

এই ধরনের বিবাহগুলির লক্ষ্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। আমাদের সমাজের উপর এক সম্ভাব্য প্রাধান্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য যখন আমরা কোন কার্যকলাপে রত হই, তখন আমাদের নারীদেরই উচিত সর্বপ্রথমে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া। আমাদের নারীরা অনুরাগ কাজগুলিকে সহজে অনুমোদন করেন না। আমি বলি যে, এরপর থেকে নারীরই অনুরাগ কার্যকলাপকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এমনকি পুরুষেরা

উদাসীন থাকলেও।

সমস্ত নারীকে শিক্ষিতা হতে হবে এবং আমাদের সমাজে যে কুসংস্কারমূলক বিশ্বাস ও প্রথাগুলিকে দেখতে পাওয়া যায় তারা মূলোচ্ছেদ করার জন্য তারা তাদের জ্ঞানশিক্ষাকে কাজে লাগাবেন। কিছু লোক মনে করেন যদি কোন বিড়াল বা ব্রাহ্মণ আমাদের রাস্তা কাটে, তাহলে তা একটা কুলক্ষণ এবং তাই আমাদের অবশ্যই আর এগোনো উচিত নয়। এধরনের কুলক্ষণে বিশ্বাস করেন? যখন আমরা একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি, তখন আমরা কি করে আমাদের যাত্রা থামাবো, যদি ট্রেন বা বাস খুবই অশুভ সময়ে অর্থাৎ 'মরণযোগ্য'-এ চড়ে? যদি কুড়ি হাজার টাকার এক মামলায় আমাদের আদালতে যাওয়ার থাকে আর আমাদের যাওয়ার সময়ে যদি 'রাহ কালাম' পড়ে, তাহলে আমরা কি যাওয়া বাদ দেব? এমন কি আমরা যদি পায়ে চোটে পাই, কোর্টে যেতে গিয়ে তাহলেও আমরা আঘাতের শুশ্রূষা করব কেবলমাত্র সময়মত কোর্টে উপস্থিত থাকার পরই। এখনো লোকে মনে করে মঙ্গলবারে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করা উচিত নয়, তারা তাদের যুক্তির তর্কের ক্ষমতাকে মেরে দেয়, এমন সমস্ত নির্বোধ ধ্যানধারণাকে বর্জন করা উচিত।

দম্পতিদের উচিত পরস্পরের প্রতি বন্ধুর মত হওয়া। পুরুষ হওয়ার কারণেই পুরুষের প্রভুত্বমূলক অবস্থান ধারণ করা উচিত নয়। তিনি স্নেহশীলভাবে শুরু করলে তার স্ত্রীর কাছ থেকে যতখুশি কাজ পেতে পারেন, তমকি দিয়ে নয়। প্রতি পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্নেহশীলতা যদি বিরাজ করে তাহলে পৃথিবীতে সুখের প্রাচুর্য হবে। জীবন স্নেহে পূর্ণ থাকা উচিত; সব সময়েই কারুর না কারুর সাথে ঝগড়া করে কী হবে? যদি নারীদেরকে সংশোধন করতে হয়, তাহলে পুরুষদের এক ভদ্র, শান্ত প্রক্ৰিয়া অবলম্বন করতে হবে। দম্পতির মধ্যে এই চিন্তার বিকাশ ঘটতে হবে যে তাদেরকে অন্যের প্রতি সেবাপরায়ণ হতে হবে। হিন্দুধর্ম লোকের মধ্যে স্বার্থপরতা ঢুকিয়ে দিয়েছে এই শিক্ষা দিয়ে যে প্রত্যেককে তার নিজের মুক্তির জন্য কাজ করতে হবে। খাড়-ঝাড়ুদাররা কি কেবল নিজেদের জন্য কাজ করে? অন্যেরা আমাদের উপকারার্থে কাজ করেছে এই উপলব্ধি আমাদেরকে অন্যের জন্য কাজ করতে প্রবৃত্ত করবে। এভাবেই আমরা প্রশস্তমনা ধ্যান-ধারণা গড়ে তুলতে পারি।

এই বিষয়ে পাশ্চাত্যবাসীরা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করার মত দৃষ্টান্তসমূহ

যোগায়। তারা অন্যের প্রতি কোন অসুবিধার সৃষ্টি করবে না। কেউই আত্মীয়ের বাড়িতে অতিথি হিসেবে রাত সাড়ে দশটার পর যাবে না, আর উৎপাত হয়ে উঠবে না। এমনকি মেয়েও মা-র বাড়িতে হঠাৎ খবর না দিয়ে হাজির হবে না। অন্যের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে এই উদ্বেগ আমাদের দেশে দুর্লভ। যখন একটা ভীড় বাসে চড়ার জন্য অপেক্ষা করছে তখন গাড়িটি পৌছনো মাত্র, একজন গুন্ডাধরনের লোক সবাইকে ঠেলে সরিয়ে দেবে এবং নিজে বাসে চড়ে যাবে। আমাদের দেশে লোক আছে যার ঐরূপ ব্যক্তিকে তার বাসে চড়ার দক্ষতার জন্য অভিনন্দন জানাবে।

যে যে-পরিবারভুক্ত, সে সেই পরিবারের আর্থিক অবস্থান যা-ই হোক না কেন, খরচ খরচাকে আয়ের সীমার মধ্যে রাখা উচিত। সাধারণ আয়ের একজন নারীর পক্ষে ঘনী নারীর মত সাজতে ইচ্ছা করা ও খুবই দামি শাড়ি চওড়া খুবই অনীতিনিষ্ঠ কাজ। যখন লোকে অন্যের কাছ থেকে টাকা ধার করে, তখন তারা একটু থেমে ভাবে না, স্বপদাভা লাভবান হয় না কি তাদের নিজেদের চরিত্র ধার করার ফলে উন্নত হচ্ছে।

পরিশেষে, আমি বিবাহিত তরুণদের প্রতি এই উপদেশ দিতে চাই যে, তারা যেন অবিবেচকের মত বেশি সন্তান জন্ম না দেন। বিবাহের পাঁচ বছর পর প্রথম সন্তান জন্ম দেওয়াটা ভাল। আপনি যদি বেশি ভাড়াভাড়ি সন্তান পান, তখন আপনি স্ত্রীর যত্ন নেবেন না সন্তানের যত্ন নেবেন? অতিরিক্ত সন্তান মায়ের স্বাস্থ্য নষ্ট করে দেয়। আট বছরে যদি দশটি সন্তান জন্মায়, পিতামাতারা কী করে তাদের শিক্ষা দেবেন? কী করে চিকিৎসার ব্যয় বহন করবেন এবং মোটামুটি আরামে জীবনযাপন করবেন?

যখন একটি শিশু জন্মায় তখন লোকে তাকে ঈশ্বরপ্রদত্ত বলে। যদি কোন বিবাহিত নারীর কোন সন্তান না থাকে তখন সে এবং অন্যেরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যাতে তার গর্ভে একটা কীট রেখে দেওয়া হয়। সামান্য ভাবলেই এ সমস্তই ভুল মনে হবে।

(২৬.৬.৫৬ তে বনাসেরিতে এক বিবাহে পেরিয়ার প্রদত্ত বক্তৃতা। ৭.৯.৫৬ তারিখে নিম্নখালহিতে প্রকাশিত)

রোকেয়া

সুকুমারী ভট্টাচার্য

দুটি আন্দোলন : নারীর উন্নয়ন ও সাম্প্রদায়িকতা দূর করা, আজকের সমাজে এ-দুটি যথার্থভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। এ দুটিরই শুরু করেন রোকেয়া প্রায় একশো বছর আগে।

নিজের জীবনে রোকেয়া পেয়েছিলেন অনেক, আবার পাননিও অনেক কিছু। প্রাচুর্য, শিক্ষালাভের সুযোগ, ইচ্ছামত কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হওয়ার সুযোগ—এসব তখনকার দিনে দুর্লভ ছিল, অথচ রোকেয়া এ-সবই যথেষ্ট পরিমাণে পেয়েছিলেন। তিনি এ সুযোগের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি ধনী শৌখিন সামাজিক নারীর মত সাজসজ্জা, সামাজিক আমন্ত্রণসভা, পার্টি, উৎসব, ফুটি ইত্যাদিতে সময় কাটাতে পারতেন; তাঁর সমকালীন বহু ধনী পুঁহীনীই তা-ই করতেন। কিন্তু রোকেয়ার অন্তরে যে অনির্বাক্য দীপশিখাটি জ্বলত, তা ছিল জ্ঞানার্বেষণের এবং জ্ঞানবিতরণের। তাই ব্যক্তিগত সুখ-স্বচ্ছন্দ্যকে গোঁণ করে তিনি বাল্যে, কৈশোরে কিছু বাধা অতিক্রম করেও প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন; যৌবনে স্বামীর পূর্ণ সাহচর্যে নানাবিধ জ্ঞান আহরণ করে চিত্তের বিকাশ ঘটান। তাঁর নিজের অন্তরলোকে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হতে থাকে।

এই সময়েই তিনি অবহিত হন যে, মুসলিম সমাজের সাধারণ নারী জনের জগতের সীমানার কতটা বাইরে, শুধুমাত্র ভোগের জীবন যাপন করেন সে বিষয়ে। এর প্রতিকারের জন্য তিনি দুটি অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন। প্রথমত নিজের সমাজে কন্যাদের মধ্যে জ্ঞানের আলোক বিকিরণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তাঁর প্রয়াত স্বামীর নামে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল স্থাপন করেন। দুটিটি আজও কলকাতা শহরের উন্নতমানের স্কুলগুলির মধ্যে একটি। দ্বিতীয়তঃ শগুনে নগণ্য ছিল, কিন্তু রোকেয়ার আন্তরিক সদিচ্ছা ও নিরন্তর উদ্ভাসিত পরিশ্রমে ধীরে ধীরে স্ত্রীসংখ্যা বাড়তে বাড়তে এটি ক্রমে একটি প্রতিষ্ঠাপন স্কুলে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক বছর স্কুলের জন্য তিনি শুধু নিজেই অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বোধ সৃষ্টি করেন। বিগত সময়ের

সুকুমারী ভট্টাচার্য

দিয়েই তিনি এ-কাজে অগ্রসর হন। সমাজে পশ্চাদ্ঘূর্ণন যে শক্তি ছিল যা সব সমাজেই থাকে—তার প্রতিকূলতা ও উগ্র বিরুদ্ধতার সামনে রোকেয়া কোনদিন হার মানেননি; কখনো কোনো অন্যায় দাবির সঙ্গে তিলমাত্র আপোস করেননি। সেসময়ে একটি অনুন্নত সমাজের নারীর পক্ষে এটি একটি বিশ্বাসকর সাহসিকতা। রোকেয়া বুঝেছিলেন যে, জ্ঞান শুধু চিত্তকে আলোকিত করে তাই নয়, বহু যুগের সঞ্চিত কুসংস্কার যা জগদ্বল পাথরের মত সমাজের অগতির পথ রোধ করে তাকে সরাবার শক্তিও দেয়। এতে যে শুধু সাখাওয়াত স্কুলেরই উন্নতি হয়েছিল তা নয়, মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষার জন্য ভূষণ ও আগ্রহ বেগেছিল। এর প্রভাব সুদূর প্রসারিত হয়; ক্রমে ক্রমে গ্রামে ও নগরের উপকণ্ঠে মুসলিম নারী শিক্ষার ছোটবড় প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়। এতে মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষার বিস্তার হয়, এবং সেটা পুরুষের জলে ঢিল ফেলার মত ভরসের পর সাখাওয়াত-তার ভরসে বিভ্রত হতে থাকে, ছোটবড় নানা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। আজকে এর বিশ্বাসকর সার্থকতা যথার্থভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তখন মুসলিম কৈশোরী বা তরুণীর বিদ্যাশিক্ষা সাধারণ মানুষের কল্পনার বাইরে ছিল; অনুমোদনেরও। রোকেয়া এই জগদ্বল পাথর সরিয়েছিলেন; যদিও আরও কিছু সদিচ্ছবান মানুষ তাঁকে সমর্থন করেন, তবু প্রধান উদ্যোগ এবং একনিষ্ঠভাবে লেগে থাকা ছিল তাঁরই কাজ। সমস্ত সামাজিক বাধা অতিক্রম করে তিনি একাজে এতী হন। সার্থকও হন।

আর বাধা কি একরকমের? কোরান উদ্ধৃত করে নারীর বিদ্যাশিক্ষা পাণ বলে প্রমাণ করা, পুরুষের অধীন থাকবে যে নারী, শিক্ষা তাকে সীমাহীন স্বাধীনতার পথ দেখাবে, সংসারে স্বামী স্বত্তর শাওড়ি তরুণের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখানোর স্পৃহা চলে যাবে শিক্ষার ফলে, ইত্যাকার, নানা বাধা একে একে দেখা দেয়। রোকেয়া দৃঢ়চিত্তে এগুলির খণ্ডন করেন। তাঁর স্কুলে নারীর শিক্ষা অব্যাহত থাকে। এই অনমনীয় মনোবল তাঁকে প্রবল বিরোধিতার সঙ্গে আপোস করতে দেয়নি।

প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান ছাড়াও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন গ্রন্থ রচনা করেও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর স্বপ্নকে রূপ দেন। সেগুলির মধ্যে প্রধান হল : মতিচূর

(দু'খণ্ডে), পদ্মরাগ ও অবরোধবাসিনী। বিখ্যাত সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থটি প্রথমে ইংরেজিতে লিখে পরে বাংলায় অনুবাদ করেন। তেমনই Ideals for the Modern Indian Girls, নিকজটিও তিনি পরে বাংলায় অনুবাদ করেন। এছাড়া তেত্রিশটি রচনা আছে যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। আর আছে পত্রাবলী, সেও সংখ্যায় বেশ কটি। সক্রিয় কর্মকাণ্ডেরই পরিপূরক; তিনি কী ভেবে কাজ বিম্বয়কর। লেখাগুলি অবশ্য কর্মকাণ্ডেরই পরিপূরক। ছোট ছোট গল্প সাংসারিক, করতেন অনেকটা তাই-ই প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু। ছোট ছোট গল্প সাংসারিক, সামাজিক সমস্যা ও সেগুলির যুক্তিসঙ্গত সমাধানই প্রধানত মতিচূরের দু'খণ্ডের গল্পগুলির উপপাদ্য। এগুলির মধ্যে দিয়ে রোকেয়ার সমাজ সচেতন মনটি ধরা পড়ে। সমাজের সমস্যা তিনি শুধু শব্দবচন দিয়ে সমাধান করবার চেষ্টা করেননি। সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানবিক বোধ ও যুক্তিবিচার দিয়ে সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে চেয়েছেন। রোকেয়াকে বুঝতে গেলে তৎকালীন পর্দানবীল মুসলিম নারীসমাজ, এ সম্বন্ধে নানা ধর্মীয় ও পারিবারিক নিষিদ্ধিবেশকে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে যে, প্রতিভুলতা শুধু পুরুষের থেকেই আসেনি, এসেছিল সংস্কারাজ্ঞার নারীদের কাছ থেকেও এবং সম্মুখসমরে না গিয়েও মানবিক আগ্রহেণ ও যুক্তির দ্বারা তিনি সমস্যাগুলির সমাধান করেন।

রোকেয়া সর্ব অর্থেই একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর প্রাপ্ত সাহচর্য যতটাই হোক, তিনি সমাজকে দিয়েছেন অনেক বেশি। তৎকালীন শতকে নারী আন্দোলনের সূচনাও এই নারীর কৃতিত্ব। সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক সমাজচেতনায় রোকেয়া তাঁর রচনাগুলিতে বিকশিত করেন। গেমস গোষ্ঠীর যুগে খুব কম হিন্দু নারীই সমাজসংস্কারে এমন নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। না তাঁর এক বৈশিষ্ট্য। যে কোন যুগেই এ-ধরনের একটি শিক্তিও মন, সংযুক্তি ও সংজ্ঞারমুক্ত মন সমগ্র নারীসমাজের উজ্জলপ্রাণের গৌরব, আর উল্লেখ্য না-এ-ধরনের মুসলমান সমাজের পরিত্রাণকর্তা এটি একটি পরম গৌরবের গম।

চয়ন শুক্ল-না-না

কৃতজ্ঞতা। দীর্ঘা-না-না

পানায়ণের অযোধ্যা : ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইউটেপিআ

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

গামগান্ধার কথা সবাই জানেন। 'হুমানে'র স্বপ্ন' গল্পটির গোড়ার পরভাগে পানায়ণ গিয়েছেন। চোদ্দো বছর কন্যাস আর সীতা উজ্জ্বলের পর রাম ফিরে আসেন স্বদেশে, ভরতের হাত থেকে তুলে নিলেন রাজ্যভার। তারপর

রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতভাবে রাজ্যশাসন ও অপতানির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কোশলরাজ্য শান্তির ও স্বাধিকারের নিয়ম ইহা, প্রজার গৃহ ধনধান্যে ভরিয়া উঠিল, তদ্বার, বক্ষক ও পণ্ডিতমূর্ত্তগণ বৃদ্ধিশেষেই পলায়ন করিল। দেশে আরও পীড়িত নাই, ধর্মবিকরণে বানী প্রতিবাদী নাই, কারাগার জনশূন্য। ভিষগণ রোগীর অভাবে ভোগীর পরিচার্য্য নিযুক্ত হইলেন, বিচারকগণ পরম্পরের বিরুদ্ধে মতানৈক্যে ইত ইয়া অবসরবিনোদন করিতে লাগিলেন।

কথাগুলো অবশ্যই চট্টা করে লেখা; বাল্মীকি-রামায়ণ-এ রামরাজ্য-র বর্ণনা অন্যরকম। যুদ্ধকাণ্ড-র শেষে সেখানে বলা হয়েছে :

রামের রাজ্যকালে কেনও দ্বী বিধবা হয়নি, হিংস্র জন্তু ব্যাধি দস্যুর ভয় ছিল না, বৃদ্ধকে আর ব্যাকের আশ্রয়দিক্রিয়া করতে হত না। সকলে আনন্দচিত্তে বহু পুত্র সহ সহ বৎসর জীবিত থাকত। বৃদ্ধ প্রচুর পুত্র ফল মূল উৎপন্ন হত। রামরাজ্যের সকল প্রজা নিজ নিজ কর্মে তুষ্ট, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও সুলভসম্পন্ন ছিল। (রাজশেখর বসুর তর্জমা)

রামরাজ্য এক ধরনের সব-পেয়েজি দেশ, ইউটেপিআ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতি ইউটেপিআ-র প্রতিশব্দ করেছিল 'রামরাজ্য'। তবে এই প্রতিশব্দটি কেউ ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে হয় না। সে যাই হোক, যুদ্ধকাণ্ড-য় রামরাজ্যের বর্ণনা বড়ই সংক্ষিপ্ত। সে তুলনায় ব্যাংকাণ্ড-র গোড়ার

দশরথের আমলে অযোধ্যা নগরীর একটি বিস্তৃত বিবরণ আছে। সেটিকেই বরং প্রাচীন ভারতের একটি ইউটোপিয়া বলে ধরা যায়। নিচে তার পুরোটিই তুলে দিচ্ছি :

‘সেই সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যাপুরীতে বেদ-বেদাঙ্গবিৎ, দুরদর্শী, বীর, বিধবৃন্দের সংগ্রহকর্তা, মহাতেজস্বী, পুরবাসী ও জনপদ-বাসী জনগণের অতিশয় প্রিয়-পাত্র, ইক্ষাকুগণের মধ্যে অতিরথ, দশরথ নামে যজ্ঞশীল, ধর্মপরায়ণ, মহর্ষি সদৃশ, ত্রিলোক-বিশ্রুত রাজর্ষি ছিলেন। তিনি বলবান, নিঃসপত্ন, মিত্রযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি ধনধান্যসম্বন্ধে দেবরাজ ও কুবের তুল্য ছিলেন। বৈবস্বত মনু যেরূপ জগৎ পালন করিতেন, তিনিও সেইরূপ জগতের পালক ছিলেন। সেই সত্যনিষ্ঠ রাজা দশরথ, ধর্ম-অর্থ-কাম-রূপ ত্রিকর্গসাধনের নিমিত্তই সেই অযোধ্যাপুরী দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অমরাবতী পুরী পালন করেন, সেইরূপ প্রতিপালন করিতেন। সেই শ্রেষ্ঠ নগরীতে সমুদায় লোকই বাসসুখে প্রীত ছিল। সকলেই ধার্মিক, বহুজ্ঞ, স্ব স্ব সম্পত্তিতে পরিতুষ্ট থাকিত। তাহার লুপ্ত ছিল না এবং সত্যপরায়ণ ছিল, কোন কুটুম্বী গৃহস্থই অল্পসম্বন্ধী ছিল না। যে গৃহস্থের গো, অশ্ব, ধনধান্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য ছিল না, তাহার ঐহিক পারত্রিক কামনা সিদ্ধ হয় নাই, সেইরূপ গৃহস্থ ঐ নগরীতে ছিল না। কামপরায়ণ, স্বজনপীড়ক, নৃশংস, মুর্থ বা নাস্তিক মানব সেই পুরীতে কদাচ দেখা যাইত না। সকল নরনারীই ধর্মশীল ও জিতেন্দ্রিয় ছিল, এবং সকলেই মহর্ষিদিগের ন্যায় নিঃস্বলম্বভাব ছিল। সকলেই কুণ্ডল, কীরীট ও মালা ধারণ করিত, সকলেই মৃষ্ট [মধুর] ভোজ্য ভোজন করিত, পরিচ্ছন্ন থাকিত, এবং শরীরে চন্দনাদি বিলেপন করিত। অঙ্গদ, নিম্ব ও করাভরণ সকলে ব্যবহার করিত। সকলেরই অন্ত্যকরণ উজ্জ্বলতা-বিহীন ছিল। সকলেই সাগ্নিক ও যজ্ঞদীক্ষিত ছিল, রাজ্যমধ্যে কেহ নীচ, সদাচারহীন বা বর্গসম্বন্ধ ছিল না। ব্রাহ্মণগণ জিতেন্দ্রিয়, আত্মকর্ম্মরত, দানাদায়নপরায়ণ ও প্রতিগ্রহবিষয়ে সংযতচিন্ত ছিলেন অর্থাৎ অসংপ্রতিগ্রহ করিতেন না। কেহই নাস্তিক, মিথ্যাবাদী, সামান্য শিক্ষিত, অসুয়াপরায়ণ ও ব্রতাদি-কার্য্যবিহীন ছিলেন না। সকলেই যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন করিতেন, কেহই দরিদ্র, ক্ষিপ্ত বা ব্যথিত ছিল না। নর বা নারী কেহই রূপলাবণ্য-বিহীন বা কুশী ছিল না, রাজভক্তির বিরুদ্ধে কাহারও মনের ভাব লক্ষিত হয় নাই। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্গই দেবতা ও অতিথির অর্চনা

পরায়ণ ছিলেন, অধিক কি, সকলেই কৃতজ্ঞ, উদার ও বীরাগ্রগণ্য ছিলেন। সকলেই দীর্ঘজীবী এবং ধর্ম ও সত্যাবলম্বী ছিলেন, কাহারও অকালমৃত্যুর হস্তে পতিত হইতে হয় নাই। পুত্র, পৌত্র ও কলত্র লইয়া সকলে সুখে কালযাপন করিত। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের অনুবৃত্তি করিত; এইরূপে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসেবায় নিযুক্ত থাকিত। যেরূপ প্রজাপতি বৈবস্বত মনুর হস্তে পূর্বে এই রাজধানী সংরক্ষিত হইয়াছিল, ইক্ষকুনাথ দশরথও তাঁহার ন্যায় ইহার শাসন করিয়াছিলেন। সিংহ দ্বারা পর্বতের ওহা যেরূপ পূর্ণ হয়, সেইরূপ এই রাজধানী অশ্বত্থা তেজস্বী, অসহিবু, সরলম্বভাব, ধনুর্বিদ্যাপারদর্শী বীরগণে পরিপূর্ণ ছিল। সেই পুরী, কাশ্যোজ-বাহ্লীক-বনায়ু ও সিদ্ধদেবজাত উৎকৃষ্ট অশ্বে পরিপূর্ণ থাকিত; এইরূপ বিদ্যাপর্বতজাত, হিমালয়োৎপন্ন, পর্বত সদৃশ মদমস্ত্র মাতঙ্গে অযোধ্যা সুরক্ষিত থাকিত। ঐরাবত, মহাপদ্ম, অঞ্জন ও বামনবংশপ্রসূত ভদ্রমন্দ, ভদ্রমৃগ ও মৃগভদ্র নামক সম্ভর হস্তিতে ঐ পুরী সমাচ্ছন্ন থাকিত। সকল মাতঙ্গ মদোন্মত্ত এবং পর্বত সদৃশ; কেহ এখানে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, এই নিমিত্ত ঐ নগরীর নাম অযোধ্যা হইয়াছিল। যদিও বিস্তারে উগ্র তিন যোজন মাত্র, কিন্তু দুই যোজনের মধ্যে কেহ যুদ্ধ করিতে সাহসী হইত না। তারাপতি যেরূপ তারকাদিগকে শাসন করেন, তাহার ন্যায় শত্রুবিমর্দন ইক্ষকুনাথ নৃপতি দশরথ সুদৃঢ় তোরণবিশিষ্ট অর্গলযুক্ত দিব্যগৃহশোভিত লোকাকীর্ণ মঙ্গলালয় অযোধ্যাপুরী শাসন করিতেন।’ ১। ৬। ১-২৯।

এ হলো রামায়ণ-এর একটি প্রচলিত পাঠ-এর অনুবাদ। তারপরে রামায়ণ-এর ‘চিকিৎসিত পাঠ’ অর্থাৎ প্রামাণিক বা বিচারমূলক সংস্করণ বেরিয়েছে। তাতে দেখা যায় : প্রচলিত পাঠ-এর কিছু শ্লোক বা তার অংশবিশেষ পরবর্তী সংযোজন বলে বাদ গেছে। যে-পাঠই পড়া হোক, এই আদর্শ নগরীর বর্ণনায় বিশেষ তফাত হবে না।

অযোধ্যার বিশেষত্ব কী? সকলেই শুধু বড়লোক নন, স্বভাবচরিত্রও ভালো। আর সেই সঙ্গে সকলেই ধর্মভীরু, সকলেই যজ্ঞ করেন, আর চার বর্গের প্রথা অটুট রয়েছে। পিরামিডের মতো সাজানো এই সমাজ। তার একেবারে চূড়ায় রয়েছে ব্রাহ্মণ, তার সেবা করে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের সেবা করে বৈশ্য, আর ঐ তিন বর্গের সেবা করে শূদ্র। কিন্তু তার জন্যে কারুর কোনো অপ্রীতির ভাব ছিল না, কেউ

লোভী ছিলেন না, যে যাঁর নিজের সম্পদে খুশি থাকতেন। অর্থাৎ, এই দশরথ-রাজ্য সব মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি : অধিকারভেদ ও বর্ণভেদ পুরোদস্তুর বহল। যে-গৃহস্থদের গুণ ও সম্পদের বর্ণনা করা হয়েছে তাঁরা সবাই বিজ্ঞাতির বা প্রথম তিন বর্ণের লোক। শূদ্ররা কী করতেন, কী খেতেন, কী করে বাঁচতেন—সে-কথা রামায়ণ-এ নেই।

অন্য একটি ব্যাপারও নজর করার মতো। অযোধ্যা-বর্ণনায় বলা হয়েছে—একবার নয়, দুবার—যে এই শহরে কেউ নাস্তিক ছিল না। ‘নাস্তিক’ বলতে কী বোঝায় সে-ব্যাপারে অবশ্য মতভেদ আছে। মধ্যযুগের চীৎকাররা এর নানারকম মানে করেছেন : পরলোকে অবিশ্বাসী, বেল-এর অপ্রাপ্ততায় আত্মহীন, নিরীশ্বরবাদী ইত্যাদি। হালের একটি ইংরেজি অনুবাদে নাস্তিক-এর জায়গায় লেখা হয়েছে : ‘আগনস্টিক, অজ্ঞেয়বাদী’। তার মানে, ভগবান আছেন না নেই, ভগবানই জগতের সৃষ্টিকর্তা কি না, স্বর্গ নরক আছে না নেই—এইসব প্রশ্নর সামনে পড়লে যিনি বসেন : ‘আমি জানি না।’ হয়তো আরও এক পা এগিয়ে তিনি বলবেন : এসব প্রশ্নর উত্তর জানা যায় না।

ভারতের ইতিহাসে ভগবানে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী দু ধরনের লোকেরই হৃদিশ মেলে। এমনকি সংশয়ী, পরকাল পরলোক আছে না নেই—এ বিষয়ে যিনি মনঃস্থির করে উঠতে পারেন নি এমন লোকও নিশ্চয়ই ছিলেন।^১ কিন্তু অজ্ঞেয়বাদ একেবারেই পশ্চিমী ব্যাপার। এই মতবাদ ইউরোপে দেখা দিয়েছে গত দু শতকে। কিন্তু ভারতে এমন পাশকাটানো মত কোনোদিন কি চালু ছিল? মনে হয় না। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, আর সংশয়ী—এই তিনের বাইরে চতুর্থ কোনো মত আদৌ এদেশে ছিল কি না সেটি প্রমাণসাপেক্ষ।

অযোধ্যার বর্ণনা পড়ে কেউ কেউ হয়তো মনে করবেন : এ তো ব্রাহ্মণ্য ইউটোপিয়া। তেমন ভাবা ঠিক হবে না। অযোধ্যার বর্ণনার শেষদিকে হুতি, খোড়া ও যোদ্ধাদের সম্পর্কে যে কথাগুলো আছে সেগুলোও খেয়াল করার মতো। শুধু ব্রাহ্মণদের বড় করে দেখানোই এখানে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। বরং ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় মিলিয়ে দুটি বর্ণের স্বার্থগত ঐক্য ও প্রাধান্যই এই বর্ণনা থেকে বেরিয়ে আসে। মনু ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রকারও একইভাবে এক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইউটোপিয়ার

পাথর হাজির করেছিলেন। শুধুই ‘ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র’ বললে শাসকশ্রেণীর চেহারাটি আড়াল করা হয়। ক্ষত্রিয়দের পৃষ্ঠপোষক ছাড়া ব্রাহ্মণদের অত ক্ষমতা কোনোদিন হতে পারত না। ইতিহাসের বিচারেও দেখা যায় : রাজশক্তিকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো বর্ণর প্রাধান্য কোথাও বজায় থাকে নি। উপনিষদের গল্পগুলোর ভেতরেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়র বিরোধ-ও-ঐক্যর আসল রূপ ধরা পড়ে।^২ রামায়ণ-এর অযোধ্যা সেই মিলিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়শক্তির প্রতিকলন।

সংযোজন

কৃত্তিবাসী রামায়ণ-এ (দেব সাহিত্য কুটির সংস্করণ) লঙ্কাকাণ্ডের শেষে রামরাজ্যর একটি বর্ণনা আছে। সেখানে বানররাও বাঙালি বাবুর মতো ধুতি পরতেন :

লতা-পাতা খেত কপি পরিত কাছটি।

শ্রীরামের প্রসাদে কৌচার পরিপাটি।।

তারপর শুরু হয় সত্যিকারের বর্ণনা :

করেন অমৃত বর্ষ লোকের পালন।

জ্যেষ্ঠ-সন্তে কনিষ্ঠের নাহিক মরণ।।

রামরাজ্যে কেহ করে নাহি করে হিংসা।

যত রাজগণ করে রামের প্রশংসা।।

রামরাজ্যে শোক নাহি জানে কোন জনা।

‘রামরাজ্য’ বলি লোকে হইল ঘোষণা।। (পৃ. ৪৯৬)

বাস, আর কিছু নেই। তবে বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষার ব্যাপারটি এই বর্ণনায় ঠাই পায় নি। এইটুকুই দ্যাখার।

টীকা :

১. কাল্মীকি-রামায়ণ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির সাং, কালকাণ্ড, সর্গ ৬। রামায়ণ-এর আরও কয়েকটি বাঙলা অনুবাদ হয়েছে। সেগুলিতেও একই জায়গায় অযোধ্যার কথা পাওয়া যাবে।
২. ভারতের সব অঞ্চলে শারণা, নাগরী, বাঙলা, তামিল ইত্যাদি লিপিতে মূল রামায়ণ-এর অজ্ঞত পুঁথি পাওয়া যায়। কোনো দুটি পুঁথির পাঠ এক নয়। তার জন্যে সবচেয়ে পুরনো ও নির্ভরযোগ্য পুঁথি বাছাই করে তার একটি ফিচারমূলক সংস্কারণ বেরিয়েছে ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, বরোদা থেকে (১৯৮০-৭৫)। ইন্টারনেট-এও সেটি পাওয়া যায়।
৩. গোল্ডম্যান-এর অনুবাদ, পৃ. ১৩৬-৩৭। অ্যাগনস্টিসিজম শব্দটি প্রথম ব্যবহার

করেছিলেন টমাস হেনরি হাক্সলি (১৮২৫-৯৫)। সংক্ষেপে তার মূল বক্তব্য জানার জন্যে রোজেনথাল ও ইউদিন, পৃ. ১২-১৩ দ্র। এ প্রসঙ্গে জে.বি.এস হলডেন-এর 'অজ্ঞাবাদের উদ্দেশ্য' প্রবন্ধটি অবশ্যপাঠ্য।

৪. সুকুমারী ভট্টাচার্য (২০৭০) দ্র। তাঁর ইংরিজি বইটিতেও (১৯৮৭) বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।
৫. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৫), ১৯৪-৯৫ দ্র। ক্ষত্রিয় রাজাদের কাছে ব্রাহ্মণ ঋষিরাই গুরু—উপনিষদে এমন গল্প আছে (যেমন, জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য-র গল্প)। আবার রাজা জনশ্রুতি ও রৈক্য-র গল্পটিও বেশ মজার। এ বিষয়ে মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯৪) দ্র। মনে হয় জীবিকার নিরাপত্তার জন্যে রাজার পৃষ্ঠপোষণ মেনে নিতে হতো বলেই গল্প রচনা করে ক্ষত্রিয়র ওপর ব্রাহ্মণের মহিমা প্রচার করা হয়েছিল। একবার নয়, দুবার নয়, ত্রিসপ্ত অর্থাৎ একশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করছিলেন পরশুরাম—মহাভারত-এর এই গল্পটি তারই এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। মনোবিদ্যার পরিভাষা ব্যবহার করে বিষ্ণু সীতারাম সুকঠনকর একে বলেছিলেন : অতিপূরণ (ওভার-কম্পেনসেশন)। সুকঠনকর (১৯৪৪), পৃ. ৩৩০ টি. ১ দ্র।

রচনাপঞ্জি

- বান্দীকি রামায়ণ। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনু। বসুমতী সাহিত্য মন্দির ১৯৯৭ (প্রথম প্রকাশ ১৮৯০)।
- রাজশেখর বসু। বান্দীকি-রামায়ণ। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৩৭০ (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬)।
- মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। মুখবন্ধ, রাসবিহারী দত্ত, উপনিষদে বিপরীতের দ্বন্দ্ব। ক্যালকাটা স্কুল অব ফিলজফিক্যাল রিসার্চ, ১৯৯৪।
- সুকুমারী ভট্টাচার্য। বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, ২০০০।
- হলডেন, জে. বি. এস। 'অজ্ঞাবাদের উদ্দেশ্য'। সুতপা ভট্টাচার্য অনু। মানবমন, বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ২, ৪৮-৫৩ (পুনর্মুদ্রণ)।
- Bhattacharji, Sukumari. Doubt, Belief and Knowledge. New Delhi: Indian Council of Philosophical Research, 1987.
- Chattopadhyaya, Debiprasad. Knowledge and Intervention. Firma KLM, 1985.
- Goldman, Robert P. (trans.). The Ramayana of Valmiki. Vol. I. Delhi: Oxford University Press, 1984.
- Rosenthal, M. and P. Yudin. A Dictionary of Philosophy. Moscow: Progress Publishers, 1967.
- Sukthan Kar, V.S. Critical Studies in the Mahabharata. Bombay: Karnatak Publishing House, 1944.
- Valmiki Ramayana. The. Critically edited by G. H. Bhatt and others. Baroda: Oriental Institute, 1960-75.

চয়ন—উৎস মানুষ

তত্ত্বমসি : কী ছিল কী হলো

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অদ্বৈত বৈদান্তিক, অর্থাৎ শঙ্করাচার্যর অনুগামীদের মধ্যে উপনিষদ্-এর চারটি বাক্যকে 'মহাবাক্য' বলে ধরা হয়। মহাবাক্য মানে মহান বচন। তারই একটি তত্ত্বমসি (বাকি তিনটির কথায় পরে আসছি)। তত্ত্বমসি, ভেঙে লিখলে : তৎ (তা বা সেটি) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও)। অর্থাৎ তুমি (-ই) তা বা সেটি। আর একটু বোঝার মতো করে লিখলে : তুমি তা-ই বা তুমিই সেটি।

এই 'তুমি' কে, আর 'তা' বলতেই বা কী? শুধু এ বাক্যটি পড়লে এসবের কিছুই বোঝা যাবে না। কোন্ উপনিষদ্-এ কোন্ প্রসঙ্গে কে কাকে কথটা বলেছেন সেটি জানতে হবে। কিন্তু মহাবাক্য বাছাই করার সময়ে ওসব কিছুই বলা হয় না। উলটে সমস্ত প্রসঙ্গসূত্র থেকে ছিড়ে এনে, ল্যাজামুড়ো বাদ দিয়ে শুধু এ বাক্যটি শোনানো হয়। তারপর ব্যাখ্যা করা হয়: 'তুমি' মানে যে কোনো জীবিত মানুষ, যার মধ্যে জীবাত্মা বাস করছে আর 'তা' মানে সাক্ষাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম (ব্রহ্মার সঙ্গে দয়া করে কেউ এটিকে গুলিয়ে ফেলবেন না; ব্রহ্মা হচ্ছেন দেবতা, পুংলিঙ্গ আর ব্রহ্ম এসেছে ব্রহ্মন্ থেকে, এটি ক্লীবলিঙ্গ)। শিষ্যকে গুরু বোঝাবেন: জীবাত্মা আর পরমাত্মা আসলে একই; তুমিই সেই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম।

শিষ্য এই নিয়ে ধ্যান করবেন, আর যে-দিন এই কথটির তাৎপর্য তাঁর উপলব্ধি হবে সেই দিনই তিনি আরও তিনটি মহাবাক্যর তাৎপর্যও বুঝে ফেলবেন। সেই তিনটি হলো: 'প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম' (প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম), 'আমিই ব্রহ্ম' (অহং ব্রহ্মাস্মি), আর 'এই আত্মাই ব্রহ্ম' (অয়মাত্মা ব্রহ্ম)। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে যে কোনো ফারাক নেই, দুই-ই এক ও অদ্বিতীয়—সেটি প্রমাণ করাই এই চারটি মহাবাক্যর উদ্দেশ্য।

এ-ই হলো অদ্বৈত বৈদান্তিকদের মত। মহাবাক্য চারটি নেওয়া হয়েছে চারটি বেদ-এর অনুসারী উপনিষদ্ থেকে। সেগুলির মধ্যে তত্ত্বমসি আছে ছান্দোগ্য উপনিষদ্-এ, সেটি সামবেদ-এর অনুসারী। ছান্দোগ্য উপনিষদ্-এ একবার নয়, দুবার নয়, ন নবার এই বাক্যটি এসেছে। প্রসঙ্গ হলো : উদ্দালক আরুণি নামে এক

যদি আর তাঁর ছেলে শ্বেতকেতু-র আলাপ। বারো বছর বৈদ্য ইত্যাদি পড়ে শ্বেতকেতু গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরেছেন; বিদ্যার গর্বে ধরাকে সরা জান করছেন। তাঁর বাবা তাঁকে একটি চোখা প্রশ্ন করলেন। শ্বেতকেতু একেবারে ফেল, দশে শূন্য। কাতরভাবে তিনি সাফাই গাইলেন : গুরুগৃহে তাঁকে এসব কিছুই শেখানো হয় নি। উদ্দালক তখন নিজেই ছেলের শিক্ষার ভার নিলেন। কিন্তু তাঁর কথা থেকে ছেলে কিছুই বুঝতে পারলেন না। তখন উদ্দালক অন্য রাস্তা ধরলেন। ছেলেকে বললেন: পনেরোদিন তুমি জল ছাড়া আর কিছু খাবে না, তারপর আমার সঙ্গে দেখা করো।

যোলোদিনের দিন শ্বেতকেতুকে উদ্দালক বললেন: তুমি আমার বৈদ্য শোনাও, ঝক, সাম, যজ্ঞ। শ্বেতকেতু দেখলেন তাঁর কিছুই মনে পড়ছে না। অত বছর ধরে গুরুগৃহে থেকে যা মুখস্থ করেছেন তার সব মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে। বাবার কাছে করণভাবে তিনি সে-কথা কবুল করলেন।

উদ্দালক তখন বললেন: যাও, খেয়েদেয়ে তারপরে এসো। শ্বেতকেতু তাই করলেন, আর বাবার কাছে আসার পর সব বৈদ্য তাঁর দিবি মনে পড়ে গেল। উদ্দালক তখন ছেলেকে বুঝিয়ে বললেন: অন্নই হলো শরীরের মূল। 'সেই যে এই অণিমা (অণুর ভাব), এ সবই তারই স্বরূপ। সেই অণিমাই সত্য, সেটিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু তুমিও সেই' (৩৫ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো)। (৬৯-১৭)।

শ্বেতকেতু অবশ্য এতেও ব্যাপারটি বুঝলেন না। তাঁর বাবা তখন আরও দৃষ্টান্ত ও পরীক্ষণের সাহায্যে তাঁকে জগতের মূল বোঝানোর চেষ্টা করলেন, আর প্রত্যেকবারই তাঁর কথা শেষ করলেন 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' দিয়ে। যেমন, মৌমাছিরা চারদিকের গাছের থেকে ফুলের রস জোগাড় করে সমস্ত রসকে একতা, অর্থাৎ মধু-র রূপ দেয় তখন আর কোন্ ফুলের কোন্ মধু সেই ভাব থাকে না। 'সেই যে এই অণিমা (অণুর ভাব), এ সবই তারই স্বরূপ। সেই অণিমাই সত্য, সেটিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু তুমিও সেই' (তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো) (৬৯।১-৪)।

শ্বেতকেতুকে উদ্দালক বললেন, বটগাছ থেকে একটা বটফল নিয়ে এসো।

ফলটিকে তিনি বারবার ভেঙে টুকরো টুকরো করতে বললেন। তারপর শ্বেতকেতুকে তিনি জিগেস করলেন, এখানে কী দেখছ? শ্বেতকেতু বললেন, কিছুই দেখছি না। তখন উদ্দালক তাঁকে জানালেন তুমি এই অণিমাকে দেখছ: না, (কিন্তু) এই অণিমার মধ্যেই (বীজের অণুতেই) অমন বিরাট বটগাছ আছে। আবার ধূয়ের মতো ফিরে আসে পুরনো কথাটি: 'সেই যে এই অণিমা (অণুর ভাব), এ সবই তারই স্বরূপ। সেই অণিমাই সত্য, সেটিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিও সেই' (তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো) (৬।১২।১-৩)।

এমন আর-একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হলো: উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বললেন, জল ভরা একটি ঘড়ায় একখণ্ড নুন ফেলে দিয়ে সকালে আমার কাছে এসো। শ্বেতকেতু তাই করলেন। উদ্দালক তাঁকে বললেন, এই জলের একপাশ থেকে একটু খেয়ে দেখো। শ্বেতকেতু খেলেন। উদ্দালক জানতে চাইলেন, এটি কেমন? শ্বেতকেতু বললেন, নোনা। এবার উদ্দালক বললেন, এইবার তুমি জলের মাঝখান থেকে আর নিচ থেকে খেয়ে দেখো। সেই একই উত্তর এল। এই অধ্যায়টিও শেষ হয় এই একই ধূয়ো দিয়ে (৬।১৩।১-৩)। অর্থাৎ, শরীর ঠিকমতো কাজ করলে তবেই মন ঠিকমতো কাজ করে, গাছের ফল, প্রাণীর শরীর, জল ইত্যাদি সবারই মূলে রয়েছে একই জিনিস। তাকেই বলা হয়েছে অণিমা, অর্থাৎ অণুত্ব। এই হলো উদ্দালকের শিক্ষার সারকথা। খাঁটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, প্রথমে ব্যতিরেকী (খাবার না পেলে মন কাজ করে না), তারপর অঙ্গরী (খাবার খেলে মন কাজ করে) এই যুক্ত পদ্ধতি দিয়ে উদ্দালক ছেলেকে জগতের স্বরূপ যে একই অণিমা, যা শরীরের আছে, তাই সবকিছুর মধ্যে আছে—এই শিক্ষা দিলেন।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেছেন, উদ্দালকই পৃথিবীর প্রথম বৈজ্ঞানিক। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষার 'ভারতে বক্তবাদ প্রসঙ্গে' বইটিতে পাওয়া যায় (অনুদ্বিপ, ১৯৯৩, পৃ. ১৩১-৩৭)। কিন্তু এই উপনিষদ-এর ভাষ্য ও অনুবাদ পড়ে দেখুন। সেখানে বারবার জীবাত্মা-পরমাত্মার কথা আসে, যদিও মূলে কোথাও এই শব্দ দুটি নেই। শুধু শঙ্করাচার্যর ভাষ্য নয়, রামানুজ ও অন্যান্য বৈদান্তিকরাও সম্প্রদায়-

নির্বিশেষে উদ্ভালক আরুণিকে মহা-ভাববাদী বলে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। মহাবাক্যের ধারণা না মানলেও ছন্দোগ্য উপনিষদ-এর কাহিনীগুলি যে ভাববাদেরই পক্ষে যায় সেটি দেখাতেও তাঁর চেষ্টার কসুর করেন নি।

অথচ কোনো পূর্বধারণা না নিয়ে উদ্ভালক-শ্বেতকেতুর গল্পটি একবার পড়ে দেখুন। মূলের সঙ্গে অনুবাদ মেলালে ধরা পড়বে: শঙ্করাচার্যর মতো ভাষ্যকার আর তাঁর অনুগামী অনুবাদকরা কীভাবে পদে পদে ভাষান্তর করার চেয়ে ব্যাখ্যামুখী অনুবাদের দিকে হেলে রয়েছেন। হ্যাঁ-কে না করতে চাইলে এছড়া আর উপায় কী। যেমন শরন দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থর অনুবাদ: ছন্দোগ্য ৬।৮।৪-এর অনুবাদ শুরু হয়েছে, 'ক্রমে পরমকারণ পরব্রহ্মকে প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন - তুস্ত অন্ন ভিন্ন আর কোথায় সেই শরীরের মূল হইতে পারে...' (দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ-অনুদিত ও সম্পাদিত সপ্তম সংস্করণ, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৮৪, পৃ. ৬৯৭)। ড্যাশ-এর আগের কর্তৃহীন বাক্যটি পুরোটাই অনুবাদের সংযোজন। অম্বয় করার সময়ে তবু সেটি তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে ছিল (পৃ. ৬৯৭)। কিন্তু তার ঠিক পরেই বাঙলা অনুবাদ করার সময়ে সেটি মূলের অংশ হয়ে গেছে; সরল পাঠক এটি ধরতেই পারবেন না। বাঙালি পাঠক সাধারণত উপনিষদ পড়েন স্বামী গভীরানন্দ-সম্পাদিত উদ্বোধন সংস্করণে। সেখানেও দেখা যায়—কী অম্বয়ে আর কী অনুবাদে—ইচ্ছেমতো অতিরিক্ত শব্দ গুঁজে দেওয়া হয়েছে। যেমন, ৬।৮।৭-এর অম্বয়ে 'আত্মা'র পাশে লেখা হয়েছে 'জগতের আত্মা, যথার্থ্য', আর অনুবাদে 'সত্য'র জায়গায় 'পরমার্থ সত্য' (উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, ভাগ ২, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯৩, পৃ. ৩৩০)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে: তত্ত্বমসি-র প্রসঙ্গ আর সেটিকে নিয়ে যে বিরাট আলোজ্ঞায়ম্য ব্যাখ্যান তৈরি হয়েছে—দু-এর মধ্যে কোনো সম্পর্কই নেই। প্রসঙ্গ থেকে আলাদা না করলে জীবাশ্ম-পরমাশ্মা নিয়ে অমন ভাবের উড়ান কখনোই সম্ভব হতো না। বিশেষ করে একটি ব্যাপার দেখে বেশ অবাক লাগে। গোটা ছন্দোগ্য উপনিষদ-এ কোথাও জীবাশ্ম-পরমাশ্মার নামই নেই। আর শুধু ছন্দোগ্য কেন, প্রধান আঠেরোটি উপনিষদ-এর কোথাও ওরকম কোনো শব্দই

নেই। সমস্ত ব্যাপারটাই শঙ্করাচার্যর কীর্তি। তাঁর অনুগামীরা শঙ্করভাষ্যর টীকায়, অনুবাদে এই ভাববাদী ব্যাখ্যাকেই উদ্ভালক-শ্বেতকেতু সংবাদ-এর একমাত্র ব্যাখ্যা বলে হাজির করেছেন। ফলে, দেব সাহিত্য কুটীর ও উদ্বোধন-এর সংস্করণে একই রকম ব্যাপার চলে আসছে। কিন্তু মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়েছেন: উদ্ভালকের মতবাদ আলোচনা করলে এমন কোনো সিদ্ধান্তে আসা বোধহয় অসম্ভব যে তিনি জগৎকে অলীক বলে গণ্য করতেন। দ্বিতীয়ত, বটগাছের দৃষ্টান্ত থেকে 'মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক যে উদ্ভালকই ছিলেন পরমাণুকারণবাদের প্রথম প্রবক্তা। (যদিও সাধারণত বৈশেষিক দর্শনের প্রথম ঋষি কণাদকে এই মতের আদি প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করা হয়। এবং পরবর্তীকালে এই মতবাদ মূলত ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বলে পরিগণিত)।' (রাসবিহারী দত্ত, উপনিষদে বিপরীতের দ্বন্দ্ব-র ভূমিকা, কালকাটা স্কুল অফ ফিলোজফিক্যাল রিসার্চ, ১৯৯৪, পৃ. ৬)।

এছড়াও অন্য একটা কথা আছে। সাধারণ পাঠক প্রধান উপনিষদগুলির শঙ্কর-ভাষ্যই পড়ে থাকেন। কিন্তু শঙ্করই তো উপনিষদ-এর একমাত্র ভাষ্যকার নন। অন্যান্য ভাষ্যকাররা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বিবেচনা অনুযায়ী তত্ত্বমসি-র আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শঙ্কর ছিলেন অদ্বৈতবাদী, সুতরাং তৎ আর তম্—জীব আর ব্রহ্ম—যে এক—এটিই তাঁকে প্রমাণ করতে হবে। রামানুজ ছিলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অর্থাৎ একটু অন্য কিসিমের অদ্বৈতবাদী। তিনি বললেন, তম্ মানে জীবন যীর শরীর-স্থানীয় সেই ব্রহ্ম; আবার জীব যখন ব্রহ্মরই শরীর তখন তম্ আর তৎ অভেদ। সবচেয়ে ভালো খেলা দেখিয়েছেন মধ্ব। তিনি ছিলেন দ্বৈতবাদী, জীব আর ব্রহ্ম যে আলাদা—এই ছিল তাঁর মত। স আত্মাতত্ত্বমসি-র দ্বিতীয় শব্দটির সন্ধি তিনি ভেঙেছেন এইভাবে: স আত্মা + অতত্ত্বমসি। এর মানে দাঁড়াল: সে-আত্মা তুমি নও। কুকুন কাণ্ড! ভেদ, অভেদ, ভেদাভেদ ইত্যাদি তত্ত্ব অনুযায়ী শুধু ব্যাখ্যা বদলাচ্ছে না, মূলের পাঠও আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

মহাবাক্যের ব্যাপারেও নানা মূনির নানা মত। যেমন, ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের বিবেচনায় শুধু তত্ত্বমসি-কে মহাবাক্য বললে চলাবে না, ওটি একটি বড় বাক্যের অংশমাত্র। পুরো বাক্যটিকেই মহাবাক্য বলে ধরতে হবে। আর বাঙলার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্যস্থানীয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ মনে করতেন তত্ত্বমসি নেহাতই

প্রাদেশিক বাক্য, মহাবাক্য নয়। মহাবাক্য হলো প্রণব অর্থাৎ ওঁ। (এমন নানা মতের জন্যে ক্যালকট্টা রিভিউ, এপ্রিল ১৯৯৬, পৃ. ৪৯-৫৪ দ্র.)

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই : উপনিষদ-এর ভাববাদী ব্যাখ্যাকাররাও সব বিষয়ে একমত হতে পারেন নি; প্রত্যেকে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মত অনুযায়ী, মূলকে ভেঙেচুরে শব্দ আর অর্থ নিয়ে যথেষ্টচার করেছেন। তাঁদের সম্প্রদায়ের অনুগামীরাও একইভাবে 'আমরাই ঠিক, বাকি সবাই ভুল' বলে কয়েকশ বছর ধরে আশ্রয়ালন করে চলেছেন। পাঠক হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন: তাহলে এঁরা সবাই কি ভুল? উত্তর অতি সহজ: হ্যাঁ। নিজের নিজের সাম্প্রদায়িক মতকেই একমাত্র সত্য বলে ধরে নিলে অনেক রকম কারচুতির আশ্রয় নিতে হয়। উপনিষদ-এর ভাষ্যকাররা সকলেই কমবেশি সেই দোষে দোষী।

চয়ন-অনীক

একটি বই, অনেক কথা

মনোরঞ্জন ব্যাপারী

হরিশঙ্কর জলদাস বাংলা ভাষী পাঠকের কাছে এই সময়ের একজন পরিচিত লেখকের নাম। জাতিগত পরিচয়ে যিনি কৈবর্ত সমাজের মানুষ। কৈবর্ত মানুষদের অঞ্চলভেদে নানান নাম। মৎস্যযাতী, মাছমারা, মেছো, জেলে, মেল্লবর্মণ, গাবর, পাতর, রাজবংশী, মাছধরা, কেওট, মৎস্যজীবী, দাশ, মালো, মল্লবর্মণ, গাবর, জলদাস। প্রধানত এইসব মানুষ নদ নদীর ধারে বসবাস আর মৎস্য শিকার দ্বারাই জীবন জীবিকার নির্বাহ করে থাকেন। বর্ণবাদী হিন্দু ধর্মে এই জাতির মানুষও নিম্নবর্ণ অঙ্কুঃ অপসৃশ্য-ছোটলোক। এই সমাজ থেকে যে দুজন মানুষ সাহিত্য অঙ্গনে নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে সাহিত্য রচনা করে বিনিষ্ঠতার ছাপ রেখেছেন তাঁর একজন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। অন্যজন হরিশঙ্কর জলদাস। বাংলা সাহিত্যে মোটামুটি ভাবে আমরা গোটা বারো নদী ভিত্তিক—জীবন জীবিকার উপর রচিত জেলে, মালো, কৈবর্ত মানুষের অনাহার অপমান শোষণ বঞ্চনার কিছু চিত্র পাই। এই রচনাগুলো হল—অমরেন্দ্র ঘোষের চর কাশেম, সত্যেন সেনের বিদ্রোহী কৈবর্ত, সামসুদ্দীন আবুল কালামের সমুদ্র বাসর, আবু ইসহাকের পদ্মার পলিদ্বীপ, মহাশ্বেতা দেবীর কৈবর্ত খণ্ড, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গঙ্গা একটি নদীর নাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি, সমরেশ বসুর গঙ্গা, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গহীন গাঙ, ঘনশ্যাম চৌধুরীর অবগাহন, অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম এবং হরিশঙ্কর জলদাসের জলপুত্র।

ওইসব লেখকদের শেষ দুজন বাদে আর কেউই প্রত্যক্ষ ভাবে জল জীবনের সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত নয়। মৎস্যজীবী মানুষের জীবন জীবিকার ধরণধারণ - শোষণ বঞ্চনা, জন্ম মৃত্যু বিবাহ, সংস্কার কুসংস্কার, ঝগড়া বিবাদ, প্রেম প্রতিহিংসা, সবটাই তাদের কল্পনা নির্ভর বর্ণন। যে দুটো বই নিয়ে পাঠক মহলে প্রবল আলোড়ন তার একটি পদ্মা নদীর মাঝি, অন্যটা তিতাস একটি নদীর নাম। প্রথমটির রচনাকার জাতিগত ভাবে ব্রাহ্মণ ও পরেরটির মালো। অর্থাৎ জেলে সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষ। তুলনামূলক ভাবে পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসে যেসব চরিত্র,

দলিত চেতনার দৃষ্টিতে দেখলে এর একটাও নিম্নবর্ণ সমাজের মানুষের কোন সম্মান বৃদ্ধি করে না। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র যে মেয়ে সেখানে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনোর কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎ করে, ছোট্ট সন্তান আর পশু অসহায় স্বীকে ফেলে নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে চলে যায় নিরাপদ স্থানে। আর একজন সে চোর। একজন স্বামীকে ফেলে চলে যায় পর পুরুষের সাথে। একজন ঠগ। এই এই শক্তিমূল উপন্যাসিকের লেখা 'সার্বক' উপন্যাস হতে পারে, তবে দলিত জীবনের যথার্থ বর্ণন কখনই নয়। মানিকবাবু যে বা যাই হুন, জন্মেছেন তো উচ্চবর্ণ সমাজে। ফলে তিনি বুঝে উঠতে পারেননি কোন লেখায়, কোন শব্দে, কোন চরিত্র চিত্রণে-নিম্ন বর্ণ মানুষের অপমান বা সম্মান। এই 'ভুল একা জনার নয়, বহু দরদী মরদী' কথাটার লেখাতোও অবচেতনে কর্তৃক বিশেষ এসে গেছে। যেমন 'চুরি চামারি'। বহু লেখকের লেখায় এই শব্দবন্ধটা প্রয়োগ হতে দেখা যায়—'চুরি চামারির চোটে দেশটা রসাতলে গেল'। হুম্বা একটাই—'চুরি, সেটা তো খুবই খারাপ কাজ। তাঁর জন্য দেশ রসাতলে যেতে পারে। চামারির জন্য যাবে কেন? চামার তো একজন মেহেনতি মানুষ। পেটের জ্বালায় মরা গরুর চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রি করে চাল কেন? খেয়ে বীড়ে। তাহলে তাঁকে কিনা সোবে চোরের সমতুল বলা কেন? এটাই ব্রাহ্মণ্যবাদী হীনমানসিকতা। যা সর্বজন নিজেকে উচ্চ আর অপরেরে নিম্ন ভাবতে শেখায়। মানিকবাবুও পারিবারিক - পারিপার্শ্বিক কারণে নিজের অজান্তে ওই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। উপাধ্বজ—পুতুল নাচের 'হতিকথা, পৃষ্ঠা-৬২ 'বাপের চুরি চামারির পয়সায় লেখা পড়া শেষে এত কেন?' ফলে পদ্মা নদীর মাঝি লেখার সময়ও ওই মানসিকতার বাইরে আসতে পারেননি। তাই কোন চরিত্রকে গড়তে পারেননি মহান সমাজ বন্ধু করে। উল্টো দিকে যদি 'জাউল্যার পেলা' অদ্বৈত মন্ত্রবর্মণের 'তিতাস একটা নদীর নাম' বইটির দিকে চোখ রাখি বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, এ জীবন লিখতে গেলে শৌখিন সাহিত্য মজদুরি দ্বারা কখনো সম্ভব হবে না। সেই মাটি জল হাওয়া বাতাস গায়ে মেখে সেখানকার সমাজ সংস্কৃতিকে গভীরভাবে ভালবেসে জীবন ও জীবিকার সাথে সংপৃক্ত থেকে উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করলে তবেই লিখতে পারা সম্ভব। যা অদ্বৈত, হরিশঙ্কর জন্ম জনিত কারণে সহজেই নাপালে পেয়ে গেছেন।

১৭. ১৭৭৭ জীবন জর্জর হয়েছে তাকে লিপিবদ্ধ করেছেন সাক্ষীল সাক্ষরতায়।
১৮. ১৮ শতক সুযোগ বা নন্দন তত্ত্ব অদ্বৈত অনেকটা এগিয়ে থাকলেও কর্তব্যবাহী
১৯. ১৯ উপর সেই ধরনের তীক্ষ্ণ প্রহর করেনি যা না করে কোন সচেতন দলিত
২০. ২০ শতক পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে না। ১৮১২ সালে হুরিচাঁদ ঠাকুর।
২১. ২১ শতক গুরুচাঁদ ঠাকুর জন্মেছেন। তাঁর ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে
২২. ২২ শতক সে সংবাদ ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গোকর্নবাটে ১৯১৪ সালে জন্ম
২৩. ২৩ শতক অদ্বৈত মন্ত্রবর্মণের কাছ পর্যন্ত কোন কারণে পৌঁছানি হয়তো। তাই তাঁর
২৪. ২৪ শতক অমানবিক বর্ণ ব্যবস্থার উপর তেমন আক্রমণ পাওয়া গেল না।

তবে হরিশঙ্কর জলদাস অত নরম কোমল মোলারেম সাহিত্য সৃষ্টা নন।
১৫. ১৫ শতক যে হলান্স তাঁর জীবনকে অকারণে নরক যন্ত্রণার ভরিয়ে দিয়েছে তাঁর
১৬. ১৬ শতক কলমকে ধারালো ভালোয়ারের মত বাগিয়ে ধরে দৃঢ় নিশ্চয় পদক্ষেপে
১৭. ১৭ শতক এসেছেন সাহিত্যের রণভূমিতে।

সম্প্রতি তাঁর 'কৈবর্ত কথা' পুস্তক খানি পাঠ করলাম। বাংলা বাজার—টাকা,
মওলানা ব্রাদার্স প্রকাশিত এটি চতুর্থ মুদ্রণ। তাঁর জলদাস পদবি এবং মন্ত্রবর্মণবাহী
পরিবারের সন্তান পরিচিতি, সেই বাল্যকাল থেকে কিতাবে নির্মম নিগ্রহের কারণ
হয়ে উঠেছে, পুস্তকের পাতায় পাতায় রয়েছে তাঁর জলন্ত বিবরণ। এগারো অধ্যায়ে
বিস্তৃত পুস্তকে যেমন আছে উচ্চবর্ণ সমাজের লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত তেমনই আছে
স্বজাতির হিংসা ঘেঁষ স্বার্থপরায়ণতার কদম্ব চিত্রলেখ। আর মজার ব্যাপার—
এইসব। অপমান অত্যাচার বাংলাদেশে কসবাসকারী হিন্দুদের যারা কাকের
মাগাউন বলে, সেই মুসলমান মানুষদের কাছ থেকে আসেনি, এসেছে স্বজাতি
হিন্দুধর্মের তথাকথিত উচ্চবর্ণের এবং নিম্নবর্ণের মানুষজনদের কাছ থেকেও। এটা
একটা বিড়ম্বনা।

অম্মি নমস্কর সমাজের মানুষ। আমাদের নামোদের মধ্যে একজন আছে যারা মাছ
ধরে বিক্রি করে, আর একজন মাছ ধরে খায়। যারা খায় তাঁরা, যারা ধরে বিক্রি
করে—তাদের নিজস্বের থেকে নিচু জাতির বলে মনে করে। বিবাহ সম্পর্ক
পাতাতে চায় না। পশ্চিমবঙ্গে নামো মানুষদের মধ্যে সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে
কয়েক জন মানুষ বিশেষ অবদান রেখেছেন তারমধ্যে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য

নাম রাজু দাশ। নাট্যকার নাট্যপরিচালক অভিনেতা স্বহস্তিধ পরিচয় তাঁর। তিনি ওই 'মাছমারা' জাতির মানুষ বলে মেয়ে দিয়ে দিতে দিয়ে বারবার একদল নমো মানুষদের কাছে 'নীচুজাত' অভিধায় অভিহিত হয়ে আক্ষেপ করেছেন। আর যেটা সবচেয়ে আশ্চর্যের—সেইসব নমোরা কিন্তু কেউ অসিক্ত মূর্খ নয়। কেউ কেউ আবার নিজেকে মতুরা বলেন, আবেদনকারী বলেন। মার্কসবাদীও বলেন কেউ কেউ।

আমি বারবার আমার লেখায় বলে থাকি যে—ব্রাহ্মণ্যবাদ অত ভয়াবহ - অত শক্তিশালী নয় যে হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের পদনত করে রাখতে পারে। সেটা সম্ভব হচ্ছে এই কারণে আমরা সচেতন সংঘবদ্ধ নই। একত্যা নেই আমাদের মধ্যে। সেই অসৈন্যের ফাঁক ফাঁক দিয়ে ওরা উঠে বসে আছে আমাদের মাথার উপরে। সাম দাম দত্ত ভেদ সবকটি কুটিল অস্ত্র প্রয়োগ করে মানুষের সাথে মানুষের স্বাভাবিক মেলামেশার পাথে তুলে দিয়েছে অনেকগুলো বঁধার দেওয়াল। ওরা দেওয়াল দিয়েছে আমাদের উচিত ছিল সেই দেওয়ালকে লাথি মেরে শুড়ে গুড়ো করে দেওয়া। তা না করে আমরা সেই দেওয়ালের ওপাশে বসে এপাশের মানুষটাকে ঘৃণা নিন্দা অবজ্ঞা করেছি। আপন বলে বুকে জড়িয়ে ধরার পরিবর্তে হেসে নীচ বৈরী বলে দুঃস্বপ্নে সরিয়ে দিয়েছি। আমরা বলি নিম্নবর্ণের মানুষ নাকি সাড়ে ছয় হাজার বা তাঁর চেয়ে বেশি ভাগ উপভোগে বিভক্ত। কেন মনে নিয়েছি আমরা ওদের করে দেওয়া ভাগ উপভোগ? কেন ওদের কাছ থেকে শেখা এবং পাওয়া ঘৃণার বিবে জর্জর করেছে আর একজন বা একদল মানুষের জীবন।

আমি তখন রাজু ডাঙ্গায় খাল পাড়ে যুপড়ি বানিয়ে থাকতাম। পঞ্চাশটা মত যুপড়ি ছিল সেখানে। সেইসব যুপড়ি কসানোর আমারও একটা ভূমিকা ছিল। তাঁদের প্রায় সবই দু চার বছরের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আসা। একদিন কথায় কথায় আমার পাশের যুপড়ির একজন দাঁত কের করে বলে—'আমাদের পায়ে বর্ষা কালে হাজা ইয়েল মার্চে কোন মেয়ে পাইলে ধইরা মাথায় পাও খটসা দিতাম। পাও ভালো ইয়েল হাইত'। সে তো কথাটা বলে ছিল বাড়ি আগ্রাদে গদগদ করে। তখন সারা শরীর কেঁপে গিয়েছিল আমার। মানসনৈহে তখনই দেশ ভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সব কিছু ক'র্য' কারণ এক নিমিষে দেখে ফেলিলাম। এটা

১৯৭১। যে এই সব মানুষ কেউ আরব থেকে এদেশে আসেনি। নানান সামাজিক বৈষম্যের ঠোঁট বা বোঁদ্ধ ধর্ম ভাগ করে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। অমিদার আর পুরোহিত শ্রেণির অত্যাচার—বহু নিরীহ দুর্বল মানুষকে তো শান পাঠাতে বোঁদ্ধ ধর্ম থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ভয়ে ইসলাম ধর্মে আত্মীয় নিতে বাধ্য হলেন। এবং এরা সবই আমাদের স্বজন। আমাদের কাছ থেকে সে কারণে আমাদের কিছু সহনশীলতার পাথর কথা ছিল। সেটা আমরা ভেঙে দিলামই না, উল্টে নিলাম। তুচ্ছ তামিলি ঘৃণার আগুনে দহন করতে করতে শত্রু বানিয়ে তুললাম। আমরা ভাবি যার, যে মানুষ ও খাওয়া কুকুরকে কোলে নেয়, তাতে তাঁর দেহ অপবিত্র হয় না, সেই একই মানুষ মুসলমান উঠানে এসে দাঁড়ালে গোবর জল ঢেলে উঠোন ধোয়, ছোঁরা লাগলে দ্বন্দ্ব করে পবিত্র হয়, ফাঁকা মাঠে একা পেয়ে মাথায় পা ঘসে দেয়। তাঁর গলা কাটবে না তাহলে কি মুসলমানরা তাঁর গালে চুমু দেবে?

আমি একজন দলিত সমাজের মানুষ। উচ্চবর্গ সমাজ থেকে ওই একই ঘৃণা অবজ্ঞা অপমান আমার প্রতিও ছুঁড়ে দেওয়া হয়। তখন আমার মনের মধ্যে যে তীব্র ক্ষোভ ক্রোধ জন্মে—এক এক সময় মনে হয় ওদের ধর থেকে এক কোপে দুটো নামিয়ে দিই। তাহলে মুসলমানরা যদি সেই কাজটা করে, আমি কি করে বলব—অন্যায়। নিজের বেলা আঁটি আঁটি, অন্যের কোলা দাঁত কপাটি? আমি যদি এই সমাজ থেকে মানবিক অধিকার, সম্মান, ন্যায় দাবি করি, আমাকেও অন্যের প্রতি ওগুলো অকাতারে প্রদান করতে শিখতে হবে। বর্ষার অমানবিক ধর্ম সোটা শেখার না। শেখায় অপরকে হেঁচ নীচ ঘৃণা অবজ্ঞা করতে। 'পরস্পর পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া সম্মান দিবে' হিন্দু ধর্মে সেই রীতি নেই।

মানুষকে মানুষের এই ঘৃণা অপমানের ফলশ্রুতি-দেখভাগ। তবু মানুষ আজও শিখল কই? হিন্দু ধর্মকে অনেক ধর্মগুরু ধর্ম প্রচারক গলার শিরা ফুলিয়ে দেশ বিদেশের সভা সমিতিতে ভাষণ দিয়ে আগ্রাণ প্রদান চালিয়েছিলেন এটা প্রমাণ করার জন্য যে—এই ধর্ম পৃথিবীর এক সর্বশ্রেষ্ঠ মতন ধর্ম। ইহা লৌকিক পারলৌকিক - দৈব জীবন সুখময় হবার সব উপাদান সমূহ এতে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান।

পোটা বিশ্বের সামনে ভারতীয় সংস্কৃতির মুখোই চুল কালি লেগে গেল। সে দাগ ফেওয়া হবে কোন সাবানের কোন প্রতিবাদী ফানায়।

আমার নিজীব, নিবির্ঘ, নির্বোধ, ভয়ে কাপড় হালু করা, মুখে হ্রস্ব খোড়া মারা, মঞ্চে মঞ্চে কৈদে বুক ভাসানো, পত্র পত্রিকায় জ্বালানী কব্য করা-দলিত ভাই বন্ধুরের এটাই কলার—মুসলমানদের উপর অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠের উচ্চ লোকদের গলা এত সরব কেন তা কি কোনদিন ভেবে দেখেছেন? তার করণ ওরা যোদ্ধা জাতি। মারতে মরতে ভয় পায় না। কাটা পুতুর লাশ ঘরে গিয়ে দেখুন দশ জনের ছয়জন ওরাই। কংগ্রেস সিপিএম তুলমূল বিজেপি দলীয় সংস্কার যারাই হোক—মৃতদেহটি ওদের। হ্যাঁ, আবলাক হত্যাকাণ্ডী রাজনৈতিক দলের লাশ গালায় সংখ্যা বৃদ্ধি করছে মুসলমানরাই।

ওঁর পাঠা সে লেজে কাটুক আর গলা আমার কি? জেলে কেস শুনেছি বলে-জম হয়েছে—(শেকটা অনুমান করে নিল) ... আগায়, মরব খাঁড়ার আগায়। যখন মৃত্যুটাই সত্যি বাকি সব মিথ্যা, তখন মরুক তাঁর যেভাবে ইচ্ছা। তবে যথার্থ এটাই যে তাঁরা মরতে জানে। রাজনৈতা ধর্ম সংরক্ষক সবাই জানে যে এ দেশে যত মুসলমান কবরাস করে তা পাকিস্তানের চেয়ে বেশি। ভোটের ব্যঙ্গ যেমন তাঁরা ভরতে - খানি করতে পার, খেপে গেলে বানিয়ে নিতে পারে আর একটা পাকিস্তান। ভয়ের ব্যাপার এটাই। তাই তাদের কাটা যায়ে মলম দেবার চেষ্টা। মাননীয় কামার কুমার চামার মুচি চাষা ভূষো কাওরা ব্যপদি নম পৌদ জোলে মালো হাড়ি জোম, যাদের নাম আরও ব্যদ পড়ে গেল আপনাদের সে ফমতা নৈই। না নৈই। কারো সাপে কারো নিগমিশ নৈই, ভেঙে ছোট টুকরো হয়ে আছেন। এক দলের আপদ বিপদে আর একদল দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, পাশে গিয়ে দাঁড়ায় না। লালগাড়ের অধিবাসী মানুষের জীবন যখন সরকারি পেশা যন্ত্রে চূর্ণ হচ্ছিল, যা হুজু ওদের হচ্ছে, আমাদের কি—বলে দূরে সরে থেকেছেন। গুজরাটে যখন মায়ের পেট চিরে বাচ্চা বার করা হচ্ছিল—মেয়া মরে তো মোগো কি! বলে শীত ঘুম দিয়েছেন। সিন্ধুর নন্দিগ্রাম নোনাভাজার কোন বিপন্ন মানুষের পাশে আপনারা থাকেননি, তাই আপনাদের বিপন্ন সময়ে কেউ আপনাদের পাশে এসে দাঁড়ায় না। শুনেছেন যে, একটা পটিকাটি যে কেউ ভেঙে ফেলতে পারে, এক আটি পারে

৩৩ **৫২৫**

মৃত্যুর পরে কি হয় সে তো কেউ জানি না। সে জীবন সম্বন্ধে বত লোভনীয় গল্প বলা হোক—সে নিয়ে আমার অন্তত কোন মাথা ব্যথা নৈই। কিন্তু যতক্ষণ দেখেই প্রশ্ন থাকে, বেঁচে থাকি যতদিন - সেই যাট সত্তর আশি একশো বছর - পৃথিবীর বসবাস কালের সময়টুকু সুন্দর সহনশীল সম্মানীয় করার কোন মানবীয় ওপাবলীর ছিটে গৌটা এই ধর্ম আছে এমনটা আমার নজরে আসেনি। এই ধর্ম অন্য ধর্মকে তো অসহ্য মনে করেই—অহিংস বৌদ্ধ ধর্মকে কি ভীষণ ত্রুণতার সাথে ভারতবর্ষ থেকে নির্মূল করা হয়েছিল, সেই রক্তাক্ত ইতিহাস সেটা সবার জানা। সে তাঁর নিজের ধর্মমতে বিশ্বাসী কিছু মানুষের প্রতিও সমান নির্মম। এদেশের আদি বাসিন্দা সেই মানুষগুলোকে কিনা দোষে অজুহৎ অস্পৃশ্য মানবোত্তর শোষণ করে শিক্ষা দীক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখার সববিধ প্রয়াস হাজার বছর যতল রেখেছে। আধুনিক কালের শ্রীচৈতন্য থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুখে কেনা তুলে যে টেচিয়ে গোলেন, তাঁর সবটাই ভস্মে যি ঢালা ছাড়া আর কোন ফল প্রসব করল না। একদা যখন মানুষ চলে যাচ্ছে, তখনও মানুষের ছোঁয়াতে মিড-ডে মিলের খাবার অখাদ্য হয়ে যায়। অশুদ্ধ হয়ে যায় বিশাল নদী-নর্দনার জল। কোন দলিত তৃণজর্জ সর্ব কুরো থেকে জল তুলে খেলে রাত পুড়িয়ে তাঁর হাতে হেঁদা দেয় উচ্চবর্ণরা। 'শিক্ষিত সমাজ সচেতন বুদ্ধিজীবী বর্গ' সিন্ধুর নন্দিগ্রাম নির্ভয়া কামদুনি পার্শ্বসার্কাস আখলাক নিয়ে বতটা প্রতিবাদী কেন কে জানে এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে ততটাই নীরব উদাসীন।

আখলাক প্রসঙ্গ যখন এসেই গেল অবশ্যই কলতে হবে যা হয়েছে খুব অন্যায়। কে কী খাবে কে কী পড়বে সেটা একান্তই তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। তাকে যেভাবে মেরে ফেলা হয়েছে সমাজের সর্বস্তরে তাঁর তাঁর প্রতিবাদ হওয়া দরকার। বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ তাই প্রশংসনীয়। তবে মনে সন্দেহ আগে এই প্রতিবাদ সবটাই ভোটের অংক মাথায় রেখে নয় তো। কাউকে উপরে তোলা, কাউকে নীচে ফেলা। তা না হলে ওই একই সময়ে ঘরের মধ্যে হুমুস্ত অবস্থায় দু দুটা দলিত শিশুকে উচ্চবর্ণ সমাজের লোক দ্বারা পুড়িয়ে মেরে ফেলার পরও সে নিয়ে কারো কোন উচ্চব্যাচ নৈই কেন? একটাও শব্দ কেন উচ্চারিত হচ্ছে না ওই দুই মৃত বাসিন্দার জন্য? শিব সেনা তো এক হুজনের মুখে কালি গোপেছে এটায় তো

৩২ **৫২৬**

না। তবু একতাবদ্ধ হবার চেষ্টা করলেন না। অতি ক্ষুদ্র ক্ষমতা আপনাদের, তাই কল্যাণকল্পি দাম নেই—রাজনৈতা সমাজপতি-বুদ্ধিজীবী 'সংবেদনশীল' মানুষের কাছে। এমনিতে তো কথায় বলে চাহে মরদ বনো, ইয়া তো কিসি মরদ কা চামচা বনকে রহো। যখন সাহস নেই আমাদের যুদ্ধ বিগ্রহের, বারা বারা তা পারে সেই জাতিদের সাথে উচিত মিত্রতা করা। বৈরিতা মোটেই নয়। তা না করে যদি উচ্চবর্গ সমাজ দ্বারা দেখানো পথে হেঁটে ওইসব মানুষদের ঘৃণা অবজ্ঞা অপমান করি আমাদের 'মুক্তি শিবির ব্যাপারও অসম্ভব'।

মুসলমান বাপ লিন—তার আগে বলিতোরা, নিজেরা তো একবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ান। নমরা পৌদদের—পৌদরা নমদের, নম পৌদরা রাজবংশীদের—রাজবংশীরা নম পৌদদের, তিনে মিলে আদিবাসীদের হয়ে ভাবা, অপমান করা বন্ধ করে পারস্পরিক সম্মান সমঝোতার উপর দাঁড়িয়ে একটা মন্ত্র-ঐক্য ভোট তো হোক। এখনি এটা হবে না তা গ্রিক, কিন্তু গুরুটা তাঁর একটা চেষ্টা করা অতীব জরুরি। এটা এই সময়েরও দাবি।

হরিশঙ্কর জনদাস তাঁর বিভূষিত জীকন গাথা লিখতে গিয়ে লিখেছেন—তিনি চট্টগ্রাম শহরের আলি গলিতে একটা ভাড়া বাসার সম্মুখে বাসা খুঁজে বেড়িয়েছেন পাগলের মত। শুধু তাঁর জাতি পরিচয়ের জন্য কেউ তাকে ঘর ভাড়া দিতে রাজি হয়নি। তখন তিনি কলেজ শিক্ষক। তবু তিনি সামাজিক বিচারে 'ভদ্রলোক' নন। কারণ জাতিতে তিনি যে কৈবর্ত। অবশেষে এক মুসলমান সহায় ভদ্রলোক তাঁকে ভিন ভলার একটা দ্রাঘি ভাড়া দেন। আর কি আশ্চর্য সেখানে তাঁকে বাঙ্গ বিদ্রোপে মেতে ওঠে একজন হিন্দু পড়শি। লিখেছেন হরিশঙ্কর—'আমাদের ওই দ্রাঘিট একটা মাত্র বারান্দা ছিল। গুটিই আমাদের শ্বাস ফেলার জায়গা, স্বস্তির স্থান। ঘরের ভেতরে আমরা যখন হাপিয়ে উঠতাম তখন ওই ক্ষুদ্র বারান্দায় গিয়ে বসতাম অথবা দাঁড়াতাম। অল্প কিছুকালের মধ্যে ওই বারান্দায় দাঁড়ানো আমাদের কাছে নরক যন্ত্রণা হয়ে উঠত। বারান্দা যদিকে ঠিক তার নিচে গলির ওপারে ঢিল ছোঁড়া দ্রুতই সপরিবারে বাস করত ডুমুর দাশ। ডুমুর আমাদের দিকে তাকিয়ে সুর করে বলতে থাকত—'ফউয়ার জাত, ফউয়ার জাত হালার জাত, জাইল্যার জাত।' কেন এই অপমান? এদব কবে বন্ধ হবে? সেই স্থূল জীকন থেকে হরিশঙ্করদের এই

অপমান ধারাবাহিক ভাবে নিরন্তর চলেছে তো চলেছে। অখ্যাপক হবার পরেও থামার নামই নেই। হিন্দুদের বিরুদ্ধে লাড়াই করে মুসলমানরা একটা পাকিস্থান আদায় করেছে এবারে কি দলিতদের একটা দলিতস্থান তৈরির জন্য রক্ত বারাতো হবে। তবেই কি হিন্দুরা উচিত শিক্ষা পাবে?

আমি নিজেও এই কর্ণ ঘণার শিকার। খণ্ডিত বাংলার ওলার অংশের খাঁচায় পোড়া মুর্গির মত যান্নের জীকন, সে ভুলে গেছে তাঁর পূর্ব পাপ। যে কারণে দেশটা টুকরো হয়েছে। ভুলে গেছে - বেঁচে আছে মুসলমানদের দরায়। আর স্থূল কাল বিনয়রন হয়ে ঠোকরাজে তাঁর মতই আর এক খাঁচার জীব, খানিক কমজোর - হরিশঙ্করদের মত নিরপরাধকে। আর আমি অত্যাচারিত হয়েছি পূর্ব পাপের বোসারং দিতে ঘর বাড়ি জন্মভূমি সব ফেলে চোবের মত এপার বাংলার পালিয়ে আনা কর্ণ প্রভুদের হাতে। মানুষকে ঘৃণা অপমান করার জন্য কম মূল্য দিতে হয়নি। তবু তাঁদের শিক্ষা হয়নি। আমিও এক দেশহারা আমিও হিন্দু তা মনে না রেখে মনে রেখেছে আমি নিম্নবর্ণ অজ্ঞে অস্পৃশ্য। আমাকে অকারণে অত্যাচার করাতেই তাদের অসীম সুখ।

দলিত সমাজের সবারই এই অপমান অত্যাচার সহ্যেতে হয়। তবে কারো কারো চামড়া এত মোটা যা ভেদ করে সে অপমান মর্মমূলে পৌছাতে পারে না। যার পৌছায় সে সঠিক আখ্যাত কোথায় করতে হবে জায়গা জানে না। কসাইয়ের খোঁটায় বঁধা খাসী পাঁঠা যেমন ঘাড় বঁকিয়ে নিজেরা নিজেরা গুঁতোঘাতি করে তেমনি নিম্নবর্ণেরা নিজেরা খোরোখেরি করে মারে।

আমি অনেক কাল দণ্ডকারণ্য ছিলাম। ওখানে সবই প্রায় নিম্নবর্ণ - নম পৌদ। এক কারণে দেশ ছাড়া এই জাতির মানুষ। তবু কারো প্রতি কারো কোন সহানুভূতি নেই। এক প্রতিবেশী আর এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে নিপাতি আপসে ধার নিলে সুখ দিতে হবে। একশত টাকার মাসে দশ টাকা, না হলে মিলবে না। এক প্রতিবেশীর সাথে আর এক প্রতিবেশীর তুচ্ছতিতুচ্ছ কারণে কপড়া বিবাদ - মারামারি - মাথা ফাটাকাটি। শুধু পারল কোটের শরণার্থীদের জন্য কাকের খেঁক সরিয়ে এনে একটা লিংক কোর্ট তন্নু প্রতাপ পুরে বসাতে হয়েছে এদের মামলা জালবার জন্য। এরা আদিবাসীদের সাথে তো মেলেমেলে না-তাদের মানুষ বলে

মনেই করে না, নিজেদের মধ্যেও দুড়াস্ত লড়াই। সে লড়াই রাজনৈতিক হলে একটা মানে বোঝা যেত। তা নয়।

এখানকার সব বাঙালি বিজেপির সমর্থক। মুসলমান বিদ্রোহ, কংগ্রেস বিদ্রোহ, দেশভাগ, আদিবাসীদের প্রতি শঙ্কা, এইসব কারণে এরা বিজেপি। বিজেপির ব্রাহ্মণ্যবাদী চরিত্র অবজ্ঞাত থাকায় এখানকার নারায়ণপুর বিধানসভা সিট - নিম্নবর্ণ শরণার্থী ভোটের সব দিন বিজেপিই জেতে।

শরণার্থীদের লড়াই শুরু গৌসাই নিয়ে। প্রধানত অনুকূল ঠাকুর আর সত্যানন্দ গৌসাই এরাই বড় প্রতিপক্ষ। তারপর হরিচাঁদ, বালক ব্রহ্মচারী, নীলকণ্ঠ গৌসাই, আরো যে কত। সবার শিষ্য-শেলার দাবি তাদের গুরুই হচ্ছে জগতের ত্রাণকর্তা। বাকি সবাই ঠগ জোচ্ছোর জালিয়াত। ভিলেজে ভিলেজে সেই নিয়ে বাদ বিবাদ।

কি হে ত্রাণ তাঁরা করেছে আর করবে সে জানে বাবা ভগাই। ময়সুর ঠেকাতে পারেনি, দাঙ্গা - দেশভাগ ঠেকাতে পারেনি। ছুস্তিগড়ে নন পৌঁদরা সিডিউলড কাস্ট সার্টিফিকেট পায় না। নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এক গুরু শেষ দুটো তো করে দেখাক। তবে তো বুঝি। তবু নাকি তাঁরা ত্রাণ কর্তা। এই গুরু নিয়ে লড়াইয়ে নম পৌঁদরা।

যতদিন নিজেদের এই লড়াই না থামবে যতদিন দলিত ঐক্য গড়ে না উঠবে আমাদের মুক্তি নেই।

সন্তান উৎপাদনের আচার অনুষ্ঠান বৃহদারণ্যক উপনিষদ (ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণ) বাংলা ভাষান্তর : আশীষ লাহিড়ী

- ১। মৃত্তিকাই এই সকল সন্তান সারবস্ত্র; আর মৃত্তিকার সারবস্ত্র হল জল; জলের সারবস্ত্র হল উদ্ভিদ; উদ্ভিদের সারবস্ত্র হল ফুল; ফুলের সারবস্ত্র হল ফল; ফলের সারবস্ত্র হল মানুষ; আর মানুষের সারবস্ত্র হল বীজ।
- ২। এবং প্রজাপতি নিজের মনে ভাবলেন : 'এবার মানুষের জন্য আমি একটা দৃঢ় আবাস নির্মাণ করে দেব।' অতএব তিনি নারীকে সৃষ্টি করলেন। নারীকে সৃষ্টি করার পর, তিনি নারীর অধোদেশকে উপাসনা করলেন। তাই সকলের উচিত নারীর অধোদেশকে উপাসনা করা। সম্মুখপানে যেটি প্রসারিত হয় সেটিকে তিনি স্বয়ং প্রসারিত করে সেটির সাহায্যে নারীকে গর্ভবতী করলেন।
- ৩। নারীর অধোদেশ হল (যজ্ঞের বেদী) : নারীর রোম হল (যজ্ঞের দুর্বা); তার ত্বক হল সোমরস পেটাইয়ের কল। তার যোনির দুটি মুখ হল কেন্দ্রস্থ যজ্ঞাগ্নি। বস্তুত, যে-ব্যক্তি বাজপেয় যজ্ঞ করে সে যেমন এই বিরাট পৃথিবী ভোগ করে, তেমনই যে-ব্যক্তি এই কথা অবগত হয়ে যৌন সংগম অনুশীলন করে সেও সমান ফল ভোগ করে; সে নারীর সূকৃতিসমূহকে নিজের দিকে টেনে নেয়; কিন্তু যে-ব্যক্তি এই কথা না জেনে যৌন সংগম অনুশীলন করে, নারীই তার সূকৃতিকে নিজের দিকে টেনে নেয়।
- ৪। বস্তুত, উদালক আরুণি নিচের কথাগুলি বলবার সময় ঠিক এই কথাই জানতেন : বস্তুত, নাক মৌদগল্য নিচের কথাগুলি বলবার সময় ঠিক এই কথাই জানতেন : বস্তুত, কুমার-হরিত নিচের কথাগুলি বলবার সময় ঠিক এই কথাই জানতেন : বহু ব্রাহ্মণবংশীয় নম্র মানুষ পুরুষত্বহীন ও গুণহীন অবস্থায় এই পৃথিবী ত্যাগ করে; তারা ওই কথা না জেনে যৌন সংগম অনুশীলন করে। নিদ্রিত অথবা জাগ্রত অবস্থায় এতটুকুও বীৰ্য যদি স্থলিত

হয়,

- ৫। তাহলে তা স্পর্শ করে অথবা (স্পর্শ না করে) তার এই কথাগুলি আকৃতি করা উচিত : 'আমার যৌকু বীর্ষ মাটিতে পড়েছে, যা কিছু উদ্ভিদের দিকে গড়িয়ে গেছে, যা কিছু জলের দিকে গড়িয়ে গেছে, আমি সেই বীর্ষকে পুনরুদ্ধার করছি, আমার তেজ আবার ফিরে আসুক, আমার জেলা আবার ফিরে আসুক, আমার উজ্জ্বলতা আবার ফিরে আসুক। অগ্নি আর বেদী বেন পুনরায় তাদের প্রচলিত জায়গাতেই থাকে'; (এই কথা বলে) সে বেন তার অনামিকার আংটি আর বৃদ্ধাস্থুঠ দিয়ে 'ওটি তুলে নিয়ে বৃকের মাঝখানে অথবা দুই ভুরুর মাঝখানে ঘষে।

- ৬। এবার যদি কেউ জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে সে বেন (নিচের) স্তোত্রটি পাঠ করে। (দেবতারার বেন) আমার মধ্যে উজ্জ্বলতা, তেজ, যশ, সম্পদ ও গুণের আধিষ্ঠান ঘটান। বস্তুত, নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে যখন সে তার নোংরা কাপড় ছেড়ে ফেলে। অতএব নোংরা কাপড় ছেড়ে ফেলে নারী যখন সুন্দর, তখন পুরুষ এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলবে।

- ৭। যদি নারী সেই পুরুষের কামনা মেটাতে অস্বীকার করে, তাহলে নারীকে ঘুষ দিতে হবে। তাতেও যদি সে ওই পুরুষের কামনা মেটাতে রাজি না হয়, তখন পুরুষটি তাকে লাঠি দিয়ে বা হাত দিয়ে মারবে এবং সৌর্যমন্ডিত শক্তি সহযোগে তাকে এই বলে অধিকার করবে : 'আমি তোমার গৌরব কেড়ে নিলাম' এইরূপে সেই নারী গৌরবহীনা হবে।

- ৮। যদি নারী পুরুষটির কামনা মেটাতে রাজি হয়, তখন পুরুষটি বলবে, 'শক্তি আর গৌরব সহযোগে' 'আমি তোমায় গৌরব প্রদান করলাম।' তখন তারা উভয়ে গৌরবান্বিত হবে।

- ৯। যখন কোনো পুরুষ একটি নারীকে (এই ভেবে) কামনা করবে যে সে আমার সঙ্গে প্রেম উপভোগ করুক, তাহলে নারীর অঙ্গে উপস্থ প্রবেশ করিয়ে সে এই কথা জগ করবে: 'যে তুমি অঙ্গ হতে উৎসারিত হয়েছে, যে

তুমি হৃদয়ের অভ্যন্তর হতে উদ্ভিন্ন হয়েছে, সেই তুমিই সকল অঙ্গের সারবস্তু, এই নারীটিকে ছিন্ন করে আমার মধ্যে বিষ-মাখানো তীরের ফলার মতো গোঁথে দাও।'

- ১০। আর যদি কোনো পুরুষ নারীকে (এই ভেবে) কামনা করে যে ও বেন অন্তঃসত্ত্বা না হয়, তাহলে নারীর অঙ্গে উপস্থ প্রবেশ করানোর পর মুখের সঙ্গে মুখ সংযুক্ত করে পুরুষটি আগে নিঃশ্বাস টেনে নেবে, তারপর নিঃশ্বাস ছাড়বে এবং বলবে : 'শক্তি সহযোগে, বীর্ষ সহযোগে আমি তোমার কাছ থেকে এই বীর্ষ প্রত্যাহার করে নিলাম।' এইভাবে নারী বীর্ষ-যুক্ত হবে।

- ১১। আর যদি কোনো পুরুষ নারীকে (এই ভেবে) কামনা করে যে 'ও অন্তঃসত্ত্বা হোক', তাহলে নারীর অঙ্গে উপস্থ প্রবেশ করানোর পর মুখের সঙ্গে মুখ সংযুক্ত করে পুরুষটি আগে নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে, তারপর নিঃশ্বাস টেনে নেবে এবং বলবে, 'শক্তি সহযোগে, বীর্ষ সহযোগে আমি তোমার মধ্যে বীর্ষ নিক্ষেপ করলাম।' এইভাবে নারী অন্তঃসত্ত্বা হবে।

- ১২। যদি কোনো পুরুষের স্ত্রীর একজন প্রেমিক থাকে এবং যদি পুরুষটি তাকে ঘৃণা করে (তাকে আহত করতে চায়), তাহলে একটি কাঁচা মাটির পাত্রে আগুন রেখে বিপরীত ক্রমে বাঁশের তীরের একটি আন্তরণ রচনা করতে হবে, তারপর এই তীরগুলিতে ঘি মাখিয়ে বিপরীত ক্রমে উৎসর্গ করতে হবে আর সেই সঙ্গে বলতে হবে, 'তুমি আমার অগ্নির মধ্যে উৎসর্গীকৃত হলে। হে অমুক, আমি তোমার পুত্রগণকে ও গোবনকে হরণ করলাম। তুমি আমার অগ্নির মধ্যে উৎসর্গীকৃত হলে; হে অমুক, আমি তোমার প্রাণাশাসমূহ হরণ করলাম। বস্তুত, পুরুষত্বহীন ও অকৃতী অবস্থায় সে এই জগৎ ত্যাগ করে। অতএব যে-লোক বেদজ্ঞ, যে এই কথা জানে, তার পত্নীর সঙ্গে কেলি করার বাসনা কারো পোষণ করা উচিত না। কারণ যিনি এই কথা জানেন তিনি বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন।

- ১৩। যখন কারো স্ত্রী মাসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হবে, তখন সেই স্ত্রী তিনদিন কাঁসার পাত্র থেকে পান করবে না, পরিষ্কার পোশাকও পরবে না। নিচু জাতের কোনো পুরুষ বা নিচু জাতের কোনো স্ত্রীলোক তাকে ছোঁবে না। তিন রাত্রির পর সে স্নান করবে এবং তখন তাকে দিয়ে চাল গুঁড়ো করাতে হবে।
- ১৪। যদি কেউ কামনা করে যে তার পুত্রের গায়ের রঙ হোক ফর্সা, সে যেন বেদ পাঠে পারঙ্গম হয়, সে যেন পূর্ণ আয়ুষ্কাল জীবিত থাকে, তাহলে তাদের উচিত, দুধে-রাঁধা অন্ন ঘূতের সঙ্গে মিশিয়ে আহ্বার করা, এটা করলে তারা (সেই পুত্র) উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।
- ১৫। আবার যদি কেউ কামনা করে যে তার পুত্রের গায়ের রঙ হোক কপিল পিঙ্গল, সে হবে দুটি বেদ পাঠে পারঙ্গম, সে যেন পূর্ণ আয়ুষ্কাল জীবিত থাকে, তাহলে তাদের উচিত দধি-পঙ্ক অন্ন ঘূতের সঙ্গে মিশিয়ে আহ্বার করা, এটা করলে তারা (সেই পুত্র) উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।
- ১৬। আবার যদি কেউ কামনা করে যে তার পুত্রের গায়ের রঙ হোক কালো, চোখ দুটি হোক রক্তবর্ণ, সে যেন তিনটি বেদ পাঠে পারঙ্গম হয়, সে যেন পূর্ণ আয়ুষ্কাল জীবিত থাকে, তাহলে তাদের উচিত জলে-রাঁধা অন্ন ঘূতের সঙ্গে মিশিয়ে আহ্বার করা, এটা করলে (সেই পুত্র) উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।
- ১৭। আবার যদি কেউ কামনা করে যে তার একটি কন্যা হোক, সে যেন সুশিক্ষিতা হয়, সে যেন পূর্ণ আয়ুষ্কাল জীবিত থাকে, তাহলে তাদের উচিত তিলের সঙ্গে ভাত রেঁধে ঘূতের সঙ্গে আহ্বার করা, এটা করলে তারা (সেই কন্যা) উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।
- ১৮। আবার যদি কেউ এমন এক পুত্র কামনা করে যে হবে পণ্ডিত, বিখ্যাত, বহু সমাবেশে যাতায়াতকারী, যে হবে মধুরভাষী, যে সবকটি বেদ পাঠে পারঙ্গম হবে, যে পূর্ণ আয়ুষ্কাল জীবিত থাকবে, তাহলে তাদের উচিত মাংসের - হয় বাছুরের নয় গোমাংসের—সঙ্গে রাঁধা অন্ন ঘূত সহযোগে

ভক্ষণ করা, এটা করলে তারা (সেই রকম পুত্র) উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।

- ১৯। এবার সকালের দিকে স্থালীপক্কর উপযুক্ত নিয়মানুসারে যি প্রস্তুত করে সে স্থালীপক্ক গ্রহণ করে নৈবেদ্য দান করে প্রার্থনা করবে—হে অগ্নি, হে অনুমতি, হে দীপ্যমান সূর্য যিনি সত্যের স্রষ্টা। নৈবেদ্য দেওয়া হলে পর সে (রান্না-করা খাদ্যের বাকি অংশ) আহ্বার করবে। আহ্বার হয়ে গেলে খাদ্যের বাকি অংশ সে তার পত্নীকে দেবে। হাত ধুয়ে, জলপাত্র পূর্ণ করে, সে তিনবার তার স্ত্রীকে জলসিক্ত করবে এবং বলবে, 'বিশ্ববসু, এখান থেকে উঠে এসো; অন্য কোনো যুবতীর সন্ধানে যাও, পতির কাছে রয়েছে এমন স্ত্রীর কাছে যাও।
- ২০। তারপর সে স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে বলবে, 'আমিই হলাম প্রাণশ্বাস, তুমি হলে বাক; আমি হলাম সামন, তুমি স্বর্ণ। আমি হলাম স্বর্ণ, তুমি পৃথিবী। এসো আমরা একত্রে উদ্যমশীল হই, রেতঃ মিশ্রিত করি, তাতে করে আমরা একটি পুত্রসন্তান লাভ করতে পারি।'
- ২১। তারপর সে তার স্ত্রীর দুই উরু প্রসারিত করে বলবে, 'স্বর্ণ ও মর্ত্য, প্রসারিত হও।' তারপর স্ত্রীর অঙ্গে উপস্থ প্রবেশ করিয়ে, মুখের সঙ্গে মুখ সংলগ্ন করে সে তার স্ত্রীর দেহের কেশ বরাবর তিনবার হাত বুলিয়ে বলবে, 'বিশ্ব এই গর্ভকে প্রস্তুত করন, ত্বঙ্কু বিবিধ আকারকে রূপ দিন। প্রজাপতি ভিতরে প্রবাহিত হোন। ধাতু তোমার জন্য বীজ রোপণ করন। হে সিনীবালী, বীজ দাও; হে প্রশস্ত-কেশদামযুক্তা নারী, বীজ দাও। মন্তকে পদ্মমালা-বিজড়িত অশ্বিনদ্বয় যেন বীজ রোপণ করেন।
- ২২। অশ্বিনদ্বয় স্বর্ণদন্তযুগলের ঘর্ষণজাত কুণ্ডলী আকৃতির শিখা নির্গত করে। আমরা প্রার্থনা করি সেই বীজ যেন দশম মাসে জন্ম লাভ করে। পৃথিবী যেমন অগ্নির বীজ ধারণ করে, ঝড় (ইন্দ্র) যেমন স্বর্ণকে গর্তিনী করে, বায়ু যেমন নিক্সমুহুরে বীজ, ঠিক তেমন করেই আমি এই বীজ তোমার গর্ভে স্থাপন করি, হে অমৃতা।

- ২৩। স্ত্রীর সন্তান প্রসবের কালে স্বামী তার গায়ে জল সিঁধন করে বলবে : 'বায়ু যেমন একটি পয়ের সকল পার্শ্বকে আন্দোলিত করে, তোমার শূণ্ডে যেন সেইভাবে নাড়াচড়া করে এবং শূণ্যচ্ছাদন সমেত বেরিয়ে আসে। ইজর এই ভাঁজটিকে ঘিরে একটি আচ্ছাদন গড়ে দেওয়া হয়েছে। হে ইজর, শিশুটির সঙ্গে সঙ্গে সেটিকেও বার করে দিও।'
- ২৪। পুত্রের জন্মের পর পিতা অগ্নি রচনা করে শিশুটিকে কোলে নিয়ে একটি কাঁসা পায়ে দই আর ঘি রেখে সেই দই ও ঘি সহযোগে বারংবার প্রার্থনা করবে : 'এই পুত্রের মধ্যে দিয়ে যেন আমার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে এবং এইরকম সহস্র পুত্রকে যেন আমি আমার গৃহে পুষ্টিদান করতে পারি। সৌভাগ্যবান এই বংশে কখনো যেন সন্তান আর গবাদি পশুর অভাব না ঘটে। স্বাহ। আমার মধ্যে যেসব প্রাণশক্তি আছে তা আমি মানসিকভাবে তোমাকে প্রদান করলাম। যেসব কাজে আমি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি আর যেসব কাজ আমি খুব সামান্যই করেছি, সর্বজ্ঞ ও সর্বমঙ্গলময় অগ্নি সেসবকেই যেন সকলের উপযুক্ত ও শুভ করে নেন। স্বাহ।
- ২৫। তারপর শিশুটির ডানদিকের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে পিতা তিনবার বলবে, 'বাক্, বাক্।' তারপর দই, মধু আর ঘি মিশিয়ে একটি সোনার চামচে করে সে শিশুটিকে খাওয়াবে, কিন্তু চামচেটিকে শিশুর মুখের ভিতর ঢোকাবে না। পিতা বলবে : আমি তোমার মধ্যে এই পৃথিবীকে স্থাপন করলাম, আমি তোমার মধ্যে এই বায়ুমণ্ডলকে স্থাপন করলাম, আমি তোমার মধ্যে এই স্বর্গলোককে স্থাপন করলাম। পৃথিবী, বায়ুমণ্ডল আর স্বর্গলোক, এ সবই আমি তোমার মধ্যে স্থাপন করলাম।
- ২৬। অতঃপর সে শিশুটিকে একটি নাম দেবে এবং বলবে, 'তুমিই বেদ।' এইভাবে ওটিই তার গোপন নাম হয়ে যাবে।
- ২৭। তারপর সে পুত্রটিকে মায়ের হৃদয়ে তুলে দেবে এবং তার মুখে মায়ের স্তন স্থাপন করে বলবে : 'সরস্বতী, তোমার এই স্তন, যা অকণ্ঠ এবং ক্রান্তিহীন, সমৃদ্ধিশালী, অফুরাণ, যা সকল যোগ্য প্রাণীকে অবিরলধারে পুষ্টি

জোগায়, এখন চোষণ করবার জন্য সেই স্তন (আমার সন্তানকে পান করাবার জন্য আমার স্ত্রীকে) দাও।

- ২৮। অতঃপর সে শিশুর মাতার উদ্দেশে বলবে : 'তুমি ইলা, তুমি মিত্র ও বরুণের বংশজাতা। তুমি বীরাসনা, তাই বীর প্রসব করেছ। যে-তুমি আমাদের পুত্রসন্তান রূপে এক বীর দান করেছ, সেই তুমি আরো বহু বীরের জননী হও।' এমন পুত্র সম্বন্ধেই লোকে বলে : 'তুমি তোমার পিতাকে অতিক্রম করে গেছ; তুমি তোমার পিতামহকে অতিক্রম করে গেছ।' প্রকৃতই, এই বিষয়ে অবহিত ব্রাহ্মণের যে পুত্র জন্ম নেয়, সে সমৃদ্ধি, যশ আর পবিত্র জ্ঞানের সর্বোচ্চ চূড়া স্পর্শ করেছে।

ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ : আশীষ লাহিড়ী। উৎস : S. Radhakrishnan, The Principal Upanisads, Indus, New Delhi, 1994; E. R. Hume, The Thirteen Principal Upanishads, OUP, (1921).
কৃতজ্ঞতা : রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

(ভারতের প্রাচীন দর্শনের একটি ক্ষুদ্রাংশের অনুবাদের কারণ পাঠান্ত্রে বোধগম্য হবে, ফলে কোনও মতামত প্রয়োজনহীন—সম্পাদক)

বাংলায় ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থার প্রাচীনত্ব এবং স্থায়িত্ব

সুনীল কুমার রায়

ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসূত্রসমূহে 'বাংলা ব্রাহ্মণ্য-বর্জিত দেশ'। বৈদিক সাহিত্যের একস্থানে এখানকার তিনটি প্রাচীন জাতির নাম এইভাবে উল্লেখিত হয়েছে —

“বঙ্গা ব্রাহ্মণ্যেভ্যপালাঃ।” — [ঐতরেয় আরণ্যক ২/১/১।]

অর্থাৎ বঙ্গ, বঙ্গা ও চেরপাঙ্গরা বাংলার প্রাচীন অধিবাসী। অন্য স্থানে পৌণ্ড্রা স্খ্যামেই উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং প্রাচীনকালের বাংলায় চারটি প্রধান জাতি বাস করতেন বলে বৈদিক সাহিত্যে ঘোষিত হয়েছে।

পরবর্তী স্মৃতি সাহিত্যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ এবং চৌরাস্তুপসহ সমগ্র দক্ষিণাভ্যন্ত্র ব্রাহ্মণ্যদের অঙ্গম্য [অনুস্মৃতি ১/১/১৪]। তারপর মহাকাব্যে এতলি স্নেহভেদেণ, তবে এই স্নেহভা অঙ্কুর রত্ননিপুন এবং গজ যুগে অপরাধের [মহাভারত : কর্ণপর্ব ১৭/২-৪] আর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তাঁদের প্রেরিত মহামূল্যবান উপহার সামগ্রীর শিলাভংগ এই দেশগুলির অর্থনৈতিক, প্রযোজিক এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির বর্ণনায় রাজকীয় যজ্ঞটি হানি হুয় গোছে। রানায়ণও বঙ্গের ধর্মশাস্ত্রের বর্ণনায় মুখ্য [অথোধ্যাক্যাক। দশমসর্গ। স্লোক ৩৭-৩৮]।

সুতরাং প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক, প্রযোজিক এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতে এখানকার 'স্নেহভেদেণ' নিরঙ্কুর অবদান ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র সাহিত্যে অকুণ্ডলপেই স্বীকৃত হয়েছে। তাছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের সূচনায় পতঞ্জলি বঙ্গবাসীদের আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যে পারদর্শিতার বর্ণনায়ও তাঁদের 'অঙ্গুর' এবং স্বাংস্কৃতিক অবদানের চরম দৈবীকরণে উপস্থাপিত করেছেন। [মহাভাষ্য ১/১/১]। মহাকাব্যে কলিঙ্গাস সেই নৌবাণিজ্যের সঙ্গে শালিধান ও ইক্ষুচায়ে বঙ্গবাসীদের অসাধারণ দক্ষতার [রঘুবংশম, চতুর্থ সর্গ, স্লোক ২০, ৩২-৩৬] পরিচয় তুলে ধরতে একই উল্লেখ করেছেন। তারপর থেকে বাঙালি ব্রাহ্মণ্যদের স্মৃতিশাস্ত্র মুখালি পর্যন্ত (বৃহদ্রত্নপুরাণম এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম) কোন সংস্কৃত উৎসে বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়ন ব্রাহ্মণ্য অবদানবাক্য একটা প্রসঙ্গও নেই। তার ফলে সম্প্রতিভাবের জন্য যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় ভাবাদর্শ জীবন-বিমূখ ও সমাজ এবং সভ্যতার অগ্রগতির পরিপন্থী বলে সম্পদ অষ্টকালের অযোগ্যতার মূল্যে এখানে

গণ্যগণ্যমান ঘটেছে।

সেই জন্য বাংলার 'বঙ্গ', 'বঙ্গা' ও 'চেরপাঙ্গরা' এবং তাঁদের সংযোগী সম্পর্কবিশিষ্টা বর্তমান ব্রাহ্মণ্যতাত্ত্বিক ও অন্য ধর্মীয় ভাবাদর্শ মুক্ত এবং সম্পদসুপ্তির কর্মপ্রবাহের অভিজ্ঞতাসূত্রে বঙ্গবাসী সত্ত্বায় অতিক্রম ছিলেন ততদিন তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিকৃৎসনতার সমগ্র বাঙালি সমাজকে পুষ্ট করে পৃথিবীর প্রথম জৌহরীগলন করখানা স্থাপন (বীরভূম জেলার কাছিরীতে চন্দ্রবজ্রের ভাঙ্গা) [Gautam Sengupta and others, Eloquent Earth, p-6], তাৎক্ষলিগু, গঙ্গা (চন্দ্রকোণ্ডপাড়), সন্দীপ ও চট্টগ্রাম বঙ্গের গঠন, প্রথমে 'প্রাচ্য' এবং পরে 'সংস্কৃত' নামক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জের জনগণের প্রকাশন প্রতিষ্ঠা এবং [মহাভারতগড় লিপিলিখন], দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, সিংহল (শ্রীলঙ্কা), মিশর, যথাক্রমে এবং ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্য প্রচলন [Indian Museum Bulletin XXV (1990), p-17] প্রভৃতি বিরলকীর্তির অধিকারী করে তুলেছিলেন।

এই বঙ্গবাসী মানুষদের বঙ্গবঙ্গেরা এখনও আছেন এবং বঙ্গবাস্যাই আছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ঐতিহাসিক ইন্ডোল তাঁদের চৌরসনয় ঐতিহ্যের ভাঙারহকে শূন্যে বিলীন করে দিয়েছে। এদের মধ্যে 'বঙ্গ' বা হলেন নমোজাতির মানুষ। মুখ্য ভাষার 'উচ্চভূমি'-র নির্দেশক নামগদ্য 'বোঙ্গা' থেকে বঙ্গ জাতি নামের উদ্ভব ঘটেছে। [P.C. Bagchi, Pre-Aryan and Pre-Dravidian, p-72.] সুদূর অতীতে নমোরো খেটনাগপুত্র মালভূমি সন্নিহিত পুরাত্নে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তখন খেটনাগপুত্রের মুভাভাষী আদিবাসীরা তাঁদের 'উচ্চসনভজের আদিবাসী' আর 'বঙ্গ' নামে অভিহিত করেছিলেন। নৌহস্তযুক্ত আবিষ্কারের পর তাঁরা চলে আসেন গাঙ্গেয় ব-বীপে। [বিলিপ কুমার চক্রবর্তী, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ভূগোল, পৃ: ৩১]। 'চর্যাপদ'-এর ৩৬ এবং ৪৮তম পদ [মুদ্রারাক্ষস বসু, চর্যাপদ, কলকাতা বুক ডিপো] থেকে জানা যাচ্ছে যে, 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গবাসী' এবং 'চলজী' অভিন্ন। আর সত্যকোই জানেন, উক্ত ভারতের ব্রাহ্মণ্যরা তাঁদের বাংলার প্রাধান্যবিশিষ্টের চূড়ান্ত বিব্রোষী অপরাধের নমোদের গোপন শাস্ত্র 'চলজী' নামক গ্যালিতে চিত্রিত করেছিলেন এবং পরে বৌদ্ধরা তা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র থেকে ধার করেছিলেন। এখন তো 'বঙ্গ' শব্দটি সর্বত্র বাঙালিকেই নির্দেশ করছে, কিন্তু

গুরু যজুর্বেদ-এ [ত্রিংশ অধ্যায়, শ্লোক ২১ ও ২২] 'চণ্ডাল' শব্দটি উল্লেখের পূর্বে ঐতরেয় আরণ্যকে 'বঙ্গ' স্পষ্টভাবে অর্থে সংহিতার [১/৫৩/৭-৮] মতই নমোজাতিকে সূচিত করেছে।

'বগধ' এবং 'চেরপাদ' জাতিবাচক শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় গবেষণা সাপেক্ষ; তবে বাংলার প্রাচীনতম বৃহৎ জনসংখ্যা বিশিষ্ট বাগদি জাতিকে 'বগধ' নামে ধনিসাদৃশ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী যেভাবে সনাক্ত করেছিলেন তাকে সঙ্গত বলে মনে করি। অতএব অন্য বৃহৎ প্রাচীন জাতি বাউরিরা ঐতরেয় আরণ্যক-এ 'চেরপাদ'-রূপে উল্লেখিত হয়েছেন বলে মনে হয়।

এইসব জাতির সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে বা সংস্কৃত সাহিত্যে যে বিবরণই থাক না কেন তা যেমালুম চেপে রেখে সেইসব শাস্ত্রীয় বংশ পরিচয়ে গর্বিত ব্রাহ্মণ্য ঐতিহাসিকরা এখন এই সব জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য এবং জাতির অস্তিত্ব পুরো অস্বীকার করছেন। এঁদের মধ্যে নমোরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁদের স্বনামে দূরে থাক গালিবাচক 'চণ্ডাল' নামেও জাতির পরিচয় এখনকার ইতিহাসে এই ভাবে অস্বীকৃত হচ্ছে —

"... before nineteenth century there was no caste in Bengal called the Chandala; it was only a generic term used to refer to a wide variety of lower caste people. Later on, the colonial administration and its ethnographers lumped together several such low-ranking occupational sub-castes and branded them as Chandala.

(উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলায় 'চণ্ডাল' বলে কোন জাত ছিল না; বহুখা বিভক্ত নিম্নসামাজিক অবস্থানের জনগোষ্ঠীকে একত্রে সাধারণভাবে 'চণ্ডাল' বলা হত। পরে ব্রিটিশ উপনিবেশিক প্রশাসকরা এবং জাতিতত্ত্ববিদরা তাঁদের মধ্য থেকে কতকগুলি নিম্ন সামাজিক স্তরের পেশাগত জনগোষ্ঠীকে একত্রে নিয়ে 'চণ্ডাল' জাতে পরিণত করেন [Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity in Colonial India, pp 19-20.]

এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে, (১) 'চণ্ডাল' জাতির অস্বীকৃতির কোন ভিত্তি নির্দেশিত নয়; (২) সাধারণ নামরূপে 'চণ্ডাল' শব্দের সামাজিক প্রচলনের

প্রমাণ ও কারণ অনুসন্ধানিত; এবং এ দুটিতে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রবাক্য অস্বীকৃত হলেও (৩) সামাজিক স্তরের উল্লেখ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শাস্ত্রের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, জাতীয়তাবাদী সাজতে গিয়েও ব্রাহ্মণ্য ঐতিহাসিকগণ এই সব অপকথাকে লিখতে প্রতিক্ষেত্রে উপনিবেশিক জাতিতত্ত্ববিদ এবং আমলা হাবিটি রিজলির অনুগত সেবকের ভূমিকা পালন করেছেন কিন্তু তাঁর পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যাবলি এবং যৌক্তিক বিশ্লেষণজাত মন্তব্যগুলি পরিহার করেছেন। যে কোন পাঠক

H. H. Risley, The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I, pp 183-198,

গ্রন্থখানিতে চোখ বুলিয়ে নিলে তা বৃকতে পারবেন।

এইভাবে 'চণ্ডাল' অর্থাৎ নমোজাতির অস্তিত্ব ও ঐতিহ্যকে অস্বীকৃতির সূত্রে 'বঙ্গ' জাতির গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অবস্থানের জন্য 'বঙ্গ'-ভিত্তিক 'বঙ্গদেশ', 'বাংলা', 'বাঙালি', 'বাংলাভাষা', 'বঙ্গোপসাগর', 'বঙ্গাল', 'বঙ্গালী', 'বাংলাদেশ' প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যস্তত উৎসটিকে অলীক কল্পনার উপজীব্য করে তোলার একটি মারাত্মক অপচেষ্টা লক্ষিত হচ্ছে। ইতিহাস নামক সমাজবিজ্ঞানকে অবাস্তবতার চর্চাক্ষেত্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই যে এমন অপচেষ্টা তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিজেদের 'আগমনবর্তা' ঘোষণার মধ্য দিয়েই ব্রাহ্মণরা বাংলায় এই অবাস্তবতার চর্চা সূচনা করেছিলেন।

বাংলায় বহির্বঙ্গ থেকে 'ব্রাহ্মণদের আগমনের প্রসঙ্গ' কুলপঞ্জিকার নামক এক শ্রেণীর পুঁথিতে আলোচিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য সমাজে এবং এখনও বস্তুত প্রায় সমগ্র বাঙালি সমাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই সব কুলপঞ্জিকার প্রভাব লক্ষিত হয়।

"বাংলাদেশের কুলপঞ্জিকা অনুসারে রাজা আদিশূরের আমন্ত্রণেই বিদেশীয় ব্রাহ্মণেরা বাংলার উপস্থিত হয়েছিলেন।" [দীনেশচন্দ্র সরকার, শিলালেখ-তাম্র শাসনাদির প্রসঙ্গ, পৃ: ১৩১]। এখানে 'বাংলাদেশের' এবং 'বিদেশীয়' শব্দ দুটি যে যথাক্রমে 'বাংলার' এবং 'বহির্বঙ্গ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

এর থেকে অনুমিত হয় যে, আদিশূর নামক একজন প্রবলপ্রতাপ ক্ষত্রিয়

রাজা বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলা আক্রমণ করেছিলেন এবং জয়লাভের পর তিনি তাঁর এই বিজিত রাজ্যে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য যে রাজ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে বৈদিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় সেখান থেকেই বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পরিবারকে আনিয়েছিলেন। তার ফলে আদিশূরের রাজত্ব কালেই বাংলায় ব্রাহ্মণ্যপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সমস্যা হল এই যে, এই অনুমানগুলি আদৌ প্রমাণসিদ্ধ নয়। কারণ —

১। বীরভূম জেলায় ক্ষুর অঞ্চলে “শূরবংশের রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু আদিশূর নামক কোনো নরপতির অস্তিত্ব বাংলার কোন ঐতিহাসিক উপাদান দ্বারা এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি।” — [ঐ, পৃ: ১৩২।]

২। ঐতিহাসিক কালপর্বে কোনদেশে নিষ্ঠাভরে বৈদিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হ'ত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

৩। “বাংলার কুলপঞ্জিকার বিবরণ ষোড়শ শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন নয়।” — [ঐ, পৃ: ১৩২]

৪। “বিভিন্ন কুলপঞ্জিকায় আদিশূরের যে বিবরণ দেখা যায় তা সর্বাংশে পরস্পর বিরোধী। এমনকি যে-বৎসর ঐ ব্রাহ্মণেরা বাংলায় উপস্থিত হন, তার উল্লেখ প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থে ৬৫৪, ৬৭৫, ৮০৪, ৮৫৪, ৮৬৪, ৯১৪, ৯৫৪, ৯৯৪ এবং ৯৯৯ শকাব্দের কথা বলা হয়েছে।” [ঐ, পৃ: ১৩১-৩২] অর্থাৎ কুলপঞ্জিকাগুলির দাবি অনুসারে ৭৩২, ৭৫৩, ৮৮২, ৯৩২, ৯৪২, ৯৯২, ১০৩২, ১০৭২ এবং ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন একটিতে বাংলায় এসেছিলেন। প্রায় ৩৫০ বৎসরব্যাপী ৯টি বিকল্পের মধ্যে সঠিক কোন সালটিতে বাংলায় ব্রাহ্মণরা তাঁদের প্রথম আগমনের দাবি জানাচ্ছেন তা নির্ণয় করার কোন উপায় নেই।

অতঃপর ব্রাহ্মণরা কারা কোথেকে এসেছিলেন বলে দাবি করেন সেটা জানা প্রয়োজন। বেদবিদ্যায় অর্থাৎ যাগযজ্ঞে পারদর্শী বৈদিক ব্রাহ্মণদের তিনটি ভাগ—কনৌজিয়া, পাশ্চাত্য ও দক্ষিণাত্য বৈদিক। কনৌজিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণদের কুলপঞ্জিকা অনুসারে তাঁদের পাঁচজন পূর্ব পুরুষ ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ৯৯৯ শকাব্দে বাংলায় অনীত হয়েছিলেন।

“... according to one set of Kuloji legends in about 1077 AD... five brahmanas, proficient in Vedic rituals, were brought to Bengal from Kanouja.” — [Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Politics and the Raj p-5.]

এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের পরিবারবর্গ রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় বাংলায় অনীত হয়েছিলেন বলে ধরে নিলেও ব্রাহ্মণ বর্জিত এবং ব্রাহ্মণনিষিদ্ধ পরিবেশে তাঁদের দ্বারা বৈদিক সংস্কৃতির প্রবর্তন করা সম্ভবপর ছিল না। তাজ্জড়া একাদশ শতাব্দির শেষ পর্বে কনৌজে যাগ-যজ্ঞের প্রচলনও ছিল না।

পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের কুলপঞ্জিকায় মুসলিম আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার এবং ধর্মরক্ষার জন্য দলে দলে তাঁদের আগমনের দাবি আছে।

“Another set of legends ... refer to Islamic invasion causing large scale emigration of brahmanas from the basin of the river Saraswati and their subsequent settlement in Bengal.” — [Do.]

মুসলিম আক্রমণের সহস্র বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবের সরস্বতী তীরবর্তী অঞ্চল ব্রাহ্মণ স্মৃতিশাস্ত্রে ‘শ্লেচ্ছদেশ’ রূপে পরিগণিত হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণে সেখানে মুসলিম আক্রমণ পূর্বে অবশ্যই যাগযজ্ঞের প্রচলন ছিল না। তা হলে কি সেই ‘শ্লেচ্ছদেশ’ থেকে আসা ‘শ্লেচ্ছ’তুল্য ব্রাহ্মণরা সমপর্যায়ের বাঙালি সমাজে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন? সেই মর্মে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণও নেই।

দক্ষিণাত্য বৈদিকদের দাবি, তাঁদের পূর্বসূরীরা কলিঙ্গ এবং দ্রাবিড় দেশ থেকে এসেছিলেন। দু-চারজন আসতেই পালেন ‘কলিঙ্গ’ এবং ‘দ্রাবিড় দেশ’ থেকে কারণ সেগুলিও ব্রাহ্মণ্য পরিভাষায় বাংলার তুল্য ‘শ্লেচ্ছদেশ’ এবং তাঁদের বাণিজ্যিক সংযোগও দীর্ঘদিনের; তবে বহু সংখ্যায় তাঁদের আগমন অপ্রামাণ্য। আর বাংলায় আগমন ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যকে বৃদ্ধি করে না।

এই সব বৈদিক বৃজব্রহ্মণের কাইরে রয়েছে সপ্তশতী ব্রাহ্মণরা। তাঁরা বাংলার আদি ব্রাহ্মণদের বংশধর বলে দাবি করেন।

The original seven hundred Brahman families of

Bengal were referred to as the Saptasati Brahmins." — [Do.]

তাদের এই স্বীকৃতিতেও তাঁরা অকুণ্ঠ নন—নিজদের পূর্বসূরীদের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে তাঁরা নির্বাক এবং সমাজে কখন তাঁদের অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার উল্লেখ করেননি। তাঁদের দেশজ স্বীকৃতি অবশ্য সঠিক। আর ব্রাহ্মণ্য বর্ণনার এই সব গৌজামিলের মধ্যে কুলপঞ্জিকার শেষদিকের সালগুলি কি বাংলার উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণ বরেন্দ্রে সেন বংশের রাজত্বকালে সমাজে ব্রাহ্মণ্য অধিপত্যের সূচনার ইঙ্গিত দিচ্ছে?

— সম্ভবত ইঙ্গিতটি তাই।

আমরা যে সভাবনার সন্ধান করেছি বঙ্গাল সেন-এর রচিত 'দানসাগর'—এর 'গ্রন্থকৃত পরিচয়ঃ' পরোক্ষে সেই সভাবনাকেই উজ্জ্বল করে তুলছে কারণ সেখানে তিনি নিজেকে ক্ষত্রচারিত্রচর্যা বিশ্ববন্দিত সেনবংশের সন্তানরূপে উপস্থাপন করেছেন [দানসাগরঃ (উপক্রমণিকা, শ্লোক ২)]। তাঁর এই পরিচয় থেকে জানতে পারি —

বঙ্গাল সেন ভিন্নরাজ্য থেকে আগত কোন আগ্রাসক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন না, ক্ষত্রিয়ের আচরণকারী সেন রাজবংশের সন্তান ছিলেন তিনি। পরবর্তী দুটি শ্লোকে বীরত্বের সঙ্গে তাঁর পিতামহ হেমন্ত সেনের এবং তাঁর পিতা বিজয় সেনের রাজ্য শাসনের উল্লেখ আছে। [এ, (শ্লোক ৩ ও ৪)]

এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে, উপসত্তভোগী সেন পরিবারের হেমন্ত সেন প্রথমে পাল রাজাদের সামন্ত ছিলেন। পাল শাসনের দুর্বলতার সুযোগে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং সেন রাজ বংশের পতন করেছিলেন।

আমাদের এই অনুমানের বাস্তব ভিত্তি হল এই যে, সেন রাজারা ব্রাহ্মণ-ব্যতীত আর যে দুটি সম্প্রদায়ের সংগঠিত শক্তির উপর নির্ভর করে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন সেই কায়স্থ ও বৈদ্যরা ততদিনে সংগঠিত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিলেন।

"কায়স্থ (লিপিকর) এবং বৈদ্য (চিকিৎসক) অবশ্যই বৃত্তি বা ব্যবসায় মূলক সম্প্রদায়। প্রথমে এই দুটি বৃত্তি কোন নির্দিষ্ট বর্ণে সীমাবদ্ধ ছিল বলে প্রমাণিত

হয়নি। ... গুপ্ত যুগের সূচনার পূর্বে কায়স্থ-সংজ্ঞক কর্মচারীর উদ্ভব; কিন্তু গুপ্ত রাজগণের আমলে কায়স্থ সম্প্রদায় গঠিত হয়নি। ...

নবম শতাব্দীর রাষ্ট্রকূট শাসনে বালভ কায়স্থ বংশ, দ্বাদশ শতাব্দীর গাহডবাল শাসনে শ্রীবাস্তবকুলোদ্ভব-কায়স্থ ইত্যাদির উল্লেখ হতে বোঝা যায় যে, মধ্যযুগের প্রথম ভাগেই কায়স্থগণ নানা স্থানে বৃত্তিমূলক শ্রেণীর পরিবর্তে একটি সাম্প্রদায়িক জাতিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল।" — [ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার, শিলালেখ-তাত্ত্বিক শাসনাদির প্রসঙ্গ, পৃ: ৪৫।]

একই কালপর্বে একইভাবে বৈদ্যরাও বৃত্তিমূলক শ্রেণী থেকে একটি সাম্প্রদায়িক জাতিতে যে পরিণত হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আর কুমারগুপ্তের আক্রমণে গৌড়ে এবং পুন্ড্র গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠার সূত্রে রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত কিছু সংখ্যক বহির্বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ অবশ্যই সেখানে এসেছিলেন কিন্তু অধিকসংখ্যায় স্থানীয় উপসত্তভোগী মানুষ যে ব্রাহ্মণে পরিণত হয়েছিলেন তারও প্রমাণ আছে। কুমার গুপ্তের শাসনকালের (৪১৪-৪৫৫ খ্রিঃ) কলাহিকুড়ি-সুলতানপুর তাম্রশাসনের নবম শ্লোকের 'কৈবর্তশর্ম' [এ, পৃ ৪৭] অবশ্যই কৈবর্ত থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত এক শর্মাজিকে উপস্থাপিত করেছে। এইভাবে যে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছিল তা সমাজ বিজ্ঞানীরা এখন বাংলার ব্রাহ্মণদের গোত্র বিশ্লেষণের ফলাফল থেকে সুনির্দিষ্ট ভাবেই জেনে গেছেন। তাঁরা জেনেছেন যে, এখনকার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ গোত্রই বাংলার নিজস্থ গোত্র।

"Inscriptions of the post-Gupta period from Bangladesh mention an increase of brahmana gotras which have been explained as resulting from the incorporation of people from local societies who were given brahmana status." [Romila Thapar, Cultural Pasts : Secularism and Society, p 1021.]

বাংলার সমাজ জীবনে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে এইভাবে ব্রাহ্মণায়িত মানুষদের মধ্যে পুরোহিত ও লিপিকরদের সংখ্যা চিকিৎসকদের থেকে অবশ্য বেশি ছিল না; কিন্তু এখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা বৈদ্যদের চেয়ে সংখ্যায় অনেকগুণ প্রবল। মুসলিম ও ব্রিটিশ আমলে এই সংখ্যাগত পরিবর্তন ঘটেছিল।

মুসলিম দলের সঙ্গে তাঁদের ইউনানি চিকিৎসকরা (হেকিমরা) এসেছিলেন বলে মুসলিম শাসকদের কাছে বৈদ্যরা কদর পাননি, কিন্তু অনুগত করণিক, সেনানী প্রভৃতি পেশায় স্বল্প বেতনে অধিক কাজের জন্য কায়স্থ ও ব্রাহ্মণরা অবশ্যই পছন্দের তালিকায় ছিলেন। সুতরাং সুযোগ সন্ধানী বাংলার উপসত্ত্বভোগীরা কায়স্থ ব্রাহ্মণদের দল ভারি করে শাসকদের শোষণের হাতিয়ার হয়েছিলেন। “বঙ্গতপস্কে ১৭১৩ সালের (খ্রিস্টাব্দের) পর উত্তর ভারত থেকে বাংলায় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী পাঠানো বন্ধ হয়ে যায় এবং তার ফলে দিল্লির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেও ছেদ পড়ে। এরপর থেকে মুর্শিদকুলি ও তাঁর উত্তরসূরীদের আর দিল্লি থেকে পাঠানো রাজকর্মচারীদের দেশের (বাংলার) শাসনযন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নই থাকল না। এর ফলে বাংলার নবাবদের নিজেদের ইচ্ছে মতো এবং পছন্দ মতো কর্মচারী নিয়োগ করার পথে কোনও বাধা রইল না।” [সুশীল চৌধুরী, পলাশির অজানা কাহিনী, পৃ: ১৪]। নবাবদের এই পছন্দসই কর্মচারীরা যে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ নামক হিন্দু ছিলেন তা লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস রেকর্ডে ওরমে সংগ্রহেও (Orme Collection) মুদ্রিত হয়েছে। “আলিবর্দির সময় (১৭৫৪-তে) দেওয়ান, ‘তান দেওয়ান’, ‘সাব দেওয়ান’, বক্সি প্রভৃতি সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পদের মধ্যে ছয়টিই হিন্দুরা অলংকৃত করছে—একমাত্র মুসলিম ছিল মীরজাফর। আর ১৯ জন জমিদার ও রাজার মধ্যে ১৮ জনই হিন্দু। ... সিরাজদ্দৌলার সময় সর্বক্ষেত্রে এই হিন্দু প্রাধান্য আরও বেড়ে যায়। তরুণ নবাবের সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন এবং ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন মোহনলাল।” — [ঐ, পৃ ৬২।]

তাঁরা ব্রিটিশ আমলে অজস্র উচ্চপদ তো পেয়েছেনই, কিন্তু তার থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ‘মহিমাম্বিত আর্য ঐতিহ্য’, গ্রথিত বেদ-উপনিষদ-পুরাণ, ‘ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যময় তিন হাজার বছরের ইতিহাস’, চিরস্থায়ী জমিদারি, ‘ভদ্রলোক’ হওয়ার সুযোগ, রাজনৈতিক দল, এবং স্বাধীনতার নামে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক একাধিপত্য প্রভৃতি অনন্য উপহার তাঁরা লাভ করেছেন।

সুতরাং এমন সব অসাধারণ লোভনীয় উপহারপ্রাপ্তির সুবর্ণযুগে বাংলার উপসত্ত্বভোগী মানুষরা অধিক সংখ্যায় ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যদের দলে ভিড়েছিলেন।

“বিংশ শতাব্দীতেও কৃষিজীবী সম্প্রদায়সমূহ থেকে বাঙালী, কায়স্থ

সম্প্রদায়ের এবং অযাজ্য সম্প্রদায়সমূহের স্বজাতীয় বা বিজাতীয় তথাকথিত পুরোহিত শ্রেণী থেকে উচ্চশ্রেণীর বাঙালী ব্রাহ্মণ সমাজের অঙ্গপুষ্টি ঘটেছে বলে অনেক সময় শুনে পাওয়া গিয়েছে।” [ড. দীনেশচন্দ্র সরকার, শিলালেখ-তাত্র শাসনাদির প্রসঙ্গ, পৃ. ৪৬]।

এই অভিযোগের সত্যাসত্য অর্থনৈতিক বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছিলেন অর্থনীতিবিদ রাধাকমল মুখার্জি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের সূচনা পর্বের সেই গবেষণায় অভিযোগটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। অধিকন্তু এই গবেষণা পূর্বে উল্লেখিত গোত্র বিশ্লেষণের ফলাফলকেও প্রতিষ্ঠিত করছে এবং অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পর সুযোগ সন্ধানীদের উৎস-ত্যাগই ভারতের জাতিভেদের কারণ বলে নির্দেশ করেছে।

“Upward economic development and consequent social differentiation had started long before the coming of British Raj.” — [Radhakamal Mukherjee, Caste in Indian Economics, Modern Review, August, 1912.]

(অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর সামাজিক পৃথকীকরণের পালা ব্রিটিশ রাজত্বের বহুপূর্বে শুরু হয়েছিল।)

আবার আজ থেকে দেড়শ বছরের বেশিকাল আগে ব্রিটিশ সমাজতত্ত্ববিদ J. C. Nesfield উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলির এবং অযোধ্যার মানুষদের সমাজজীবন নিয়ে এক অনবদ্য গবেষণায় রত ছিলেন। তাঁর সেই গবেষণার ফলাফল এবং সিদ্ধান্ত নিম্নোক্ত গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল —

J. C. Nesfield—Brief View of the Caste System of the North-Western Provinces and Oudh.

এই গ্রন্থের পর্যালোচনার সূত্রে হার্বার্ট রিজলি জানাচ্ছেন যে,

In this remarkable work ... the view is put forward that the bond of sympathy or interest which first drew together the families or tribal fragments, of a caste is composed, and formed into a new social unit, was not,

as some writers have alleged, community of creed... .

(এই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে এই মত প্রকাশিত হয়েছে যে, পারস্পরিক স্বার্থে অথবা সমবেদনার বশে পরিবার বা উপজাতির ক্ষুদ্রাংশগুলির ঐক্যবদ্ধতার সূত্রে এক একটি জাতি-এর সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু কিছু লেখক রক্তধারার সূত্রে এক একটি জাতি সৃষ্টির যে মত ব্যক্ত করেন, তা ঠিক নয়।)

এবং তিনি আরও জানাচ্ছেন যে,

Mr. Nesfield points out... that it is incompatible "with the modern doctrine which divides the population of Indian into Aryan and aboriginal. It presupposes an unbroken continuity in the national life from ont stage of culture to another, analogous to what has taken place in every other country in the world whose inhabitant6s have emerged from the savage state." — [H. H. Risley, The Tibes and Castes of Bengal I, Introduction]

(মিঃ নেসফিল্ড ভারতের জনগণকে আর্য ও অনার্যে বিভক্তির আধুনিক মতকে অযৌক্তিক বলেই আখ্যায়িত করেন। তিনি মনে করেন যে ভারতের মানুষদের জাতীয় জীবন অবিচ্ছিন্ন, তা একটি সাংস্কৃতিক স্তর থেকে আর সাংস্কৃতিক স্তরে প্রবেশ করে চলেছে এবং অন্যান্য দেশের মানুষদের মত ভারতের মানুষও বর্বর স্তর থেকেই ক্রমশ উন্নত স্তরে উঠে এসেছে।)

সুতরাং Mr. J. C. Nesfield-এর গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতেও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ব্যক্তি স্বার্থে, পারিবারিক স্বার্থে এবং গোষ্ঠী স্বার্থে উপসত্ত্বভোগীদের (অর্থাৎ যারা কোন না কোন বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করে দরিদ্র মানুষদের শ্রম শক্তিকে শোষণ করার অধিকার লাভ করেছেন তাঁদের) উৎস ত্যাগের ঘটনা যেমন আঞ্চলিক ঠিক তেমনই তা সর্বভারতীয় এবং সমগ্র পৃথিবীরও। পৃথিবীতে শোষণভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সেটাই মূল কারণ এবং স্বভাবতই ভারতে 'আর্য' ও 'অনার্য' বিভাগের মূল কারণও তাই।

পরিশেষে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বাংলায় জাতিভেদের নিজস্বতা সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি যে, খ্রিস্টীয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়ে-পুণ্ড্রে ব্রাহ্মণদের উপস্থিতির নিশ্চিত প্রমাণ থাকলেও একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে সেখানে ব্রাহ্মণ্যাত্মক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলনের কোন প্রমাণ নেই। শশাঙ্ক, ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব, জয়নাগ সত্ত্বত নিজেরা ব্রাহ্মণ্য আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু তাঁরা নিজেদের রাজ্যে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তনে উদ্যোগী হননি। বৌদ্ধ রাজা ধর্মপাল জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তনে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু তাঁর উদ্যোগী হওয়ার সুযোগ ছিল না। বস্ত্তত বল্লাল সেনই প্রথম রাঢ় ও বরগুণে জাতিভেদ প্রথার প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বটে তবে বাংলার ব্রাহ্মণদের নিজস্ব স্মৃতি শাস্ত্রের অভাবে তাঁর সার্থকতা ছিল অত্যন্ত সীমিত।

বাংলার ব্রাহ্মণরা খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে তাঁদের নিজেদের স্মৃতিশাস্ত্র 'বৃহদ্রমপুরাণম' এবং 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম' রচনা করেছিলেন। এই রচনার পূর্বে বাংলার বৃহৎ নিজস্ব জাতিগুলিতে (বাগদি, বাউরি, পৌন্ড্র ইত্যাদি) শ্রদ্ধার্ত বা ঘৃণারূপে উপস্থাপনের কোন উপায় ছিল না। তাছাড়া উত্তর ভারতে অস্তিত্বহীন 'চণ্ডাল'দের শব্দব্রত পরিধনকারী, উচ্ছিষ্টভোজী এবং অনুৎপাদক উপনররূপে 'মনুস্মৃতি'র ভিত্তিতে বাংলার সর্বকর্মে পারদর্শী এবং স্বভাবত বহুনিষ্ঠ এবং যুক্তিবাদী সংখ্যাগুরু নমোজাতিকে 'চণ্ডাল' গালিবাচক নামের জন্য সমীকৃত করা অবশ্যই অসম্ভব ছিল। সুতরাং এইসব মূলজাতির সামাজিক অবস্থান নির্দেশ না-করে মধ্যযুগের সদ্যগঠিত কায়স্থ-বৈদ্য জাতিকে অশাস্ত্রীয়ভাবে অভিজাত বাঙালি পরিচয়ে ভূষিত করাও সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণদের পর তাঁদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বৈদ্য ও কায়স্থদের উচ্চসামাজিক অবস্থান নির্দিষ্ট করার বাধ্যতার ফলশ্রুতি হল এই স্মৃতিশাস্ত্র এবং এই স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের বিরোধিতার উর্ধ্বক্রমই ব্রাহ্মণ্য সমাজে ক্রমনির্দিষ্ট জাতিগুলির অবস্থান নির্ধারণের সূচকরূপে গণ্য হল। তাই শাস্ত্র দু'খানি রচনার স্তরে অথবা অব্যবহিত পূর্বে যে নমোরা অর্থাৎ ইন্দিপুত্র তাম্রশাসনে উল্লেখিত 'চণ্ডভণ্ড'রা দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে সেন শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা বৃহদ্রমপুরাণে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে জাতির তালিকার সর্বনিম্নে এবং তার ফলে সর্বাধিক নির্দিষ্ট বলে অন্ত্যজরূপে স্থান পেলেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই এই শাস্ত্র দু'খানিতে অন্ত্যজরা

as some writers have alleged, community of creed...'

(এই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে এই মত প্রকাশিত হয়েছে যে, পারস্পরিক স্বার্থে অথবা সমবেদনার বশে পরিবার বা উপজাতির ক্ষুদ্রাংশগুলির ঐক্যবন্ধতার সূত্রে এক একটি জাত-এর সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু কিছু লেখক রক্তধারার সূত্রে এক একটি জাত সৃষ্টির যে মত ব্যক্ত করেন, তা ঠিক নয়।)

এবং তিনি আরও জানাচ্ছেন যে,

Mr. Nesfield points out... that it is incompatible "with the modern doctrine which divides the population of Indian into Aryan and aboriginal. It presupposes an unbroken continuity in the national life from ont stage of culture to another, analogous to what has taken place in every other country in the world whose inhabitant6s have emerged from the savage state." — [H. H. Risley, The Tibes and Castes of Bengal I, Introduction]

(মিঃ নেসফিল্ড ভারতের জনগণকে আর্য ও অনার্যে বিভক্তির আধুনিক মতকে অযৌক্তিক বলেই আখ্যায়িত করেন। তিনি মনে করেন যে ভারতের মানুষদের জাতীয় জীবন অবিচ্ছিন্ন, তা একটি সাংস্কৃতিক স্তর থেকে আর সাংস্কৃতিক স্তরে প্রবেশ করে চলেছে এবং অন্যান্য দেশের মানুষদের মত ভারতের মানুষও রব্বির স্তর থেকেই ক্রমশ উন্নত স্তরে উঠে এসেছে।)

সুতরাং Mr. J. C. Nesfield-এর গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতেও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ব্যক্তি স্বার্থে, পারিবারিক স্বার্থে এবং গোষ্ঠী স্বার্থে উপসঙ্কটভোগীদের (অর্থাৎ যাঁরা কোন না কোন বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করে দরিদ্র মানুষদের শ্রম শক্তিকে শোষণ করার অধিকার লাভ করেছেন তাঁদের) উৎস ত্যাগের ঘটনা যেমন আঞ্চলিক ঠিক তেমনই তা সর্বভারতীয় এবং সমগ্র পৃথিবীরও। পৃথিবীতে শোষণভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সেটাই মূল কারণ এবং স্বভাবতই ভারতে 'আর্য' ও 'অনার্য' বিভাগের মূল কারণও তাই।

পরিশেষে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বাংলার জাতিভেদের নিজস্বতা সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি যে, খ্রিস্টীয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়-পুণ্ড্র ব্রাহ্মণদের উপস্থিতির নিশ্চিত প্রমাণ থাকলেও একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে সেখানে ব্রাহ্মণ্যতাত্ত্বিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলনের কোন প্রমাণ নেই। শশাঙ্ক, ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব, জয়নাগ সম্ভবত নিজেরা ব্রাহ্মণ্য আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু তাঁরা নিজেদের রাজ্যে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তনে উদ্যোগী হননি। বৌদ্ধ রাজা ধর্মপাল জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তনে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু তাঁর উদ্যোগী হওয়ার সুযোগ ছিল না। বস্তুত বয়্যাল সেনই প্রথম রাঢ় ও বরগো জাতিভেদ প্রথার প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বটে তবে বাংলার ব্রাহ্মণদের নিজস্ব স্মৃতি শাস্ত্রের অভাবে তাঁর সার্থকতা ছিল অত্যন্ত সীমিত।

বাংলার ব্রাহ্মণ্য খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে তাঁদের নিজেদের স্মৃতিশাস্ত্র 'বৃহদ্রমপুরাণম' এবং 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম' রচনা করেছিলেন। এই রচনার পূর্বে বাংলার বৃহৎ নিজস্ব জাতিগুলিতে (বাগদি, বাউরি, পৌন্ড্র ইত্যাদি) শ্রদ্ধার্থ বা ঘণারূপে উপস্থাপনের কোন উপায় ছিল না। তাজাড়া উত্তর ভারতে অস্তিত্বহীন 'চণ্ডাল'দের শববস্ত্র পরিধানকারী, উচ্ছিষ্টভোজী এবং অনুৎপাদক উপনয়নরূপে 'মনুস্মৃতি'র ভিত্তিতে বাংলার সর্বকর্মে পারদর্শী এবং স্বভাবত বস্তুনিষ্ঠ এবং যুক্তিবাদী সংখ্যাগুরু নমোজাতিতে 'চণ্ডাল' গালিবাচক নামের জন্য সমীকৃত করা অবশ্যই অসম্ভব ছিল। সুতরাং এইসব মূলজাতির সামাজিক অবস্থান নির্দেশ না-করে মধ্যযুগের সদ্যগঠিত কায়স্থ-বৈদ্য জাতিকে অশাস্ত্রীয়ভাবে অভিজাত বাধ্যলি পরিচয়ে ভূষিত করাও সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণদের পর তাঁদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বৈদ্য ও কায়স্থদের উচ্চসামাজিক আবস্থান নির্দিষ্ট করার বাধ্যতার ফলশ্রুতি হল এই স্মৃতিশাস্ত্র এবং এই স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের বিরোধিতার উর্ধ্বক্রমই ব্রাহ্মণ্য সমাজে ক্রমনির্দিষ্ট জাতিগুলির অবস্থান নির্ধারণের সূচকরূপে গণ্য হল। তাই শাস্ত্র দুখানি রচনার স্তরে অথবা অব্যবহিত পূর্বে যে নমোরা অর্থাৎ ইন্দিপুত্র তাম্রশাসনে উল্লেখিত 'চণ্ডভণ্ড'রা দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে সেন শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা বৃহদ্রমপুরাণে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে জাতির তালিকায় সর্বনিম্নে এবং তার ফলে সর্বাধিক নির্দিষ্ট বলে অন্ত্যজরূপে স্থান পেলেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই এই শাস্ত্র দু'খানিতে অন্ত্যজরা

কোথায়ও অস্পষ্টরূপে বর্ণিত হননি। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে নমোরা বস্তুত-কাক্ষন মূল্যে শিক্ষালাভে রত 'নম' নামে [ভক্তিমাদব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শূন্য পুরাণ', পৃ: ১৫১] এবং পরবর্তী মঙ্গলকাব্যে [মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে (সুকুমার সম্পাদিত) পৃ: ৮১] তাঁরা 'চণ্ডাল' গালিবাচক নামে তবে 'লবণ বিক্রেতা নগরবাসী' রূপে আর অন্নদামঙ্গল কাব্যে তাঁরা অপরাধের 'খালি সৈন্য' বলে [ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী : অন্নদামঙ্গল কাব্য] যেভাবে উপস্থিত হয়েছেন তাতে তাঁরা বরণীয় মানুষ এবং কোনমতেই অস্পৃশ্য নন এবং অজ্ঞত উপবিভাগ বিশিষ্ট অনুৎপাদক পরজীবী নন।

বাংলার ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্রের উদ্ভিন্ন এবং সমাজ বাস্তবতার চিত্রের এই সম্পূর্ণ বৈপরীত্য অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। বোঝাই যাচ্ছে যে স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশ পালিত হয়নি এবং তা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের অভিপ্রেত ছিল না, ছিল বাধ্যতা। শাস্ত্রের নির্দেশ সাংখ্যিকরূপে পালনের জন্য ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিপোষক শক্তিশালী শাসকের অনুগত বিশাল সৈন্যবাহিনীর নির্গীড়নের মাধ্যমে চরম বিরোধী নমোদের পর্যুদ্বিত করে শাস্ত্রীয় 'চণ্ডালে' পরিণত করার প্রয়োজন ছিল। বস্তুত তখনকার মুসলিম শাসকরা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের যুগপৎ আগ্রাসক এবং পরিপোষকের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

মুসলিম শাসকবর্গ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের পরিপোষকরূপে তাঁদের দেওয়ান, সাব-দেওয়ান, তান-দেওয়ান, মনসবদার, মুন্সী নির্মাতা, জমিদার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে কৃষক, কারিগর এবং ব্যবসায়ীদের মাথার উপর প্রত্যক্ষ অত্যাচারী রূপে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা এবং তাঁদের অধীনস্থ অমুসলিম কর্মচারীরা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের সংহতরূপে ধরে রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু মুসলিম শাসক বা শাসকগণের পরিপোষিত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীরা মোটেই নিষ্কণ্টক ছিলেন না। এদের মধ্যে যারা শাসকের দৃষ্টিতে একান্ত নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই সপারিসদ দেখায় অথবা বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই জালালুদ্দিন-কালা পাহাড়রা সংখ্যায় কম ছিলেন না। [Md. Mohar Ali, History of Muslims of Bengal : Survey of Administration, Society and Culture, Vol IB, p 785.] আর তাঁদের মধ্যে যারা শাসকের বিন্দুমাত্র সন্দেহে পতিত হয়েছিলেন

তাঁদের স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্রী, পৌত্রবধূ শাসকের শয্যাসজিনী হয়ে আভিজাত্যের মূল্য চুকিয়ে আসতে বাধ্য হতেন [W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol II, p 157.]। তাছাড়া অমুসলিম-অব্রাহ্মণ উপসত্তভোগীরা ক্ষমতা বা প্রতিপত্তির লোভে তো সরাসরি মুসলমানই হতে পারতেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বাংলার বুকে পরিপুষ্টি লাভের বিশেষ সুযোগ মুসলিম আমলে ছিল না, তা বদলায় আমলের প্রারম্ভিক পরিধির থেকেও সঙ্কুচিত হওয়ার সম্ভাবনা এড়াতে খ্রীষ্টোতন্য ব্রাহ্মণ্য যাগ-যজ্ঞ, পূজা-পার্বণ, আচার-বিচার, জাতিভেদ ত্যাগ করে ইসলামি 'সাম্য-মৈত্রী-সৌভ্রাতা'-এর অনুকরণে 'বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদী বাঙালি হিন্দু ধর্ম'-রূপে মূর্মূষ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে নমো জাতির সংগঠিত সংগ্রামী শক্তির সাহায্যে রক্ষার উদ্দেশ্যে ধ্বনি তুললেন—'চণ্ডালোঅপি বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ'।

অর্থাৎ, 'হরিভক্তিপরায়ণ নমোই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ'।

আরও অনেক পরে কলকাতা নগরীকরণ ধারণের পর্বে ভিক্ষার দাবিতে আপোলনরত ব্রাহ্মণরা স্বপ্নেও ভাবেননি যে, তাঁরা এবং তাঁদের উত্তরসূরীরা ব্রিটিশের রাষ্ট্রীয় অনুকূল্যে অচিরে অমুসলিম বাঙালি সমাজের শিরোমণি বলে গণ্য হবেন এবং শিক্ষিত মুসলিমদের চেতনার জগতে আধিপত্য বিস্তার করবেন। বস্তুত ব্রিটিশ শিল্পপতিদের বাংলার এবং ভারতের সম্পদ ও শ্রমশক্তি লুণ্ঠনে অকৃত্রিম সহায়কদের ভূমিকা পালনের পুরস্কারগুলিই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের সেই অবস্থানে উন্নীত করেছিল। তাই ব্রিটিশ আমলই ছিল বাংলায় ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুবর্ণযুগ এবং স্বাধীনোত্তর আটবত্রি বছর তার হীরক যুগ।

ব্রিটিশ শাসনকালে জমিদারদের ক্রমবর্ধমান শোষণের বিরুদ্ধে নমো এবং মুসলমান কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে ব্যর্থ করার জন্য অর্থ ও প্ররোচনা নমো-মুসলিম দাঙ্গার যে খেলা এই জমিদাররা ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশম পর্যন্ত চালিয়ে এসেছিলেন পাকিস্তানের অনিবার্যতা স্পষ্ট হতেই পূর্ববঙ্গে তা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার রূপে পরিণত হয় সেই দাঙ্গার পরিকল্পনাকারীদের গ্রাস করতে উদ্যত হয়।

হীরক যুগ এবং সুবর্ণযুগের সন্ধিক্ষণে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীরা হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার বিপন্নতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আবারও নমোদের সংগঠিত শক্তির আশ্রয় গ্রহণ

করলেন। তখন হিন্দুদের তরবারি ও ঢালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন নমোরা।

“The Namasudras emerged in the new role during the partition as the sword and shield of the Hindus.” [K. S. Singh (General Editor), People of India (Vol. 43) : West Bengal (Foreword p xviii), Anthropological Survey of India, Calcutta (2008).] এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে দলে দলে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরা পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমালেন এবং কলকাতা এবং কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করলেন। তাঁদের মধ্য থেকে উৎসাহী মানুষরা পূর্ববঙ্গ যোগাযোগের সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের সব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলে গিয়ে ভিড়লেন এবং অবিলম্বে দলগুলির মধ্যস্তরে শোভিত হলেন। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ‘পূর্ব’ বা ‘পর’ নাম মুক্ত কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট এবং জনতা দলগুলি বসন্ত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য মৈত্রী জোটের নানা উপদল মাত্র। স্বাধীনতার পর থেকে এই অতি ক্ষুদ্র অক্ষশক্তির নিরবচ্ছিন্ন একাধিত্যে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার হীরক যুগে এই অক্ষশক্তির গর্ববস্ত্রের ত্রাতা নমোদের তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু রূপে পেয়ে আন্দামানের কালাপানিতে, কুমায়ূনের জঙ্গলে বাঘের মুখে, দণ্ডকের পাহাড়ী মালভূমিতে নির্বাসনে, রাজস্থানের ধর মলভূমির উপান্তে ছুঁড়ে ফেলে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছেন। যারা বিদ্রোহী হয়েছেন তাঁদের পুলিশ বা পার্টি পোষিত গুপ্তারা হত্যা করে দেহ গুম করেছেন কিন্তু হত্যা নথিভুক্ত হয়নি এবং এভাবে কতজনের মৃত্যু ঘটেছে তার হিসেবও নেই, তবে মানুষ কমেছে। এ যাবৎ কেউ এর কারণ জানতে চাননি। আর যে নমোরা নিজেদের সামর্থ্যে পশ্চিমবঙ্গে স্থিতি লাভ করেছেন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁদের সন্তানদের চিন্তা-চেতনারূপত ব্রাহ্মণ্য অবতারদের অধঃস্থ তাঁদের আপতবৈরী দশম অবতার বৃদ্ধের ‘জন্মান্তর’, ‘নির্যতি’ এবং ‘কর্মফল’ের প্রভাবে আচ্ছন্ন। ফলে ব্রাহ্মণ্য সংরক্ষিত বৃদ্ধের পরিধিতে আবদ্ধতার ফলে এখনও তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, বাংলার ব্রাহ্মণ্যরা ঔষধিক ঋষিদের অধস্তন বংশধর এবং ব্রাহ্মণ্য একাধিপত্য তিন হাজার বছর ধরে চলার পর ইংরেজ এসে আমাদের সর্ব প্রথম শিক্ষার সুযোগ দিয়েছেন। তাঁরা জানেনই না,

নমোরা প্রাগৈতিক কাল থেকে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠিলিপিতে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানচর্চা করতেন এবং রিংগ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত নানা বিষয়ক হস্তলিখিত পুস্তকাদি তাঁদের কাছে ছিল। [দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, পৃ. ৩৪]

অন্য একাংশ দেখে এবং কর্মনৈপুণ্যে সুদক্ষ ব্রহ্মকুলের সব বৈশিষ্ট্য নিয়েও অবিন্যস্ত চেতনার বশে ‘চন্ডাল’-এর মধ্যে আত্মপরিচয় খুঁজতে গিয়ে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় গোলক ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। তাজাড়া তাঁদেরও প্রায় সকলেই ‘নির্যতি-কর্মফল-জন্মান্তর’-এর ঘোরে আচ্ছন্ন।

অন্যদিকে বাংলাদেশ সৃষ্টির সূত্রে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে এসে ফিরে না-যাওয়া এবং তারপর বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে আসা এবং পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ্যবির বহির্ভূত অপ্রতিষ্ঠিত উদ্বাস্তু নমোরা বে-নাগরিকের মানিকর জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছেন।

১৯৭০-এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী নমোরা জীবন যাত্রায় যিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন তাঁরা নিজ জাতির সংগ্রামী ঐতিহ্য-বিশ্মৃত অবস্থায় ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক উপবিভাগীয় দলদাসরূপে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের নামে নির্বাসিত নমোরা নিজেদের সংগ্রামী স্বরূপে জেগে উঠেছিলেন। রামাকান্ত মণ্ডল, হরিপদ মোহন্ত, শুক অধিকারী প্রভৃতি দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের উদ্যোগে সংগঠিত আন্দোলনে জয়লাভের ফলে উচ্চ মালভূমির ঢালের অফলা অঞ্চলে পুনর্বসতিপ্রাপ্ত পরিবারগুলিকে অপেক্ষাকৃত সমতলে স্থানান্তর পর্ব ধীর গতিতে হলেও এগিয়ে চলেছিল।

ইতিমধ্যে ভারতের এবং পশ্চিমবঙ্গের ‘রাজনীতির পটপরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল’ — কেন্দ্রে জনতা সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসে বামফ্রন্ট বাংলার ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের হীরক যুগকে প্লাটিনাম যুগে উত্তরিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ১৯৪০-এর দশকে নমোদের জমিদারি বিরোধী আন্দোলনকে [Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity in Colonial India, p 230.] তাঁদের বিশ বছর আগেকার তেভাগার স্তরে আবদ্ধ করার ‘কৃতিত্ব’ যাদের আছে সেই ‘কৃষক সভা’র পরিচালকরা হলেন বামফ্রন্ট সরকারের মূল শক্তি। সুতরাং তাঁদের কাছে দণ্ডকারণ্যের নমোদের ঐক্যবদ্ধ স্বকীয়

আন্দোলনের সাফল্য মারাত্মক এক অশনি সংকেতরূপে ধরা দিতে দেরি হল না এবং তা ব্যর্থ করার 'পবিত্র ব্রাহ্মণ্য দায়িত্ব পালনে' তাঁরাই এগিয়ে এলেন। ব্রাহ্মণ্যের নেতা ও মন্ত্রীরা দণ্ডকারণ্যে গিয়ে সেখানকার পুনর্বাসনপ্রাপ্ত উদ্ধাস্তদের পশ্চিমবঙ্গের মরিচকাপি দ্বীপে পুনর্বাসনের জন্য নিমন্ত্রণ করে এনে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ডে মেতেছিলেন সারা পৃথিবীর ইতিহাসে তা নজিরবিহীন নিন্দনীয় অমানবিক ঘটনা রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। কতজন মারা গিয়েছিলেন এই বে-আইনি রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ডে?

— কোন হিসেব নেই! নিঃসন্দেহে পুলিশ ও গুণ্ডাদের হাতে বহু মানুষ নিহত হয়েছিলেন, অনাহারে, অখাদ্য খেয়ে, অচিকিৎসায় মারা গিয়েছিলেন বহু মানুষ, অপুষ্টিতে শিশু মৃত্যুর সংখ্যাও কিছু কম ছিল না। মেটি কথা, প্রায় ৫০০০টি পরিবারের প্রায় ২০,০০০ মানুষ হিসেবের বাইরে চলে গেছেন। [Nilanjana Chatterjee, *Midnight's Unwanted Children : East Bengal Refugees and the Politics of Rehabilitation*, p300.]

এই জঘন্য ব্রাহ্মণ্য ব্রাহ্মণ্য প্রতারণা, নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং অবর্ণনীয় অত্যাচারের বন্যা দণ্ডকারণ্যের নমো কৃষকদের স্থানান্তরের পুনর্বাসনে বিঘ্ন ঘটিয়েছিল কিন্তু ব্যর্থ করতে পারেনি। কৃষকরা তাঁদের ঐতিহ্যগত বুদ্ধিমত্তায় ও স্বাধীনশীল কর্মপ্রণয় উদ্দীপিত হয়ে দণ্ডকারণ্যের নিম্নাঞ্চলকে শস্য-শ্যামলিমায় ভরে তুলেছেন। দণ্ডক এখন নির্বাসন ফেরের গ্লানিমুক্ত; আন্দামান আজ 'কালাপানি' নয়, শস্যভাণ্ডার; হালি উপত্যকা, বরাক উপত্যকা, বিদর্ভ আর কুমায়ুনও নমোকুলের সৃষ্টি কুশলতাকে কীর্তিত করছে।

সেই কীর্তির নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের নমোরা জাগছেন। ব্যর্থ কোন পূর্বেকার রাজনৈতিক নেতার কোন বাণী সম্বল করে নয়, সম্পদসৃষ্টির অভিজ্ঞতা সঞ্জাত সঞ্জীবনী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাগছেন বাগদি, বাউরি, পৌড়, ডোম, জেলে, মালো, খোপা, শুড়ি, মুচি, রাজকংশী, কোচ, পালিয়া এবং আদিবাসীরা। জাগরণোন্মুখ পশ্চিমবঙ্গের এই সম্পদস্রষ্টাকুল অচিরেই তাঁদের অক্ষমতার বিকাশ ঘটাবেন এবং সেই অক্ষমতার সুসংহত দৃঢ়বদ্ধতা সমস্ত সম্পদস্রষ্টা জাতিকে আকর্ষণ করে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের স্রষ্টাকুলের অর্থনৈতিক,

সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক সমৃদ্ধির সূচনা করবেন, এটা কোন কল্পনা নয়, একান্তই বাস্তব। দুর্জয় প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রতিকূলতা সৃষ্টি কুশলতায় জয় করে সুস্থির পথে অগ্রসর উদ্যমরা তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। তাই ভবিষ্যৎকাল পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের স্রষ্টাকুলের প্রগতির কাল এবং কান পেতে তার পদসঞ্চার শোনা যাচ্ছে।

সুতরাং মরিচকাপিতে ব্রাহ্মণ্যাত্মিক হত্যার উন্মত্ততার প্রতিক্রিয়ায় সারা ভারতে নমো শক্তির সৃষ্টি বৈচিত্র্যের বিশ্লেষণে 'বাংলার ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থার হীরক যুগ'-এর স্বরূপ ধরা দিয়েছে। হীরক মৌলিক গঠনের এবং ত্রিখা-বিজ্রয়ার বিচারে অঙ্গারের রূপভেদ বাস্তবিত্য অন্য কিছু নয়, তা সকলেই জানেন। তার ফলে এই ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থা স্বরূপেই ধ্বংসাত্মক এবং ঐতিহ্যসম্মত স্বাধীনশীলতায় উজ্জীবিত সম্পদ স্রষ্টাদের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের প্রবল বিশ্লেষণের উল্লাসে বায়ুতে মিলিয়ে যাওয়াই তার অন্তিম পরিণতি।

হিন্দুত্ববাদীদের অপবিজ্ঞান ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতিরই ধারাবাহিকতা

ওরুপ্রসাদ কর

সম্প্রতি হিন্দুত্ববাদী শক্তি ফেন ফেপে উঠেছে। একদিকে তারা বিদেশি কর্পোরেট পুঞ্জির সেবা করতে ও বিদেশি প্রভুদের হুকুমে আর্থিক সংস্কারে মরিয়া হয়ে উঠেছে, আর অন্যদিকে শ্রমজীবী ও সংগ্রামী মানুষের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা ও উগ্রভাবাত্মক অহমিকা গড়ে তুলতে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের নিয়ে তাদের পাগলের প্রলাপ যে কোথায় সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তা বোঝবার সাধ্য তাদের নেই। একথা যেমন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ক্ষেত্রে সত্যি তেমনি তার পরিষদবর্গের জনোও সত্যি। তাদের হাসাকর বক্তব্য এমনকি রাজনীতি বিমুখ বিজ্ঞানীদেরও আতঙ্কিত করে তুলেছে। কি বিজ্ঞান কংগ্রেস, কি ইতিহাস কংগ্রেস সব জায়গাতেই এই হিন্দুত্ববাদী মূর্খের দল বিজ্ঞান আলোচনার সমস্ত নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের উন্নতি নিয়ে তাদের গালগল্প প্রচার করে চলেছে। অপরাধিকে গড়ে তোলা হয়েছে নানা নামের হিন্দু সেনা। কেবল ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষকে আক্রমণ নয়, হিন্দুত্ববাদী অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কথা বললেই এই সেনারা ভীতিপ্রদর্শন ও খুনের হুমকী দিয়ে চলেছে। খাগি তাই নয় যুক্তিবাদের পক্ষে থাকা মহারাষ্ট্রের নরেন্দ্র ধাবোলকর, গোবিন্দ পানসারেকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত ধাবোলকর বিধানসভায় 'কুসংস্কার বিরোধী বিল' গ্রহণ করবার দাবি তুলেছিলেন। সম্প্রতি রাষ্ট্রের হিন্দুত্ববাদী চরিত্র এতটাই প্রকট হয়ে পড়েছে যে কস্টিকের বিখ্যাত শিল্পবিদ, কন্নড় ভাষা বিশারদ ও বিশিষ্ট যুক্তিবাদী মানুষ এম এম কালবুর্গীকে হত্যা করা হয়েছে। কন্নড় ভাষা ও লিপিতে সমৃদ্ধ হয়ে তার নানা ধরনের গবেষণামূলক কাজকর্ম হিন্দুত্ববাদী শক্তি সহ্য করতে পারেনি। মনে রাখা দরকার যে বিজ্ঞান চিন্তার প্রসারের পাশাপাশি এরা নানাভাবে সরকারের নয়া আর্থিক নীতি ও অপউন্নয়নেরও বিরোধিতা করেছিলেন।

ভারতীয় অঞ্চলের সভ্যতা অতি প্রাচীন এবং এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে

প্রাচীনকালের এই সভ্যতা কৃষি সহ উৎপাদনের নানা ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি অর্জন করেছিল। কৃষির উন্নতির উপর দাঁড়িয়ে যে বিকাশ ঘটে তার ফলে প্রাচীন ভারতে লোহার ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। এর ফলে জঙ্গল কেটে কৃষির বিস্তৃতি ঘটে এবং সেচ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়। আর এই কৃষির উন্নতির সাথে সাথে গণিত ও মহাকাশবিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি হয়। সূর্যের সাপেক্ষে গ্রহ উপগ্রহগুলির গতি সংক্রান্ত তথ্য, শূন্যের আবিষ্কার, জ্যানিতি ত্রিকণমিতি সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রাথমিক আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখ্য। শুধু তাই নয়, এই বিকাশের উপর দাঁড়িয়ে পরবর্তীতে বেশ কিছু অঞ্চলে বহুশিক্ষার বিকাশ ঘটেছিল এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যেও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। কিন্তু একইসাথে ভারতের জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা ছিল প্রগতির পক্ষে বিশেষ অন্তরায়। ফলে এই ব্যবস্থা যত শক্তিশালী হতে থাকে তত বেশি করে তা প্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে উঠতে থাকে। তা সত্ত্বেও সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব একটি পর্যায়ে নিশ্চয়ই এই প্রধাকে ভেঙে চুরমার করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন ঘটাতো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হয়ে গেল যখন ব্রিটিশ শক্তি এখানে তার উপনিবেশ গড়ে তুললো। নিম্নবর্ণভুক্ত বেসব কারিগর-কৃষক-ব্যবসায়ী শ্রেণি জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অতীতে বৈকল্প আন্দোলনের মত সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল এবং ভবিষ্যতেও সংগ্রাম গড়ে তোলার পর্যায়ে ছিল তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল চরম শোষণ ও নিপীড়ন। আর এই প্রক্রিয়াতে ব্রিটিশ শক্তি যাদের পাশে গেল তারা মূলগতভাবে উচ্চবর্ণভুক্ত সম্প্রদায়ের মানুষ এবং মাড়োয়ারী, ওজারী ও পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে উঠে আসা একগুচ্ছ দলাল ব্যবসায়ী শ্রেণি। ফলে বলা যায় যে ব্রিটিশ শাসনে যেমন একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি নতুনভাবে গাণ ফিরে পেল তেমনি ব্রিটিশ শক্তিরই তার পাশে পেয়ে গেল তাদের স্বার্থরক্ষাকারী একটি সামাজিক শক্তিকে।

জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার গর্বে আত্মত, ব্রিটিশ শক্তির সাথে সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে বিদেশি শক্তির প্রতি অনুগত এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তায় আচ্ছন্ন হিন্দুত্ববাদীদের প্রাচীন ভারতীয় অঞ্চলের জনগণের সৃষ্টিশীল ব্যঞ্জ নিয়ে জানা বোঝার জন্য কোন মাথাব্যথা নেই, তারা প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিদের অপার্থিব ক্ষমতা ও

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ নিয়ে গালগল্প ও অতিকথার প্রচারেই বিশ্বাসী। ভারতীয় হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত তত্ত্ব নিহিত আছে—হিন্দুত্ববাদীদের এই ধরনের অপবিজ্ঞানের প্রচারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বেশ কিছু দেশি ও বিদেশি সংস্থা, আর তার সাথে সরকারি সহায়তা ও বৃহৎ গণমাধ্যমের উদ্যোগ তো আছেই। এটা ঠিক যে সমস্ত ধর্মের ক্ষেত্রেই এমন কিছু মানুষ পাওয়া যায় যারা মনে করে যে তাদের ধর্মে সমস্ত সত্য নিহিত আছে, কিন্তু হিন্দুত্ববাদীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি নিছক তেমন কোনও বিশ্বাস নয়। এর সাথে ভারতীয় অঞ্চলে আদিবাসী, দলিত ও সংখ্যালঘু মানুষের উপর শোষণ ও নিপীড়ন চালানো, তাদের হাত থেকে জল-জমল-জমি কেড়ে নেবার ও বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করবার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এই লক্ষ্যে আর্থিক সংস্কার চালানোর জন্য বিদেশি ও তার সহযোগী দেশীয় কর্পোরেট পুঁজি সাম্প্রতিককালে বিশেষভাবে এই হিন্দুত্ববাদী শক্তিকে মদত করে চলেছে। তাই যে পরিমাণে ভারতে বিশ্ব একচেটিয়া পুঁজির লুণ্ঠন বেড়ে চলেছে সেই পরিমাণে ভারত রাষ্ট্র মতাদর্শ হিসেবে হিন্দুত্ববাদকে প্রাধান্য রেখে আত্মসী হয়ে চলেছে, আর এর শিকার কেবল দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, নানা অঞ্চলের প্রতিবাদী ও গণতান্ত্রিক মানুষ, বিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, লেখকদের উপর নেমে আসছে আক্রমণ।

তবে যে পরিমাণে হিন্দুত্ববাদীদের অসহিষ্ণুতা ও আক্রমণ বাড়ছে তার সাথে সাথে বাড়ছে নানা স্তরের মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। সম্প্রতি একের পর এক বিখ্যাত সাহিত্যিক, চিত্র পরিচালক, গায়ক তাদের রাষ্ট্রীয় সম্মান ফিরিয়ে দিচ্ছেন। তালিকাটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদদের প্রতিবাদ। প্রায় ১০০-র বেশি বিজ্ঞানী রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন। মলিকিউলার বায়োলজির বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পুষ্প ভার্গভ তার পদ্মশ্রী পুরস্কার ফিরিয়ে দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, "Moreover, there are statements from the fringe groups almost everyday. All these sectarian forces were there in the country for several decades. But now they get more courage to do

things under the Narendra Modi government. They could kill people and make statements of hatred. Even yesterday, RSS chief Mohan Bhagwat said a husband and a wife are bound by a social contract and Women should be housewives..." অর্থাৎ বিজ্ঞানী ভার্গভ অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেছেন যে বেশ কয়েক দশক ধরেই এই বিপথচালিত হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলি তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে। নরেন্দ্র মোদী সরকারে আসায় এরা আরও উৎসাহিত হয়ে বিভেদকামী বিবৃতি দিয়ে যুক্তিবাদী ও সংখ্যালঘু মানুষকে খুন করে চলেছে। এই বিজ্ঞানী কেবল হিন্দুত্ববাদী শক্তির অপবিজ্ঞানমূলক প্রচার ও বিভেদকামী কাজকর্মেই বিচলিত নন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক প্রধান মোহন ভাগবতের বক্তব্য যে দেশের মহিলাদের সামাজিক স্ত্রীশীল কাজে যুক্ত হবার ক্ষেত্রেও বিপজ্জনক তার জন্যও তিনি শঙ্কিত।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে হিন্দুত্ববাদীদের উদ্ভট তত্ত্ব

এই বছর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১০২তম অধিবেশনে যে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল তা ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ১৯০৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাইট ভাতৃদ্বয়ের হাতে নয়, উড়োজাহাজ নাকি প্রাচীনকালে ভারতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। মুম্বাই ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত ২০১৫ সালের বিজ্ঞান কংগ্রেসে রীতিমত গবেষণাপত্র পাঠ করে এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করলেন বিজ্ঞান কংগ্রেসে আমন্ত্রিত বক্তা ক্যাপ্টেন আনন্দ বোদাস। বোদাস বলেছেন, "অকবেদেই প্রাচীন বিমানের কথা উল্লেখ আছে।" তার কথায় ৭০০০ বছর আগে মহর্ষি ভরদ্বাজ 'বৈমানিক শাস্ত্র' নামক গ্রন্থে এমন বিমানের কথা উল্লেখ করে গেছেন যা কেবল এক দেশ থেকে আর এক দেশে নয়, এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহেও পাড়ি দিতে পারত। প্রাচীন ভারতে যেসব বিমান চলত সেগুলি আকারে ছিল বিশাল এবং তার ৪০টি ইঞ্জিন থাকত। এমনকি সেই বিমানের প্রযুক্তি এতটাই উন্নত ছিল, যে মাক আকাশে একটি বিমানকে স্থিরভাবে ভাসিয়ে রাখাও সম্ভব হত। এখানেও শেষ নয়, স্থির হয়ে ভেসে থাকার পর বিমানটি আবার আকাশপথে যে কোনও দিকে রওনা দিতে পারত। কী ধরনের ধাতু বা সঙ্কর ধাতু

দিয়ে এই বিমান তৈরি হত এই গ্রন্থে তারও উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত সঙ্কর ধাতু নিয়ে পড়াশোনা করে তাকে কাজে লাগানোর জন্য বর্তমান প্রজন্মকে উৎসাহিত করতেও বোদাস ভোলেননি। প্রসঙ্গত এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী প্রকাশ জাভেদেকর যিনিও বোদাসের সাথে এই বিষয়ে সহমত পোষণ করেন। (এই সময়, জানুয়ারি ৫, ২০১৫)

কেবল অপবিজ্ঞানের প্রচার নয়, জোচ্ছুরীও বটে

তবে প্রাচীন ভারতে উড়ানোর তত্ত্ব বিষয়ে যে সত্যকে এই হিন্দুত্ববাদীরা যা চেপে গিয়েছে তা হল ক্যাপ্টেন বোদাস তার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে মহর্ষি ভরদ্বাজের যে 'বৈমানিক শাস্ত্র'-এর উল্লেখ করেছেন সেই বৈমানিক শাস্ত্র নিয়ে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। প্রায় ৪০ বছর আগে বাঙ্গালোরের আই. আই. এস. সি.-র বিজ্ঞানী এইচ. এস. মুকুন্দের নেতৃত্ব আরও ৫ জন বিজ্ঞানী মহর্ষি ভরদ্বাজের 'বৈমানিক শাস্ত্র'-এর উপর অনুসন্ধান চালিয়ে এরকম দাবিকে খারিজ করে দিয়েছিলেন। তারা দেখিয়েছিলেন যে বৈমানিক শাস্ত্রে যেসব প্রযুক্তির উল্লেখ আছে তার সাহায্যে কোনও বস্তুর আকাশে ওড়া আদৌ সম্ভব নয়। ১৯৭৪ সালে 'Scientific Opinion' নামক একটি জার্নালে এইচ. এস. মুকুন্দ, এস. এম. দেশপান্ডে, এইচ. আর. নগেন্দ্র, এ. প্রভু ও এস. পি. গোবিন্দরাজুর 'Critical Study of the Work Vyamanika Shashtra' শীর্ষক যে গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয়, "The planes described are at the best poor concoctions rather than expressions of something real. None of the planes has properties or capabilities of being flown; the geometries are unimaginably horrendous from the point of view of flying; the principles of propulsion make them resist rather than assist flying." অর্থাৎ মূল কথা হল যে বৈমানিক শাস্ত্রে যে বিমানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাকে বড় জোর দুর্বল কল্পনা বলা যায় কিন্তু কোনমতেই বাস্তবসম্মত কোনও বিষয় নয়। বিমানের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে তার আকাশে ওড়বার

কোনও গুণ নেই। ওড়বার দৃষ্টিকোণ থেকে বিমানের যে জ্যামিতিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে থেকে তা অর্থহীন এবং বিমানের চালিকা বলের যে নীতি হাজির করা হয়েছে তা আকাশে ওড়া তো দূরের কথা বরং ওড়বার পথে বাধাস্বরূপ। বৈমানিক শাস্ত্রে বিমান ওড়বার জন্য যে প্রযুক্তিগত বিবরণ আছে তাতে বিমানটি আকাশে ওড়ার অর্থ দাঁড়ায় নিউটনের সূত্রের লঙ্ঘন। বিষয়টিকে উক্ত প্রবন্ধে এইভাবে বলা হয়েছে, "Looking into the drawings and the text leads one to conclude that air is sucked from the bottom and hot gases are allowed to exhaust through pipes toward the top. And this is expected to produce force to life the planes up; a statement which is a gross violation of Newton's laws."

এখানেই শেষ নয়। এমনকি মহর্ষি ভরদ্বাজের নাম করে প্রাচীন ভারতে বিমান চলাচলের যে গালগল্প আমদানী করা হচ্ছে তাতেও নানা ধরনের মিথ্যাচারিতা রয়েছে। এই বিষয়ে উক্ত পেপারে মন্তব্য করা হয়েছে, "Thus the work 'Vymanika Shashtra' was brought into existence sometime between 1900 and 1922 by Pandit Subbaraya Shastry by techniques unclear to us at the moment. The only evidence in favour of Maharshi Bhardwaja being the author is the textual statement and nothing more." অর্থাৎ জালিয়াতির উপর জালিয়াতি। সাত হাজার বছরের পুরোনো নয়, মহর্ষি ভরদ্বাজের নাম করে যা চালানো হচ্ছে তা আসলে কোনও এক পণ্ডিত সুব্বারাও শাস্ত্রী বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কোনও এক সময়ে লিখেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে প্রাচীন ভারতীয় ঋষি মহর্ষি ভরদ্বাজ তাকে স্বপ্নের মাধ্যমে তাকে এই বিষয়ে অবহিত করেন।

বিজ্ঞানীদের প্রতিক্রিয়া

এ ব্যাপারে অনেক লেখালেখি হয়েছে এবং কোনও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীই বিষয়টিকে সমর্থন করেননি, বরং বিজ্ঞান কংগ্রেসের আলোচ্য তালিকা থেকে

এই গবেষণাপত্রটি বাদ দেবার অনুরোধ জানিয়ে কালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত নাসা (NASA)-র বিজ্ঞানী ড. রামপ্রসাদ গান্ধীরামনের উদ্যোগে প্রায় ২০০ জন বিজ্ঞানী একটি আবেদনপত্র পাঠায়। এই আবেদনপত্রে বলা হয়েছিল, "রাজনৈতিক পাণ্ডিত্যের সমর্থনে বিজ্ঞান চর্চার জগতে অপ-বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশে বিজ্ঞানী মহলের সদস্য হিসেবে আমরা গভীরভাবে শঙ্কিত বোধ করছি। গত বেশ কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী বেশ কিছু অপ-বিজ্ঞানের প্রচারক যেভাবে তাদের প্রচার চালিয়ে আসছে। কিন্তু তাতে যতটা ক্ষতি হয়েছে তার চেয়েও বেশি ক্ষতি হয়েছে বিজ্ঞান বিষয়ক এরকম একটি সভায় (পড়ুন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, ২০১৫) এই অপ-বিজ্ঞান নিয়ে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিয়ে। এর পরেও আমরা বিজ্ঞানীরা যদি চুপ করে বসে থাকি তাহলে আমরা কেবল বিজ্ঞানের প্রতিই অবিচার করব না, সেটা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিও অবিচার করা হবে।"

সম্প্রতি টাটা ইনসিটিউট অফ ফাউন্ডেশনাল রিসার্চ-এর বিশিষ্ট মহাকাশ বিজ্ঞানী সের্গে ভাহিয়া হিন্দুধর্মাবাদীদের এই ধরনের উদ্ভট বক্তব্যের নিন্দা করে 'কারেন্ট সায়েন্স' নামক পত্রিকায় 'বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের উন্নতির দাবি সম্পর্কে মূল্যায়ন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বলেছেন, "এইরকম দাবি গ্রহণ করা কঠিন যখন কিনা ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরের ভূগোল সম্পর্কে তাদের সম্যক ধারণা ছিল না। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে আর্যভট্টের সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহজগতের কথা বলার আগে পৃথিবী যে গোলাকার এখানে এই ধারণার অস্তিত্ব ছিল না।" তিনি আরো বলেছেন, "প্রাচীন ভারতে উন্নতির সত্যিকারের চিত্র নিয়ে বিজ্ঞানীদের সম্যক জ্ঞান অর্জন করা উচিত যাতে তারা সেই জ্ঞানের অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে গিয়ে এইসব অপবিজ্ঞানের প্রচারকদের মোকাবিলা করতে পারে যেখানে কিনা এই প্রচারকরা সাংগঠিত, আর্থিকভাবে শক্তিশালী এবং রাষ্ট্র তাদেরকে প্রত্যক্ষ সহায়তা না হোক ক্রমগত সহায় করে চলেছে।"

ভাহিয়ার মত সমর্থন করে 'সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজি'-র বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পুষ্প ভার্গাবত বলেছেন, "এই বিষয়ে কেনও সন্দেহ নেই যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার, যা আসলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকের রাজনৈতিক

নূর, তার আমলে একদল দুর্বৃত্ত ভারতীয় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ক নীতিকে নাগুণিত করবার চেষ্টা করছে। বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত বেশ কিছু পদে নাগোগের দিকে তাকালেই সেটা পরিষ্কার যায়।" প্রাচীন ভারত সম্পর্কে হিন্দুধর্মাবাদীদের এইসব আজ্ঞাবহি গল্পের সমালোচনা করেছেন আর এক বিশিষ্ট মহাকাশ বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারসিংকার। তিনি বলেছেন, "বর্তমানে আমরা প্রতিটি গ্রামে পানীয় জল ও বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার কথা বলছি কারণ তার প্রযুক্তি আমাদের হাতে আছে। মহাভারতের সময়ে সবচেয়ে ধনী ও শক্তিশালী কৌরবদের রাজসভাতেও বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না। তাই ওই সময় সম্পর্কে কোনও কথা বলতে গেলে এই বাস্তবতা মাথায় রাখা উচিত।" মহাভারতের ব্রহ্মাঙ্কে নিউক্লিয়ার অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "ওই সময়ে নিউক্লিয়ার অস্ত্র আবিষ্কার হবার প্রমাই ওঠে না। নিউক্লিয়ার বিষয়ে জ্ঞানের জন্য তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার এবং সেই জ্ঞান যে ছিল তার কোনও প্রমাণ নেই।"

মহান বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার সাবধান বাদী

মেঘনাদ সাহা যে একজন বড় মানের বিজ্ঞানী ছিলেন এবং তার বিভিন্ন আবিষ্কার যে আন্তর্জাতিক মহলে বিশেষভাবে স্বীকৃত একথা সবাই একথাকো স্বীকার করেন। কিন্তু যে বিষয়টি খুব কম মানুষই জানেন তা হল তিনি সনাতনপন্থীদের বিভিন্ন আবেগনিক ধারণার বিরুদ্ধে জোরালোভাবে বিতর্ক চালান এবং তাদের বক্তব্যের অসারতা তুলে ধরতে একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেন। এইরকম প্রবন্ধের একটির শিরোনাম ছিল 'সবই ব্যাধি আছে'। এই প্রবন্ধ রচনার পেছনে একটি মজার ইতিহাস আছে। মেঘনাদ সাহা সবে গবেষণার কাজ করে বিশেষ থেকে ফিরেছেন। এইসময় অনিল বরণ রায় নামে ঢাকা শহরের একজন স্বনামধন্য উকিল মেঘনাদ সাহার কাছে তার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। মেঘনাদ সাহা বিশেষ আগ্রহ নিয়ে তার কাছে নিজেদের গবেষণা সম্পর্কিত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। কিন্তু আলোচনা চলার সময় ওই ব্যক্তি মাঝে মাঝেই বলতে লাগলেন, "এ আর নতুন কি ইইলো, এ সমস্তই ব্যাস আছে।" মেঘনাদ সাহা তাকে বেশের কোনও

তবে বিশ্বের সমস্ত দেশেই বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কিছু কিছু কট্টর ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য দেখানোর চেষ্টা করে যে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি আসলে তাদের ধর্মগ্রন্থেই নিহিত আছে। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রগুলির হাজারি থাকার তত্ত্বটি ঠিক এরকম বিজ্ঞান বিষয় নয়, তা ভারতীয় সমাজের একটি বিশেষ শক্তিশালী প্রবণতা হিসেবে উপস্থিত রয়েছে এবং এই প্রবণতার জন্ম হয়েছে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ে। যার ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে যুক্ত এবং বিজ্ঞানীদের অনেকেও এই ধরনের মতামত পোষণ করে থাকেন। বলা যায় যে বিষয়টি ভারতীয় সমাজের ঔপনিবেশিক পর্যায়ে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিকাশের ফসল। তাই প্রাচীন ভারতের হিন্দু শাস্ত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত সূত্রগুলির হাজারি থাকার তত্ত্বটি নিছক আজকের হিন্দুত্ববাদীদের আবিষ্কার নয়, সেটার উদ্ভাবন হয়েছিল সেই ব্রিটিশ ভারতেই। ব্রিটিশ শক্তি ভারতীয় অঞ্চলের শাসন

একথা আমরা সবাই জানি যে ব্রিটিশ শাসকদের নীতির ফলে ভারতীয় প্রকৃত শিল্প উৎপাদনের যেসব ক্ষেত্রগুলিতে বেশ এগিয়ে ছিল সেগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। তৎকালীন সময়ে ভারতের বস্ত্রশিল্প এতই উন্নত ছিল যে ভারত থেকে ইংল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশে তা বিপুল পরিমাণে রপ্তানি হত। আর ব্রিটিশ কলপূর্বক সেই শিল্পকে এমনভাবেই ধ্বংস করে যে ভারত বস্ত্র রপ্তানির বদলে আমদানিকারক দেশে রূপান্তরিত হয় আর এই সব শিল্পের সাথে যুক্ত মানুষজন বেকার হয়ে পড়ে এবং কৃষির উপর আরো চাপ বেড়ে যায়। ব্রিটিশের লক্ষ্য ছিল যাতে ভারত একদিকে কাঁচামালের সরবরাহকারী ও অপরদিকে ব্রিটিশ শিল্পপণ্যের বাজার হিসেবেই বজায় থাকে। অপরদিকে ব্রিটিশের এই বাণিজ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সহায়তা করার মাধ্যমে দিয়ে পার্শ্ব, মাদ্যোয়ারী ও গুজরাটী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের একটি অংশ ফুলে ফেঁপে ওঠে। পরবর্তীতে এদের অনেকে শিল্পপতি হয়ে উঠলেও পুঁজি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিদেশ নির্ভরতা কাটিয়ে স্বনির্ভর প্রযুক্তি গড়ে তোলবার কোনও প্রবণতা এদের ছিল না, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি আমদানিতেই এরা অভ্যস্ত ছিল এবং তা ব্রিটিশ শাসকদের চাহিদা ও এদের উচ্চ মুনাফার আকাঙ্ক্ষার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তাই ভারতে এদের নেতৃত্বে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি দেশীয় বিজ্ঞান চর্চার বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও গতি আনতে পারেনি। এর সাথে সাথে ব্রিটিশশক্তি ভূমিরাজ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে জমির মালিকানার ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন ঘটায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে অনেক জায়গাতেই পুরনো জমিদার-সামন্তরা উচ্ছেদ হয়ে কৃষির সাথে সম্পর্কহীন ও হাতে পয়সা থাকা উচ্চবর্ণীদের একটি অংশ নব্য জমিদার শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়। একটি পর্যায়ে এইরকম একটি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বজায় রেখে দেশ পরিচালনার লক্ষ্যে দেশেরই একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশকে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের নানা ধরনের সরকারি কাজে নিয়োগ করা হয়। আর এই সুযোগ পায় মূলত সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ যারা ইতিমধ্যেই

জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার অস্তিত্বের কারণে সমাজে আধিপত্যকারী অবস্থানেই ছিল।

ফলতঃ সমাজের এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশটি শ্রেণিগতভাবে একদিকে ছিল ব্রিটিশ শক্তি ও নব্য জমিদার শ্রেণির পক্ষে এবং অপরদিকে বিশেষত জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার সংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন থাকায় এরা সমাজের শ্রমজীবী মানুষ ও কৃষক যারা কিনা মূলত নিম্ন জাতি-বর্ণের মানুষ তাদের ঘৃণার চোখে দেখতে অভ্যস্ত ছিল। তাই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে কেবল ব্রিটিশ আশ্রিত জমিদার শ্রেণি নয়, সমাজের এই উচ্চবর্ণীয় মধ্যবিত্ত অংশটিও মূলগতভাবে ব্রিটিশের পক্ষে ছিল এবং পরবর্তীতেও ব্রিটিশ শাসক ও জমিদার বিরোধী অসংখ্য যে কৃষক বিদ্রোহ ঘটে এরা তার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এটা ঠিক যে কেরানি তৈরির লক্ষ্য নিয়ে ব্রিটিশ সরকার নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করলেও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটি অংশ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি অনুরাগ নিয়েই নবজাগরণের সূচনা করেছিল, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সামাজিকভাবে এই শ্রেণির অপ্রগতিশীল চরিত্র তাকে সেদিকে বেশিদূর এগোতে দেয়নি। অপরদিকে আমরা দেখেছি যে ব্যবসায়ী ও শিল্প মালিকরাও ছিল ব্রিটিশ শক্তির সহযোগী ও স্বনির্ভর বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশে অনাগ্রহী। প্রসঙ্গত ইউরোপের নবজাগরণের নেতৃত্ব ছিল তৎকালীন সময়ের মধ্যবিত্ত ও শিল্পমালিক শ্রেণির হতে যারা বিজ্ঞান চিন্তাকে হাতিয়ার করে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণি একদিকে ব্রিটিশ শক্তির পূজারী ও অন্যদিকে সমাজের প্রধান শক্তি শ্রমজীবী জনগণের প্রতি ঘৃণার সংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন থাকার কারণে ঐতিহাসিকভাবে সেই বৈপ্লবিক গুণ অর্জন করতে পারেনি। ফলে জাতীয় গর্ববোধ তৈরি করার কোনও মৌলিক ও প্রগতিশীল উপাদান না পেয়ে এই শ্রেণি একটি মিথ্যা অহমিকা বোধের শিকার হয়ে পড়ে। প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিরাই সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, সেগুলি বেদ ও উপনিষদে নিহিত আছে এবং আজকের পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা সেগুলিরই পুনরাবিষ্কার করে চলেছে, আর তাই আমাদের পূর্বপুরুষরাই বিজ্ঞানের আসল কারিগর—এরকম একটি চিন্তাভাবনা শক্তিশালী হতে থাকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই নবজাগরণ একটি পর্যায়ে সক্ষীর্ণ হিন্দু জাগরণের কর্মসূচিতে

রূপান্তরিত হয়। তাই এই নবজাগরণের একটি পর্যায়ে বিবেকানন্দ হয়ে উঠেছিলেন হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করবার অন্যতম নায়ক। ১৮৯৬ সালে তিনি বলেছেন, “আধুনিক বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কারের সাথে প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদের মতের আশ্চর্য সামঞ্জস্য আছে, এমনকি যদি কোথাও কিছু অপূর্ণতা থাকে তাহা রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যেই।”

হিন্দুত্ববাদীদের নেতৃত্বে এই অপবিজ্ঞানের প্রচারের বিস্তৃতি

তবে তৎকালীন সময়ে এই ধরনের বক্তব্যগুলি ছিল খুবই বিমূর্ত, আধুনিক বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট আবিষ্কারগুলিকে প্রাচীন হিন্দুদের আবিষ্কার হিসেবে সেভাবে চিহ্নিত করা হয়নি বা প্রাচীন ভারতে সেইসব বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও প্রযুক্তি বাস্তবেই হাজির ছিল এমনটাও দাবি করা হয়নি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান, বৃহৎ গণমাধ্যম ও কিছু বিজ্ঞানী হিন্দুত্ববাদীদের এই দাবিকে একটি বৈজ্ঞানিক মোড়কে হাজির করে জনগণকে আরো বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রামকৃষ্ণ মিশন, যারা কিনা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে, তাদের মুখপত্র ‘উদ্বোধন’-এ বলা হয়েছে যে আধুনিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা কৃষ্ণ গহ্বর (Black Hole)-র ধারণা নাকি মোটেই নতুন নয়, হিন্দুধর্মের প্রবক্তারা অনেক আগেই কৃষ্ণ গহ্বরের বিষয়টি উপলব্ধি করেছিল। আবার স্বঘোষিত প্রগতিশীল পত্রিকা ‘দেশ’-এর ১৯৯৫ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বিজ্ঞান ও ভগবান’ শীর্ষক প্রবন্ধে ঋষিকেশ সেন বলতে চেয়েছেন যে বেদান্তে বর্ণিত উর্গনাভ বা মাকড়সার সাথে আধুনিক বিজ্ঞানে প্রস্তাবিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মডেলের বিশেষ মিল পাওয়া যায়।

বেদের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির অস্তিত্ব যেভাবে হাস্যকর উপায়ে দেখানোর চেষ্টা চলে তার কয়েকটি উদাহরণ এইরকম;

(ক) পরমাণু তত্ত্বকে সানন্দে বৈদিক বিজ্ঞান হিসেবে দেখা যেতে পারে। এরজন্য কেবল ধনাত্মক আধানকে সাত্ত্বিক গুণ ও ঋণাত্মক আধানকে তামসিক গুণের সাথে এক করে দেখতে হবে।

(খ) কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে বেদান্তে তত্ত্ব হিসেবে দেখা যেতে পারে যদি কোয়ান্টাম শক্তিকে চেতনার সাথে এক করে দেখা হয়।

(গ) বিবর্তনবাদকে বৈদিক আবিষ্কার হিসেবে দেখা যেতে পারে যদি প্রজাতির বিবর্তনকে আত্মার পুনঃ পুনঃ শারীরিক রূপ নেওয়ার মাধ্যমে তার আধ্যাত্মিক অগ্রগতি হিসেবে দেখা হয়। উল্লেখ্য যে এই ধারণার জনক স্বয়ং ঋষি অরবিন্দ যোগ।

তবে সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা স্টেট ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার বিভাগের অধ্যাপক সুভাষ কাক ও ডাঃ রাজা রামমোহন রায় তাদের রচিত পুস্তক ও লেখাপত্রে যেসব দাবি করেছেন তার জুড়ি মেলা ভার। সুভাষ কাক দাবি করেছেন যে বেদের শ্লোকগুলির মধ্যে আসলে জ্যোতির্বিদ্যার আধুনিক সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্যগুলি নিহিত আছে। উল্লেখ্য যে ডক্টর রাজা রামমোহন রায় ১৯৯৯ সালে 'সায়েন্টিফিক অরিজিন অফ হিন্দুইসম' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন যে পুস্তকের মুখবন্ধ লিখেছিলেন সুভাষ কাক। এই রচনাতে দাবি করা হয়েছে যে ঋগ্বেদকে আসলে কণা পদার্থবিদ্যা (Particle physics) মহাকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। তবে বেদে সমস্ত আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রগুলি রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক রূপে; এমন অনেক শ্লোক রয়েছে সাধারণ অর্থে দেখলে যেগুলির বিশেষ কোনও অর্থ হয় না, কিন্তু আসলে সেগুলি এতটাই উচ্চমার্গের বৈজ্ঞানিক ধারণা যে তাতে প্রাকৃতিক ধ্রুবকগুলির একেবারে সঠিক মান নিহিত রয়েছে যা কিনা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিককালে আবিষ্কার করেছেন। যখন বেদের কোনও ভাষা 'গাও' কথাটি বলা হচ্ছে সেখানে আসলে পৃথিবীর কথা বলা হচ্ছে। যখন গৃহপালিত পশুর কথা বলা হচ্ছে তখন আসলে বোসন (Boson, named after S. N. Bose) কণাকে বোঝানো হচ্ছে যারা কিনা একই অবস্থায় অনেকে একসাথে থাকতে পারে (যেমন ফোটন কণা), কিন্তু যখন বন্য পশুর কথা বলা হচ্ছে তখন তার দ্বারা ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি ফার্মিয়ান কণাকে বোঝানো হচ্ছে। উল্লেখ্য যে পাণ্ডুলির বর্জন নীতি অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় একটিই ফার্মিয়ন কণা থাকতে পারে।

বিজ্ঞানী রাজা রামমোহন রায় আরো দাবি করেছেন যে বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে যে মহা বিস্ফোরণ তত্ত্ব রয়েছে তাতে যেসব ফাঁক ফোকর আছে বেদে বর্ণিত

মহাজাগতিক তত্ত্ব তার নাকি সমাধান পাওয়া যায়। লেখকের নিজের কথাই শোনা যাক; "... the Vedas have returned to tell an even greater truth [than mass-energy equivalence]: equivalence of space, mass and energy. Space is no different from matter and energy. In the beginning there was no mass-energy in the universe because there was no space. Mass-energy is created due to expansion of the universe. The universe cannot expand without creating mass-energy and universe cannot contract without annihilating mass-energy. Thus the universe started with zero mass energy and will end up with zero mass-energy as well. Thus there was no singularity in the beginning and there will be no singularity at the end." অর্থাৎ বেদ ভর ও শক্তির সমতুল্যতার বললে আরো বড় সত্যের সন্ধান দিয়েছে; তথা দেশ, ভর ও শক্তি এই তিনের সমতুল্যতার ও তাদের নিত্যতার সূত্র হাজির করেছে। অর্থাৎ দেশ বা মহাশূন্য ভর ও শক্তি থেকে আলাদা কিছু নয়। প্রারম্ভে যেহেতু দেশের অস্তিত্ব ছিল না তাই ভর ও শক্তিরও অস্তিত্ব ছিল না। বিশ্ব প্রসারণের ফলেই ভর ও শক্তির উদ্ভব হয়েছে। ফলে জগতের শুরুতে ভর ও শক্তি ছিল না এবং ভবিষ্যতে ভর ও শক্তির ক্রমাগতই জগতের সমাপ্তি ঘটবে। তাই বৈদিক তত্ত্বে শুরুতেও যেমন কোনও অসঙ্গতি নেই, তেমনি তা সমাপ্তিতেও থাকবে না।

তবে মজার ব্যাপার হল লেখকের কোনও দায় নেই যেন লিখে দিলেই বিজ্ঞান হয়ে গেল। আইনস্টাইন আবিষ্কৃত দেশ ও কালের নতুন তত্ত্ব থেকেই ভর ও শক্তির সমতুল্যতার কথা বোঝা গেছে এবং তার একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির সমতুল্য। আরো পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে কোনও বিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর ধ্বংস হলে তার বদলে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় তা হল ওই ভর ও শূন্যে আলোর গতিবেগের বর্গের গুণফলের সমান। শূন্যে আলোর গতিবেগের

মান বিপুল হওয়াতে সামান্য পরিমাণ ভর কিছুই হয়ে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। বেদের ভাষ্য অনুসারে রায় কিন্তু নেশ, ভর ও শক্তির সমতুল্যতার সম্পর্কটি কেমন সে কথা আমাদের জ্ঞাননিমিত্ত। আর এটাও বোকা দায় যে রায় যেখানে বসেছেন যে বৈদিক ভাষ্য অনুযায়ী এই তিনটি উপাদানই একসাথে সৃষ্টি হয়ে চলে এবং ভবিষ্যতে একসাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে সেখানে সমতুল্যতার প্রমাণটি কীভাবে আসে?

এখানেই শেষ নয়, রায় যোষণা করেছেন যে গামা রশ্মি, প্যারিটি ভায়োলেশন (যা বিটা কণার নিঃসরণের সাথে সম্পর্কিত), কণা ও তার বিপরীত কণার অস্তিত্ব; যেগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের বিরাট অগ্রগতি সূচিত করে সেগুলির সমস্ত কণা নাকি প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়।

জ্ঞানার্জনের উজ্জ্বল বৈদিক পদ্ধতি

সাধারণভাবে জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়াটা হল এই যে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণের মাধ্যমে ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মানুষের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান অর্জিত হয়, সেই অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের সারংশটি নিয়ে তৎকালীন সময়ে অর্জিত যুক্তি ও বিচারধারা প্রয়োগের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সূত্র রচিত হয়। আবার সূত্রগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার পর নিজে থেকেই সঠিক প্রমাণিত হয়ে যায় না। সেই সূত্রগুলির উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল আগাম অনুমান করা হয় যে পরীক্ষাগুলি তখনও করা হয়নি। যদি এরকম বহু বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফলের সাথে যেগুলি মিলে যায় তাহলে একটি পর্যায়ে সূত্রগুলি বৈজ্ঞানিক সূত্র হিসেবে সমাজে গৃহীত হয়। আর ফলাফল না মিললে সূত্রটিকে বর্জন বা পরিমার্জন করে নতুন সূত্র তৈরি করতে হয় এবং পরবর্তীতে আবার একই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ কলা যায় যে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ আবিষ্কারের পর সেই সময়কার যুক্তিধারা (তরঙ্গের প্রবাহের জন্য মাধ্যম আবশ্যিক) প্রয়োগ করে ইথার তত্ত্ব তৈরি হয়। কিন্তু মাইকেলসনের পরীক্ষার ফলাফল এই ইথার তত্ত্বকে বাতিল করে। ফলে নতুন পুরনো যুক্তিধারাকে অগ্রাহ্য করে নতুন তত্ত্ব আসে আর এই নতুন তত্ত্ব হল আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব যা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফলের

সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এইভাবে জ্ঞান ক্রমাগত নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে পৌঁছতে থাকে। এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া থেকে আমরা বলতে পারি যে মানুষের জ্ঞানের উৎস হল মানুষের সাথে প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রশ্নটি আসা স্বাভাবিক তা হল যে কীভাবে বৈদিক ঋষিরা আধুনিক পদার্থবিদ্যার এইসব সূত্র জানতে পারলেন? তাদের পদ্ধতি কী ছিল? তারা যদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকে তাহলে তার ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় না কেন? এর উত্তরে বৈদিক বিজ্ঞানের প্রবক্তারা জানাচ্ছেন যে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যকে জানার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি হতে পারে না। এদের মতে বৈদিক ঋষিরা যোগবিদ্যা বা ধ্যানের মধ্যে দিয়ে তাদের চেতনাকে রূপান্তরিত করে ব্রহ্মের সাথে একাধ্ব হন, যেখানে প্রকৃতির সমস্ত জ্ঞান নিহিত থাকে। এই পর্যায়ে যেহেতু চেতনা ও প্রকৃতি সবকিছু একাকার হয়ে কেবলমাত্র অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানের অস্তিত্ব থাকে, তাই সেই পর্যায়ে পৌঁছে তারা প্রকৃতির সমস্ত নিয়মকানুন উপলব্ধি করতে পারেন। আর এই বৈদিক ধ্যানযোগ পদ্ধতিতে নাকি অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর তাদের নির্ভরতা ও বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের যাচাই হওয়া—এই দুটি শর্ত আপনা আপনিই পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু এতসব কথা বলে বাস্তবে এরা যেটা করে থাকে তা হল হিন্দু প্রাচীন গ্রন্থ থেকে কিছু শ্লোককে সামনে আনা যেগুলির নানারকম অর্থ করা যায়। এবার সেই শ্লোকের এমন একটি অর্থ করা হয় যাতে মনে হয় তা আধুনিক বিজ্ঞানের কোনও একটি আবিষ্কারের মর্মবস্তু।

রাষ্ট্রপ্রধানদের লজ্জাকর ভূমিকা

কেবল নির্বাচনে ভোটের নিরিখে নয়, অপবিজ্ঞানের প্রচারেও আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায় সবাইকেই ছাপিয়ে গেছেন। সম্ভ্রান্তি তিনি রিলায়েন্সের হাসপাতাল উদ্বোধনে এসে এক দাক্ষায় প্রাচীন ভারতের অভ্যাস্চর্য উদ্‌গতির তত্ত্ব হাজির করেছেন। আজ আধুনিক বিজ্ঞানের যেসব কৃৎকৌশল ও প্রযুক্তি আমাদের সাধারণত পাশ্চাত্যের দেশ থেকে আমদানি করতে হয় তা নাকি প্রাচীন ভারতে যত্নতত্ত্ব পাওয়া যেত। বিশেষত জিন সম্পর্কিত আধুনিক প্রযুক্তি ও প্লাস্টিক সার্জারী প্রাচীন ভারতে অজানা ছিল না। তিনি তার বক্তব্য

প্রমাণ করতে গিয়ে বলেছেন, “মহাভারত বলছে যে কর্ণের জন্ম মায়ের গর্ভে হয়নি। এর অর্থ হল যে মানুষ তখন জিন সম্পর্কিত বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিল।” গণেশ ঠাকুরের মাথা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “সেইসময় নিশ্চয়ই এমন একজন প্লাস্টিক সার্জন ছিলেন যিনি গণেশের ধরে হাতের মাথা সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন।” (ইন্ডিয়া টুডে, নিউ দিল্লি, অক্টোবর ২৫, ২০১৪) সদ্য সমাপ্ত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে প্রায় ২০০০ ইতিহাসবিদ মোদীর এই বক্তব্যের উল্লেখ করে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের প্রতি আবেদন রেখেছেন যে তারা যেন এমন বক্তব্য না রাখেন যা প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত।

অপবিজ্ঞান প্রচারের ব্যাপারে মোদীর পারিষদবর্গও কম যান না। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন যে কোয়াস্টাম পদার্থবিদ্যার অন্যতম জনক হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্র নাকি উপনিষদের উপর ভিত্তি করে আবিষ্কৃত হয়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথের সাথে বেদ নিয়ে আলোচনার উপর ভিত্তি করেই হাইসেনবার্গ তার এই সূত্রের ধারণাটি পেয়েছিলেন। (The Times of India, Nov, 16, 2014) নিম্নকেরা বলে থাকেন যে অনিশ্চয়তা সূত্রের আবিষ্কারের দু বছর পরে হাইসেনবার্গের সাথে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তবে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যকে হিন্দুত্ববাদীরা খোঁরাই কেয়ার করেন।

মোদী সরকার সম্প্রতি ওয়াশি, সুদর্শন রাওকে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ-এর মাথায় বসিয়েছেন যাতে অনেকেই মনে করছে যে এতে শিক্ষাজগতে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা ও অনুসন্ধানের বদলে হিন্দু শাস্ত্র ও পুরাণ কাহিনীর সভ্যতা প্রতিষ্ঠারই অপচেষ্টা চলবে। বিজেপি শাসিত দুটি রাজ্য যথা গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে বিতর্কিত হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা দিননাথ বাত্রাকে পাঠ্যপুস্তক রচনার উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। গুজরাটের কয়েক হাজার স্কুলে যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়েছে তাতে দেখানো হয়েছে যে মেটরগাড়ি প্রাচীন ভারতে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত বাজপেয়ীর জন্মনায় মানবশক্তি উন্নয়ন মন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশী ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্নাতক স্তরে জ্যোতিষবিদ্যা চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশের

বিরুদ্ধে মলিকিউলার বায়োলজির বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পুষ্প ভার্গভ ও চন্দনা চক্রবর্তী সূপ্রীম কোর্টে আবেদন জানান। প্রশান্ত ভূষণ বিষয়টি নিয়ে কোর্টে লড়াই চালাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আবেদনটি কোর্টে গ্রহণ করা হয় বটে কিন্তু বিচারকদের সম্পূর্ণ অযৌক্তিক জ্যোতিষবিদ্যাতে অগাধ বিশ্বাসের কারণে পরবর্তীতে এই আবেদন বাতিল হয়ে যায়।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার সাথে হিন্দুত্ববাদীদের সখ্যতা

তবে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান নিয়ে এই হিন্দুত্ববাদী শাসকেরা যতই আত্মদিত হোক না কেন এরা ব্রিটিশ আমলে সৃষ্ট এদের পূর্বসূরীদের বিদেশি পণ্য, বিদেশি প্রযুক্তির প্রতি লালসা কোনওভাবেই বর্জন করতে পারেনি, বরং বিশ্বায়নের আবহে তার মাত্রা আরো বেড়ে গেছে। যতই এরা প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের আবহে তার মাত্রা আরো বেড়ে গেছে। ভারতীয় জনগণের সৃষ্টিশীলতায় এদের উন্নতি নিয়ে গালগল্প চালাক না কেন, ভারতীয় জনগণের সৃষ্টিশীলতায় এদের আদৌ কোনও আস্থা নেই তাই বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তির জন্য এরা চিরকালই লালায়িত থেকেছে। দেশীয় প্রযুক্তিকে উন্নত করে ট্রেনের গতি বাড়ানো নয়, জাপান থেকে প্রযুক্তি এনে কয়েকটি দ্রুতগতির ট্রেন চালানোই এদের স্বপ্ন। স্বনির্ভরতার বদলে এই বিদেশি নির্ভরতার জন্য প্রতিবছর দেশের জাতীয় সম্পদের ২০% বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে তাতে এদের কিছু যায় আসে না। কোনও লজ্জা শ্রমের বালিহ না রেখে এরা খোষণা করে চলেছে যে বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তি জুড়া নাকি এক পাও এগিয়ে চলা যাবে না, আর বিদেশি পুঁজি আকর্ষণ করার জন্য শ্রম অহিনের সংস্কার ঘটিয়ে দেশকে সর্বাধিক সম্ভাব্য শ্রমের ভাণ্ডার হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, পরিবেশ অহিন লঘু করতে হবে। তাই আজ প্রতিরক্ষা সহ অর্থনীতির এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তির জন্য তার দ্বার খুলে দেওয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী ও বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা বিদেশি পুঁজি আকর্ষণ করতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেবার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। আর সেগুলি হল সস্তার বা কিনামূল্যে জমি, বিদ্যুৎ, জল, কর ছাড় আর তার সাথে শ্রম অহিনের লঘুকরণ যাতে সস্তার শ্রম সহজলভ্য হয়। আর এই কাজে ক্রমাগত উৎসাহ যুগিয়ে চলেছে মার্কিন সহ নানা দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা। তারা একদিকে যেমন আরো আর্থিক সংস্কারের

জন্য চাপ দিয়ে চলেছে তেমনি ইক্ষনের মত অপবিজ্ঞানের প্রচারকারী নানা ধরনের হিন্দুত্ববাদী সংস্থাকেও মদত করে চলেছে। বিজ্ঞান নিয়ে গালগল্পের প্রচারে মোহিত হয়ে ভারতীয় জনগণ যদি মুখ বুজে বিদেশি পুঁজির সেবা করে চলে তবে এই সঙ্কটের সময়ে সেটা তো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে স্বর্গ পাওয়ার মত ব্যাপার। তাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের পুঁজির বিনিয়োগ ও মুনাফার স্বার্থ রক্ষা করতে বাকি দুনিয়ার ধর্মাত্মক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে মদত করে দেশগুলিকে আজীবন পিছিয়ে রাখতে চায়, বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাকে আটকে রাখতে চায়, তাদের সংগ্রাম বিমুখ রাখতে চায়, কারণ সেটা ছাড়া তারা বিশ্বজুড়ে একচেটিয়া পুঁজির কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না।

তাই নয়া অর্থনীতির সংস্কার কর্মসূচী আর হিন্দুত্ববাদীদের অপবিজ্ঞানের প্রচারের তীব্রতা বৃদ্ধির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আসল প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান নিয়ে এইরকম অপপ্রচার চালানোর মাধ্যমে একটি হিন্দুত্ববাদী অহমিকা জাগানোর চেষ্টা হচ্ছে যার মধ্যে দিয়ে দলিত, মুসলিম, আদিবাসী ও সাধারণভাবে নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী মানুষদের উপর কর্তৃত্ব চালানো যায়। পরমাণু চুল্লী বসানো, খনিজ সম্পদের লুণ্ঠন, নগরায়ণ ইত্যাদি নানা ধরনের উন্নয়নের নাম করে প্রয়োজন মতো তাদের কৃষিজমি ও বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করা যায়, শ্রম আইন বদলে দিয়ে সামান্য মজুরিতে খাটানো যায়। তাই এই অপবিজ্ঞানের প্রচার নিছক কিছু অন্ধ হিন্দুত্ববাদীদের হাতে নেই, তার সাথে জড়িয়ে পড়েছে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ, এই কাজে অর্থ আসছে রাষ্ট্রীয় ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহযোগিতায়। অপরদিকে দেশে সামান্য যে গবেষণার কাজকর্ম চলে সেগুলিকে অকার্যকরী করে দেওয়া হচ্ছে বা সেগুলির মাথায় অযোগ্য লোকদের বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কার্গিল-মনসান্টোর মত কর্পোরেট পুঁজির চাপে অনেক আগেই দেশীয় ফসলের বীজ নিয়ে গবেষণা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ইউ.জি.সি., সি.এস.আই.আর. ইত্যাদি সংস্থার অর্থে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা সময়মতো তাদের বেতন পাচ্ছেন না। অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কুসংস্কারকে মদত দিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যম হিন্দুত্ববাদী চিন্তায় আচ্ছন্ন ব্যক্তিদের বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অতি সম্প্রতি বিজ্ঞান গবেষণাকে আরো

সঙ্কুচিত করতে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে বিশেষ কিছু স্বল্প ভাতার ফেলোশিপ চালু ছিল সেগুলিকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে ছাত্ররা আন্দোলন করলে তাদের উপর পুলিশী আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক সত্যকে তুলে ধরে হিন্দুত্ববাদীদের অপবিজ্ঞান প্রচারকে প্রতিহত করতে হবে

কিন্তু এইসব হিন্দুত্ববাদীদের ফাঁকি ধরা পড়ে যায় বিজ্ঞানের নিয়মেই। কারণ বিজ্ঞানের বিকাশের একটি ইতিহাস আছে যেখানে দেখা যায় কীভাবে উৎপাদনের কাজ সহ প্রকৃতির উপর মানুষের অসংখ্য প্রায়োগিক ক্রিয়াকলাপ ও তার মধ্যে দিয়ে অর্জিত বহু আপাত বিচ্ছিন্ন সাধারণ অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের ভিত্তি তৈরি করে! অপরদিকে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলির মধ্যে একটি পরম্পরা সম্পর্ক রয়েছে, পূর্বের অনেক আবিষ্কার ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের শর্ত হিসেবে কাজ করে। আবার প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অতীতের তত্ত্বগুলির সীমাবদ্ধতা ভবিষ্যতের তত্ত্ব আবিষ্কারের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এমনকি আজকের গণিতবিদ্যাকে যতই বিমূর্ত মনে হোক না কেন তারও উদ্ভব ঘটেছে মানুষের প্রায়োগিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়েই। সংখ্যা এবং জ্যামিতিক চিত্রের ধারণার উৎস বাস্তব জগত ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। গণিতের সবচেয়ে মৌলিক উপাদান তথা গণনার আবিষ্কার মানুষের মনে স্বাধীন সৃষ্টির ফসল নয়, এবং এর জন্য কেবল গণনাযোগ্য বস্তুর উপস্থিতিই যথেষ্ট নয়, গণনার ক্ষেত্রে বস্তুগুলির নির্দিষ্ট গুণগুলি উপেক্ষা করবার ক্ষমতা অর্জন করা আবশ্যিক এবং একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্যে দিয়েই সমাজে এই বিমূর্তায়নের ক্ষমতা অর্জিত হয়।

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত গ্রহের গতি সংক্রান্ত কেপলারের সূত্রাবলী ও গ্যালিলিওর গতি সম্পর্কিত তত্ত্ব নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কারের ভিত্তি তৈরি করেছিল, একইভাবে তড়িৎ ও চুম্বক নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সেই সম্পর্কিত নানা সূত্রাবলী ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্বের ভিত্তি তৈরি করেছিল। আবার ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের প্রবাহ ব্যাখ্যা করতে যে ইথার তত্ত্ব হাজির করা হয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার

ফলাফলে তার সমর্থন মেলেনি এবং এই কারণে পরবর্তীতে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কারের জমি প্রস্তুত হয়। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে দেশ ও সময়ের ধারণার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আসে সেটি আবার মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়ে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের আবিষ্কারের জমি তৈরি করে। আজকে মহাবিশ্ব সম্পর্কিত যেসব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের আবিষ্কার ছাড়া তা সম্ভব হত না। অপরদিকে তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক প্রকৃতি বিজ্ঞান একটি পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পরই অণু পরমাণুর জগতে এমন কিছু অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা সম্ভব হয় যার ফলাফল নিউটনীয় বলবিদ্যা বা ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছিল না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত এই বাস্তব সত্যগুলিকে তাত্ত্বিকভাবে আন্তর্জাতিক করার পরিকল্পনা থেকেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নতুন তত্ত্ব তথা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জন্ম হয়। বর্তমানে এই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রকৃতি বিজ্ঞানে বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছে। এই ধরনের বিকাশের ইতিহাস কেবল প্রকৃতি বিজ্ঞানের জন্যই সত্য নয়, তা বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার জন্য সত্য।

বিশেষত ঐতিহাসিকভাবে বিমান আবিষ্কারের বস্তুগত ভিত্তি তৈরি হওয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিজ্ঞানী ভাহিয়া তার 'Current Science'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে বলেছেন, "Similarly, to get to the stage of aeroplane, we needed to understand the dynamics of air and wind, its movement, measure air pressure and its difference when it went over a curved surface compared to a flat surface. Bernoulli's principle did not arise in vacuum and Wright brothers could not have even imagined an aircraft without a 100 years of industrial revolution and deep understanding of metal, internal combustion engine and so on..."

অর্থাৎ বিমান আবিষ্কারের পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য আমাদের বায়ুমণ্ডল ও

বাতাসের গতি সম্পর্কিত নিয়ম জানা দরকার, বায়ু চাপ ও বাঁকা তলের উপর বাতাস প্রবাহিত হলে বায়ুচাপের পার্থক্য পরিমাপ করার জ্ঞান থাকা দরকার। বার্নোলীর তত্ত্ব আকাশ থেকে পড়েনি, এবং ১০০ বছরের শিল্প বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ধাতুর গুণ ও খনিজ তেল চালিত ইঞ্জিনের তত্ত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ছাড়া রাইট ভ্রাতাদের পক্ষে বিমান আবিষ্কার তো দূরের কথা, তা কল্পনা করাও সম্ভব হত না।

একইভাবে জিন প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। অণু পরমাণু সম্পর্কিত জ্ঞান, জীবদেহের উপাদানের ক্ষেত্রে কার্বনের বিশেষ ভূমিকা, এক্স রে ও মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কার, জীবকোষ ও তার গঠন সম্পর্কিত জ্ঞান, জিনের আবিষ্কার ও তার গঠন সম্পর্কিত জ্ঞানের সাথে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার আরো বিভিন্ন আবিষ্কার যুক্ত হয়েই আজকের জিন প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। এর সাথে যুক্ত রয়েছে বেশ কয়েক দশকের বহু বিজ্ঞানী ও বহু গবেষণাগারের বিশেষ কাজকর্ম। এই ধারাবাহিকতার ইতিহাস ছাড়া জিন প্রযুক্তির বিকাশ আদৌ সম্ভব হত না। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন এবং বিজ্ঞান চর্চার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ও দায়িত্ব না থাকা হিন্দুত্ববাদী শাসকদের পক্ষেই ভাবা সম্ভব যে ভারতে বৈদিক যুগেই এইসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটেছিল।

কর্পোরেট পুঁজির সেবায় নিয়োজিত হিন্দুত্ববাদীদের মুখোশ খুলে দিতে হবে বিজ্ঞানের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে পারলে খুব সহজেই হিন্দুত্ববাদীদের অপবিজ্ঞানের মুখোশ খুলে দেওয়া যায়। কিন্তু ভারতে শিক্ষার বিস্তার অত্যন্ত সীমিত হওয়ার ফলে কেবলমাত্র এই ধরনের প্রচার ব্যাপক মানুষের কাছে পৌঁছবে না। উন্টোদিকে অপবিজ্ঞানের প্রচারকরা প্রতি মুহূর্তে বহু মানুষের কাছে এই ধরনের ভ্রান্ত চিন্তা ভাবনা নিয়ে যাচ্ছে, এবং সেটা আরো ব্যাপক আকারে ঘটতে পারছে তার কারণ ভারত রাষ্ট্রের অনেক হোমরা চোমরা ব্যক্তি সেগুলির সাথে সহমত পোষণ করেন এবং নিজেরাই তার সপক্ষে প্রচার করে থাকেন। আর সেই কারণেই কেবল বিজ্ঞানের কথাই তুলে ধরা নয়, হিন্দুত্ববাদী শাসকেরা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নিরন্তর যেসব আক্রমণ নামিয়ে আনছে সেগুলি যে একচেটিয়া কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করতেই করা হচ্ছে এই

সত্যকে তুলে ধরতে হবে। কেবল কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত নয়, বর্তমানে নানা কৌশলে কৃষকদের সামান্য যে ভর্তুকী দেওয়া হয় তা কৌশলে বন্ধ করবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ২০ কোটি মানুষের জীবিকা যার উপর নির্ভরশীল সেই খুচরো ব্যবসায় বিদেশি ও তার সহযোগী দেশি পুঁজি ইন্টারনেট সহ নানারকম প্রযুক্তি নিয়ে থাকা বসিয়েছে, পরিবহন ক্রমাগত কর্পোরেট পুঁজির হস্তগত হচ্ছে, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে নষ্ট করে মুনাফাভিত্তিক স্বাস্থ্যনীতি গড়ে তোলা হচ্ছে এবং শিক্ষাকে কেবল বেসরকারিকরণ নয়, শিক্ষাকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাজারি পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে করে শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির মুনাফা কমানোর লক্ষ্যে আকর্ষণীয় পণ্য হয়ে উঠবে এবং এই ব্যবসার অধিকারের ক্ষেত্রে বিদেশি সংস্থার সাথে দেশি সংস্থার পার্থক্য করা যাবে না। এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দলিত ও পিছিয়ে পড়া বর্ণের মানুষ। ইতিমধ্যেই বেসরকারিকরণ ও আউটসোর্সিং-এর আবেহে সরকারি ক্ষেত্রে দলিত-আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষণ প্রথা অর্থহীন হয়ে উঠেছে, ভবিষ্যতে শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণও অর্থহীন হয়ে উঠবে। আর এইসব অপকর্মের বিরুদ্ধে যাতে নিষ্পীড়িত দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু মানুষের ঐক্যের ভিত্তিতে সংগ্রাম না গড়ে উঠতে পারে তার জন্য উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রচারে খোদ শাসকগোষ্ঠী ও তার বিদেশি প্রভুরা এতটা মরীয়া হয়ে উঠেছে। হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের কর্মসূচীর সাথে বিদেশি ও তার সহযোগী দেশি কর্পোরেট পুঁজির লুণ্ঠনের স্বার্থে জনগণের উপর অর্থনৈতিক আগ্রাসন চালানোর কর্মসূচির এই গভীর সম্পর্কে সামনে আনতে হবে তবেই সাধারণ মানুষ হিন্দুত্ববাদের আসল চালাকিটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র :

- ১। 'বিজ্ঞান, কর্ম ও বিশ্বাস', অপার্থিব জ্ঞান, মুক্তমনা, www.mokto-mona.com
- ২। 'মেঘনাদ রচনা সম্বলন', ওরিয়েন্ট লংগুজ, ১৯৮৬।
- ৩। 'বিজ্ঞান ও মতাদর্শ', আশীষ লাইব্রেরী, অবভাস।

- ৪। 'বৈবেকানন্দ মানস ঐতিহ্য ও আধুনিকতা' - কনিষ্ঠ চৌধুরী, সেতু প্রকাশনী।
- ৫। 'Vedic physics : Scientific origin of Hinduism', Raja Ram Mohan Roy, Golden Egg Publishing, 1999.
- ৬। 'The architecture of knowledge : Quantum mechanics, Computers and Consciousness', Subhash Kak, Manohar Publication, 2004.
- ৭। 'Prophet Facing, Postmodernism Critiques of Science and Hindu Nationalism in India'—Meera Nanda, Rutgers University Press, 2003.
- ৮। 'A CRITICAL STUDY OF THE WORK "VYMANIKA SHASTRA"' Scientific Opinion, H.S. MUKUNDA, S.M. DWESPANDE, H.R. NAGENDRA, A. PRABHU, AND S.P. GOVINDARAJU, Indian Institute of Science, Bangalore-560012 (Karnataka).
- ৯। 'Evaluating the claims of ancient Indian achievements in Science', Mayank Vahia, Current Science, Vol. 108, No. 12, 25 une 2015.
- ১০। 'Science, History and Mythology : Hindutva Discovery of Ancient India', D. Raghunandan, VIKALP, 5 February, 2015.

শিকাগো ধর্মমহাসভা, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বিবেকানন্দ : কয়েকটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন

কণিক চৌধুরী

প্রাক কথন :

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো ধর্ম মহাসভায় (১১ সেপ্টেম্বর - ২৭ সেপ্টেম্বর) বিবেকানন্দের সাফল্যের গল্প ফুলে ফেঁপে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে, তা প্রায় অপরিমাপযোগ্য। আর তারই সাথে ব্রাহ্মসমাজের নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে প্রায় খলনায়কের পর্যায়ে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এ কাজে ভক্তদের অবদানতো রয়েছে, আর রয়েছে 'নায়ক' বিবেকানন্দের। শিকাগো ধর্মসভায় বিবেকানন্দের অবস্থানটি কেমন ছিল? মার্কিন পত্র-পত্রিকায় তাঁর বক্তৃতার মূল্যায়ন কেমন ছিল? ভক্তবৃন্দ প্রচারিত সাফল্যের সাথে প্রকৃত সাফল্যের দূরত্ব কতটা? কেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে খলনায়কে পরিণত করার চেষ্টা হল? এইসব প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা জরুরি কারণ এর মধ্যে দিয়েই বোঝা যাবে প্রকৃত সত্যটা কী?

১

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরে একটি বিশ্বমেলা বা World Columbian Exposition-এর আয়োজন করা হয়। উপলক্ষ ছিল কলম্বাসের আমেরিকায় আগমনের চারশো বছর পূর্তি উদ্‌যাপন। ১৫ মে থেকে ২৮ অক্টোবর নানা প্রদর্শনী ছাড়াও ২০টি বিভিন্ন বিষয়ে সম্মেলনের অধিবেশন বসে। নারী প্রগতি, সাধারণ সংবাদপত্র, গুণ্য ও অস্ত্রোপচার, বাণিজ্য ও অর্থনীতি, সংগীত, সরকার ও আইন সংস্কার ইত্যাদি ছিল সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়। বিশ্বমেলায় একটি ক্ষুদ্র অংশ ছিল এই ধর্ম মহাসভা। শিকাগোর বিখ্যাত আইনজ্ঞ চার্লস ক্যারল বনির মাধ্যমে প্রথম এই ধর্মসভার কথা আসে। বনির সভাপতিত্বেই তৈরি হয়, 'World's Congress Auxiliary of the Columbian Exposition'। এই কমিটির অধীনে এই ধর্ম মহাসভার ব্যবস্থাপনার জন্য আরও একটি কমিটি তৈরি হয়—'General Committee of the Congress

কণিক চৌধুরী

Auxiliary on Religious Congresses'। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন রেভারেন্ড জন হেনরি ব্যারোজ। ধর্মমহাসভা সম্পর্কে বৃহত্তম রিপোর্টটি সম্পাদিত হয়েছিল জন হেনরি ব্যারোজ কর্তৃক। এছাড়াও J. W. Hanson, L. P. Mercer, J. L. Jones ও G. S. Goodspeed লিখিত আরও চারটি গুরুত্বপূর্ণ বই থেকে শিকাগো ধর্মমহাসভার বিবরণ পাওয়া যায়। দুঃখের কথা হল ভারতে এই বইগুলি তেমনভাবে প্রচারিত হয়নি। এটা না হওয়ায় বিবেকানন্দের পক্ষে ভালোই হয়েছে। কারণ তাতে করে বিবেকানন্দের ও বিবেকানন্দভক্তদের অসত্য প্রচারে সুবিধা হয়েছে।

ধর্মমহাসভার প্রধান বক্তৃতাগুলি কলম্বাস হলে অনুষ্ঠিত হত। এই হলে আসন সংখ্যা ছিল ৩০০০। অতিরিক্ত ভিড় হলে সর্বাধিক ৪০০০ শ্রোতা এই হলে ঠেসেঠেসে দাঁড়াতে পারতেন। এরই পাশাপাশি ধর্মসভার শাখা মিটিংগুলি হল ছোট ছোট হলঘরে। সেগুলির আসনসংখ্যা ছিল ১০০ থেকে ৩০০ জন। বিবেকানন্দ ১১ সেপ্টেম্বর, বিকালে কলম্বাস হলে প্রথম বক্তৃতা দেন। যেটা তাঁর ভক্তবৃন্দ ফলাও করে প্রচার করে এবং এটাই সেই শিকাগো বক্তৃতা, যার দ্বারা তিনি বিশ্বজয় করেছিলেন। ভক্তবৃন্দের অতিশয়োক্তি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, তাদের এটা বলতে বাধেনি: পাঁচ মিনিটের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবী বিবেকানন্দের পদানত হল। (বসু, প্রথমদ্ব্যর্থ ২০১১:১৩১৯)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিষ্য, নিখিলানন্দ, গঙ্গীরানন্দ এবং জঙ্গী প্রচারক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাদের লেখায় বিষয়টি আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখিয়েছেন এবং পাঠকদের সামনে অবিমিশ্র অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। ঘটনা হল এঁরা কেউই যুক্তিবাদী মন নিয়ে বিবেকানন্দ-চর্চা করেননি। এদের চর্চার ভিত্তি ছিল একটা অন্ধ বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাস বিবেকানন্দের প্রতি। তাঁদের যদি জিজ্ঞাসা মন থাকতো তাহলে দেখতে পেতেন বিবেকানন্দ আত্মপ্রচার পেতে কীভাবে গুরুভাইদের প্রতি লেখা চিঠিতে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করেছেন। ভক্তবৃন্দ বিবেকানন্দের সেই তথ্যগুলিকে নির্বিধায় সত্য বলে গ্রহণ করে এবং সেগুলিকে যতটা সম্ভব ফুলিয়ে ফাঁকিয়ে প্রচার করেছেন।

বিবেকানন্দ নিজেই ছিলেন নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। শিকাগো ধর্মসভায় তাঁর বক্তৃতার বর্ণনা দিতে গিয়ে মাদ্রাজগামী ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমলকে একটি চিঠিতে

শিকাগো ধর্মমহাসভা, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বিবেকানন্দ : কয়েকটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন

(২ নভেম্বর, ১৮৯৩) বিবেকানন্দ লিখেছেন, “আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিল, আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এবং আরও দু-এক কথা বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি ‘আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ’ বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল যে, কানে যেন তালা ধরিয়া যায়। তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম; যখন আমার বলা শেষ হইল, তখন হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পরদিন সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেইদিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছিল; সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল।” (বিবেকানন্দ, ১৯৭৭:৯২-৯৩)।

মার্কিন সংবাদপত্রে তাঁকে প্রশংসা করে যে সব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে বিবেকানন্দ এই চিঠিতে লিখেছেন, “প্রায় সকল কাগজই আমাকে খুব প্রশংসা করিয়াছে। খুব গৌড়াদের পর্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে, ‘এই সুন্দরমুখ বৈদ্যুতিক শক্তিশালী অদ্ভুত বক্তাই মহাসভার শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন’ ইত্যাদি ইত্যাদি। এইটুকু জানিলেই তোমাদের যথেষ্ট হইবে যে, ইহার পূর্বে প্রাচ্যদেশীয় কোন ব্যক্তিই আমেরিকান সমাজের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই।” (পূর্বোক্ত)।

চিঠিতে তোলা এই দাবিগুলির সঠিকতা সম্পর্কে ভক্তরা কোন অনুসন্ধান চালাননি। যেহেতু বিবেকানন্দ বলেছেন তাই তাকে সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। ভক্তদের মধ্যে যিনি এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন তাকেই হেঁচট খেতে হয়েছে। যেমন বার্ক এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে যা খুঁজে পেয়েছেন তা বিবেকানন্দের দাবিকে মোটেই সমর্থন করে না।

প্রথমত, সর্বাধিক অভিনন্দন ও করতালি পেয়েছেন চীনের প্রতিনিধি পাও কুয়াং য়ু। ধর্মপাল ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও যথেষ্ট হাততালি পেয়েছিলেন। (Burke:2000:80)।

দ্বিতীয়ত, সেই দিন থেকে সমগ্র আমেরিকা বিবেকানন্দকে জানতে পারলো— এই দাবির সমর্থনেও বার্ক কোনও তথ্য উপস্থিত করতে পারেননি।

তৃতীয়ত, ১২ সেপ্টেম্বর-এ মার্কিন সংবাদপত্রে বিবেকানন্দ সম্পর্কে যে

কনিষ্ঠ চৌধুরী

প্রশংসা প্রকাশিত হয়, সেগুলি তাঁর বক্তব্যের বিষয় বা বক্তৃতার গুণমান নিয়ে নয়, তাঁর সৌন্দর্য ও পোশাকের প্রশংসা। (Burke:2000:1:86-87)।

চতুর্থত, বার্কের লেখাতেই পাই যে, সব পত্রিকাই যে বিবেকানন্দের পোশাক ও সুন্দর মুখের প্রশংসা করেছে তা নয়, অনেকে সমালোচনাও করেছে। (পূর্বোক্ত:৮৭)।

পঞ্চমত, চিঠিতে উল্লেখিত বিবেকানন্দের দাবি ছিল, ‘তাঁকেই সকলে ধর্মমহাসভার শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসেবে গ্রহণ করেছে’—বার্কের সংগৃহীত তথ্য কিন্তু তাকে মোটেই সমর্থন করেনি।

ষষ্ঠত, বিবেকানন্দ অপর একটি দাবি ছিল, প্রাচ্যদেশীয় কোনও ব্যক্তিই বিবেকানন্দের আগে মার্কিন সমাজের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এ দাবি অসত্য ও অনৈতিহাসিক। ধর্মমহাসভার ৭৫ বছর আগেই বৈদিক ধারণার রক্ষাকর্তা হিসেবে রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। (চক্রবর্তী, সূরথ। ২০১৩:৬৯)। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো ধর্মসভার অন্যতম সংগঠক ই. এল. রে'ফোর্ড কেশবচন্দ্র সেনের প্রশংসা ও মার্কিন সমাজের উপর তার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। (পূর্বোক্ত)। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাগ্মীতা ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করা হয় নটিংহাম ও মিডল্যা 'কান্ট্রিজ ডেলি এক্সপ্রেস (১৬ অক্টোবর, ১৮৭৪)। এই পত্রিকায় বলা হয়, “He [প্রতাপচন্দ্র মজুমদার] said as an oriental with delight and with pride he dwelt upon the fact that it was East that supplied to Europe its highest and noblest principles of spiritual and moral development (cheers) - India, stood to religion simple in her love simple in her aspirations (cheers) - from the land of the rising sun would once more come that light which should dispel which was destined to dispel the spiritual darkness of the world (cheers)...”। (পূর্বোক্ত : ৭০)। ১৮৮৩-তেও প্রতাপ মজুমদার প্রথমবার যখন আমেরিকা যান, তখনও তাঁর বক্তৃতা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংবাদপত্র উচ্চ প্রশংসা

শিকাগো ধর্মমহাসভা, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বিবেকানন্দ : কয়েকটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন

কণিক চৌধুরী

পাওয়া যায়। (পূর্বোক্ত)। রমেশচন্দ্র মজুমদার বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে মন্তব্য করেছেন, “But it is curious to note that the important daily papers of Chicago, such as the Chicago Daily Tribune, do not in the least convey and idea that Swamiji's speech was in any way unusual or produced oany tremendous effect.” (পূর্বোক্ত)।

২

বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতাদান ও তাঁর দাবিগুলির উপর ড. রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা চালিয়েছেন, এই সম্পর্কিত তাঁর প্রধান তিনটি গবেষণাগ্রন্থ হল —

১। মিথ্য মুক্ত বিবেকানন্দ. ২০০৭।

২। Swami Vivekananda in the West. 2012

৩। World's Parliament of Religious. 2011

এ প্রসঙ্গে আরও দুইজন গবেষকের নাম এখানে উল্লেখ করা দরকার, যাঁরা হলেন সুরথ চক্রবর্তী ও নরসিংহপ্রসাদ শীল। চক্রবর্তী, চট্টোপাধ্যায় ও শীল দেখিয়েছেন বিবেকানন্দ নিজের সম্পর্কে যে সব দাবি তুলেছেন সেগুলি একেবারেই মনগড়া। সেই সময় কোনও কাগজই বিবেকানন্দকে শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসেবে উল্লেখ করেনি বা তাঁকে সবচেয়ে জনপ্রিয় বক্তা হিসেবেও চিহ্নিত করেনি। বরং বৌদ্ধ প্রতিনিধি ধর্মপাল ও ব্রাহ্ম প্রতিনিধি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার জনপ্রিয়তা ও শ্রেষ্ঠত্বের দৌড়ে বিবেকানন্দের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন।

ড. চট্টোপাধ্যায় জন হেনরি ব্যারোজ-এর রিপোর্টে উল্লেখিত ধর্ম সম্মেলনে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের ছবিটিকে দেখাতে গিয়ে যে টেবিল-১-এর সাহায্য নিয়েছেন তার থেকে ধর্মপাল, প্রতাপ মজুমদার ও বিবেকানন্দের তুলনামূলক গুরুত্বটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

টেবিল-১

অংশগ্রহণকারীর নাম	ভাষণ সংখ্যা	রিপোর্টে আলোচিত পৃষ্ঠা সংখ্যা
ধর্মপাল	৬টি	২৩

৯০

প্রতাপ মজুমদার	৬টি	১৯
মণিলাল দ্বিবেদী	৬টি	২০.৫
জে. জে. মোদী	১টি	১৭
বিবেকানন্দ	৫টি	১৫

(Chattopadhyaya. 2011:40)

অন্যান্য বইগুলিতেও প্রায় একই ছবি পাওয়া যায়। ড. চট্টোপাধ্যায় হিউটন, হ্যানসন, মার্সার ও জোনসের বইগুলি অনুসরণ করে যে দ্বিতীয় টেবিলটি তৈরি করেছেন সেখান থেকে ধর্মপাল, মজুমদার ও বিবেকানন্দের তুলনায় অংশটি এখানে উল্লেখ করা হল —

টেবিল - ২

অংশগ্রহণকারী	হিউটন	হ্যানসন	মার্সার	জোনস
ধর্মপাল	১২ পৃষ্ঠা	১৩ পৃষ্ঠা	১৯ পৃষ্ঠা	৯ পৃষ্ঠা
মজুমদার	১২.৫ পৃষ্ঠা	১২ পৃষ্ঠা	১৩ পৃষ্ঠা	৬ পৃষ্ঠা
বিবেকানন্দ	১০ পৃষ্ঠা	১০ পৃষ্ঠা	১২ পৃষ্ঠা	৭ পৃষ্ঠা

(পূর্বোক্ত)

ড. চট্টোপাধ্যায় আরও দেখিয়েছেন যে, শিকাগোর এক নম্বর দৈনিক সংবাদপত্র শিকাগো ডেইলি ট্রিবিউন-এ ধর্মপাল, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বলবন্ত নাগরকর (অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি) বিবেকানন্দের তুলনায় অনেক বেশি জায়গা পেয়েছেন। ধর্মপাল - ৬৩০ লাইন, নাগরকর ৪২৮ লাইন, মজুমদার ৪১৪ লাইন আর বিবেকানন্দ ২০৬ লাইন। (চট্টোপাধ্যায় / ২০০৭:৮৯)।

শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ তাঁর সাফল্যকে যেভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ভক্ত-শিষ্য ও গুরুভাইদের কাছে প্রচার করেছিলেন তা প্রকাশ পেতে থাকে বা প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা তৈরি হয় তখনই যখন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কলকাতায় ফিরে আসেন। পরবর্তী অংশে এটাই আলোচনা করা হবে।

৩

১৮৯৪-এর ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাস অবধি বিবেকানন্দের সময়টা বোধহয়

৯১

অতিরিক্ত। প্রকৃতপক্ষে, আমেরিকার অবস্থা যতটা প্রতিফলিত তার থেকে তাকে বাড়িয়ে নিজের কাজকে আরও সৌরভময় করার জন্য থিওসোফিস্টদের সম্পর্কে তিনি এই ধরনের গল্প বানিয়েছিলেন।

গ. বিবেকানন্দ ও তাঁর ভক্তমণ্ডলী সবচেয়ে বেশি অভিযোগ করেছে বীর বিরুদ্ধে তিনি হলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। তাদের অভিযোগ হল, শিকাগো ধর্মগ্রন্থভাষ্য বিবেকানন্দের সাফল্যে ইরষান্বিত হয়ে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে আমেরিকায় ও ভারতে কুসংবাদ রটনা করেছে। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শিকাগো ধর্মগ্রন্থভাষ্যর অসঙ্গতিজনিত অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি। শিকাগো ধর্মগ্রন্থভাষ্যর 'উপদেশ' গম্ভীর সত্য ছাড়াও প্রতিনিধি নির্বাচন কমিটি ও প্রতিনিধিদের ভাষণবলির উৎকর্ষ বিচার সমিতির সদস্য হিসেবেও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি প্রতিনিধি নির্বাচনী সভার বিশেষ অধিবেশনে বিবেকানন্দকে 'হিন্দু সন্ন্যাসীদের' প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করার সুপারিশ করেছিলেন। (চক্রবর্তী, সূর্য। ২০১৩:৭৮)। এই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকেই বিবেকানন্দ 'ও তাঁর ভক্তবৃন্দ চান্দমারি বানিয়েছেন। অভিযোগ করতে গিয়ে বিবেকানন্দ ঠিক কী কী বলেছেন তা দেখে নেওয়া যাক প্রথমে।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ প্রথম অভিযোগ করেছেন মার্চ, ১৮৯৪-এ। মেরী হেলকে লেখা ১৮ মার্চ-এর চিঠিতে 'বিবেকানন্দের তোলা অভিযোগটি হল, "মজুমদার কলকাতায় ফিরে গেছে এবং সেখানে বলে বেড়াচ্ছে যে, যত ধরনের পাপকার্য হয় বিবেকানন্দ তা আমেরিকায় করছে। বিশেষ করে সন্তীর্থনাত্মক (uncheatity) মতো কাজও।" (Burke. 2006:2:84)। ওই চিঠিতে তিনি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সম্পর্কে আরও লিখেছেন, "এই হল তোমাদের আমেরিকার 'বিশ্বব্যবহার আধ্যাত্মিক মানুষ'!!... সে [মজুমদার] কাজে যে, আমেরিকার মেয়েদের সঙ্গে আমি পশুবাং অপবিত্র জীবনযাপন করছি!! (Burke. 2006:2:84)। তিনি মজুমদারকে ককমবাজ ও অধঃপতিত বলেও চিহ্নিত করেছেন এই চিঠিতে।

আমেরিকাবাসী মেরী হেলকে যখন ১৮ মার্চের চিঠিতে বিবেকানন্দ জানাচ্ছেন

১৩ ৪ ১৯৯৪

শিকাগো ধর্মগ্রন্থভাষ্য, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বিবেকানন্দ : কয়েকটি অসঙ্গতির প্রশ্ন ডালো যায়নি। তাকে বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছিল। মেরী বার্ক বিবেকানন্দের শত্রুদের তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন—ক. খ্রিস্টান মিশনারিদের দল; খ. থিওসোফিস্টদের এবং গ. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ব্রাহ্ম সমাজ। (Burke. 2006:2:82)।

ক. আমেরিকায় প্রাক-শিকাগো পর্বে তিনি যাদের কাছে আশ্রয়, খাদ্য ও সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন খ্রিস্টান। শিকাগোর ধর্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দ বক্তৃতা দানের যে সুযোগ পেয়েছিলেন তার পিছনেও আমেরিকার খ্রিস্টানদের ভূমিকাই প্রধান ছিল। এখানে এটাও বলা দরকার যে, ধর্ম সম্মেলনের খ্রিস্টান আয়োজকগণ যে বার্তা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, সেখানে তাদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও সমন্বয়ের ধারণাই প্রচারিত হয়েছিল। খ্রিস্টান মিশনারি ও মার্কিন পত্রিকাগুলি তাঁর প্রতি যথেষ্ট ঐর্ষ্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়েছিল। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্ম ও মিশনারিদের বিরুদ্ধে তিনি ধর্ম সম্মেলন পরবর্তী পর্বে যেভাবে বিতর্কপূর্ণ করতে থাকেন, যা তাদের ঐর্ষ্যচাপিত ঘটায়। এবং তারাও অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ওঠে।

খ. মেরী বার্কের মতে, থিওসোফিস্টরা বিবেকানন্দের গভীর ক্ষতি করেছিল। এঁরা শাক্তি খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পদে পদে বিবেকানন্দের কাজ বাধা সৃষ্টি করেছিল। লক্ষ্য করার বিষয় হল বিবেকানন্দ আমেরিকায় থাকাকালীন এদের ক্ষতিকর ভূমিকা সম্পর্কে কোনও কথাই বলেননি। কিন্তু ভারতে ফিরে এসে থিওসোফিস্টদের সম্পর্কে তীব্র নিদানন্দ শুরু করে দেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের ডিসেম্বর মাসে 'আমার সমরনীতি' নামে একটি বক্তৃতা তিনি বলেন, 'যে শত্রুই আমি হই, সেখানেই এই থিওসোফিস্টরা আমাকে দাবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।' (বিবেকানন্দ, ২০১২:৫:৭৪)। এ অভিযোগ কতটা সত্য তা নিয়ে সন্দেহ করাই যেতে পারে। কারণ মহাত্মা বসু কেউই থিওসোফিস্টদের এই ধরনের জীবনীকর গভীরানন্দ বা প্রমথনাথ বসু কেউই থিওসোফিস্টদের এই ধরনের বিবেকানন্দ বিরোধী কাজের কোনও প্রমাণ ছাড়ির করেননি। এঁরা প্রত্যেকেই চোখ কান যুগে বিবেকানন্দের কথাতে সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। থিওসোফিস্টদের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের এই অভিযোগ ছিল তাঁর আমেরিকায় সাফল্যের মত

১২ ৪ ১৯৯৪

যে প্রতাপ মজুমদার কলকাতায় তাঁর (বিবেকানন্দ) বিরুদ্ধে বৃৎসা করছে, ঠিক তারপরের দিনেই অর্থাৎ ১৯ মার্চ কলকাতাবাসী রামকৃষ্ণনন্দকে লিখেছেন আমেরিকায় মজুমদারের ‘কীতি কাহিনী’। “প্রভুর ইচ্ছায় মজুমদার [প্রতাপচন্দ্র] মশায়ের সঙ্গে এখানে দেখা। প্রথমে বড়ই প্রীতি, পরে যখন চিকাগো সুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙে পড়তে লাগলো তখন মজুমদার ভায়ার মনে আগুন জ্বলল। ... দাদা, আমি দেখে শুনে অবাক! ... মজুমদার পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়নের পাদ্রীদের কাছে আমার যথেষ্ট নিন্দা করে, ‘ও কেউ নয়, ঠক্ জোচ্চর; আমি এখানে এসে সন্ন্যাসীর ভান করছি। এইভাবে সে আমার বিরুদ্ধে তাদের মনকে বিরূপ করে তোলে। ধর্মমহাসভার সভাপতি ব্যারোজের মনকে এমনভাবে বিরূপ করে দেয় যে, তিনি আমার সাথে কথা বলার সময়ও সৌজন্য দেখান না। তাদের গ্রন্থ ও পুস্তিকা সমূহে তারা আমাকে তুচ্ছতামূল্য করে।” (Burke. 2006:2:83-84)।

৯ এপ্রিল, ১৮৯৪-এ মাদ্রাজের শিষ্য আলাসিঙ্গাকে তিনি চিঠিতে লেখেন, “...গোঁড়া পাদ্রীরা আমার বিপক্ষে, আর তাঁরা আমার সঙ্গে সোজা রাস্তায় সহজে পেরে উঠবেন না দেখে আমাকে গালমন্দ নিন্দাবাদ করতে আরম্ভ করেছেন, আর ‘ম’ বাবু [প্রতাপচন্দ্র মজুমদার] তাঁদের সাহায্য করেছেন। তিনি নিশ্চয় হিংসায় পাগল হয়ে গেছেন। তিনি তাঁদের বলেছেন, আমি একটা ভয়ানক জোচ্চর ও বদমাশ, আবার কলকাতায় গিয়ে সেখানকার লোকদের বলেছেন, আমি ঘোর পাবে মগ্ন, বিশেষত আমি ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছি!!!” (বিবেকানন্দ। ১৯৭৭ : ১২৭)। কলকাতায় মজুমদারের ‘অপকীর্তি’ (?)—র কথা জানিয়ে ইসাবেল ম্যাককিন্ডলিকে বিবেকানন্দ লেখেন, “... কলকাতায় মজুমদার যেমন রটাচ্ছে তেমনিভাবে জঘন্য নোংরা জীবন যাপন করছে; এ সংবাদ তাঁকে [বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী] একেবারে শেষ করে দেবে।” (পূর্বোক্ত : ১৩০)। “হতভাগ্য মজুমদার! ঈর্ষায় জ্বলে মিথ্যা কথা বলে নিজের উদ্দেশ্যেরই ক্ষতি করলে। প্রভু জানেন, আমি আত্ম সমর্থনের কিছুমাত্র চেষ্টা করিনি।” (পূর্বোক্ত : ১৩০)। মে মাসের একটি চিঠিতে অধ্যাপক রাইটকে তিনি নিজের কষ্টের কথা জানিয়েছেন : “... আমি দারুণ আঘাত পেয়েছি মজুমদারের ঈর্ষার জ্বালা দেখে।” (পূর্বোক্ত : ১৩৪)। ব্রহ্মানন্দ

[রাখাল] কে একটি চিঠিতে (২০ ডিসেম্বর, ১৮৯৬) বিবেকানন্দ প্রতাপ মজুমদার সম্পর্কে যে সব বিশেষণ ব্যবহার করেছেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য। যথা— পাগল, বুড়ো বেকুব, Burking (ঘেউ ঘেউ) ইত্যাদি।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, এইসব চিঠিতে কাকে কী লিখেছেন। বিষয়গুলি পরপর সাজানো থাক—

ক. ১৮ মার্চ, ১৮৯৪-এর চিঠিতে মেরী হেলকে বিবেকানন্দ জানিয়েছেন, যে প্রতাপ মজুমদার কলকাতাতে বিবেকানন্দের নামে খারাপ কথা বলে বেড়াচ্ছে। মেরী হেলের পক্ষে বিবেকানন্দের এই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব ছিল না। কারণ তিনি একজন আমেরিকাবাসী এবং কলকাতায় তাঁর এমন কোনও যোগাযোগ নেই, যার মাধ্যমে মজুমদার ঠিক কী বলেছে তা জানা সম্ভব। আমেরিকায় মজুমদার কী করেছে সে সম্পর্কে তিনি হেলকে কিছুই লেখেননি। কারণ সে সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার সুযোগ মেরী হেলের যথেষ্ট ছিল।

খ. ১৯ মার্চের চিঠিতে রামকৃষ্ণনন্দের কাছে মজুমদার সম্পর্কে যে তথ্য বিবেকানন্দ দিয়েছেন, সেগুলি ঠিক না ভুল তা বোঝা রামকৃষ্ণনন্দের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমেরিকায় তাঁর কোনও যোগাযোগই নেই। আবার যে অভিযোগগুলি বিবেকানন্দ মেরী হেলের চিঠিতে লিখেছেন সেগুলি কিন্তু রামকৃষ্ণনন্দকে লেখেননি। যদি লিখতেন তাহলে রামকৃষ্ণনন্দের পক্ষে তা যাচাই করার সুযোগ ছিল।

গ. মাদ্রাজবাসী শিষ্য আলাসিঙ্গাকে লেখা চিঠিতে (৯.৪.১৮৮৪) কিন্তু আমেরিকা ও কলকাতা এই দুই স্থানেই মজুমদার যে ‘অপপ্রচার’ চালাচ্ছেন—সে সম্পর্কে লিখেছেন। লক্ষ্যণীয়, মাদ্রাজ নিবাসী আলাসিঙ্গার পক্ষে এইসব তথ্যের সঠিকতা বা বৈধতা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

এই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সাথে বিবেকানন্দের সম্পর্ক একসময় খুবই ভালো ছিল। তার প্রমাণ মেলে বিবেকানন্দের চিঠিতে। শিকাগো ধর্মমহাসভা শুরু হয়েছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩। শেষ হয় ২৭ সেপ্টেম্বর। এর ঠিক পাঁচদিন বাদে ২

অক্টোবর অধ্যাপক রাইটকে বিবেকানন্দ লিখেছেন, “আহা, আমি কী ভাবেই না চেয়েছি, আপনি এখানে এসে ভারতের কয়েকজন মধুর চরিত্র ব্যক্তিকে দেখে যান—কোমল প্রাণ বৌদ্ধ ধর্মপাল, বাখী মজুমদারকে; অনুভব করবেন, সেই সুদূর দরিত্রভারতেও এমন মানুষ আছে, যাদের হৃদয় এই বিশাল শক্তিশালী দেশের মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে সমতালে স্পন্দিত হয়।” (পত্রাবলী, ১৯৭৭:৮৮-৮৯)। নভেম্বর ৯-তেও মজুমদারের সাথে তাঁর সম্পর্ক ভালোই ছিল। ২ নভেম্বর, ১৮৯৩ আলাসিন্সকে লেখা একটি চিঠিতে পাই: “মজুমদারের সহিত আমার পূর্ব পরিচয় ছিল...”। (পূর্বোক্ত : ৯২)। এই চিঠিতে বিবেকানন্দ আরও জানিয়েছেন যে, ধর্মসভায় মজুমদার বেশ ভালো বক্তৃতা দিয়েছেন এবং খুব হাততালিও পেয়েছেন। (পূর্বোক্ত)।

তাহলে হঠাৎ কী এমন হল, যাতে তিনি ‘মধুর-চরিত্র বাখী মজুমদার’ থেকে ‘বুড়ো ভেঁকু’ ‘পাগল’ ‘ঈর্ষাকাতর’ মজুমদারে পরিণত হলেন? বিবেকানন্দ কেন মার্চ, ১৮৯৪ থেকে মজুমদারের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ আনতে শুরু করলেন? এই প্রশ্নে কয়েকটি তথ্য প্রমাণগুলির উত্তরের উপর আলোকপাত করতে পারে।

১. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শিকাগো ধর্মসভার ‘উপদেষ্টা’ সমিতির সদস্য জুড়াও প্রতিনিধি নির্বাচন কমিটি ও প্রতিনিধিদের ভাষণাবলির উৎকর্ষ বিচার সমিতির সদস্য ছিলেন। অনিমগ্নিত বিবেকানন্দ যখন ধর্মমহাসভায় যোগদান করার জন্য হাজির হয়েছিলেন তখন প্রতিনিধি নির্বাচনী সভার বিশেষ অধিবেশনে প্রতাপচন্দ্রই বিবেকানন্দকে ‘হিন্দু সন্ন্যাসীদের’ প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করার সুপারিশ করেছিলেন। অধ্যাপক রাইট ও মিসেস হেল শিকাগো ধর্মসভার কর্তাব্যক্তিদের চিনতেন। মিসেস হেলই বিবেকানন্দকে প্রথম দিন ধর্মসভার অফিসে নিয়ে গিয়েছিলেন। (চক্রবর্তী, সূরথ। ২০১৩:৭৮)। অর্থাৎ অধ্যাপক রাইট ও মিসেস হেল জানতেন মজুমদার বিবেকানন্দের কতটা উপকার করেছিলেন। ফলতঃ অধ্যাপক রাইটকে লেখা চিঠিতে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সম্পর্কে বিবেকানন্দকে প্রশংসা করতেই দেখা যায়। ২ অক্টোবর, ১৮৯৩-এর চিঠিতে মজুমদারকে বাখী ও মধুর চরিত্র সম্পন্ন হৃদয়বান ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেই থামেননি, মে মাসের ১৮৯৪-এর লেখা চিঠিতে দেখা যায় মজুমদার হলেন, “...উত্তম ও মহান ব্যক্তি,

সারা জীবন অপরের মঙ্গল করতে চেয়েছেন।” (বিবেকানন্দ। ১৯৭৭:১৩৪)। ১৯ জুলাই, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে মিসেস হেলকে লেখা বিবেকানন্দের চিঠিতে ১ মজুমদার সম্পর্কে একই ধরনের প্রশংসা দেখতে পাওয়া যায়: “আমি ‘ইন্টিরিয়ার’ [একটি গৌড়া শিকাগো সংবাদপত্র] পেয়েছি এবং তাতে আমার বন্ধু [প্রতাপচন্দ্র] মজুমদারের বই-এর উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে দেখে আমি খুবই খুশি হয়েছি। মজুমদার একজন মহান এবং ভালো লোক এবং তাঁর সহযোগী মানুষদের জন্য অনেক কিছু করেছেন।” (Burke, 2006:2:129) অর্থাৎ প্রায় একই সময়ে বিশেষ বিশেষ লোকের কাছে বিবেকানন্দ মজুমদারের প্রশংসা বা নিন্দা করেছেন।

২. মূলতঃ মার্চ মাস (১৮৯৪) থেকেই বিবেকানন্দ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে গালমন্দ শুরু করেন। কিন্তু তার আগে করলেন না কেন? কারণ তার বহু আগে থেকেই তো মজুমদার বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার শুরু করেছিল (বিবেকানন্দের চিঠিতে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী)।

ঘটনা প্রবাহের দিকে লক্ষ্য রাখা যাক। শিকাগো ধর্মমহাসভা শেষ হওয়ার পরের দিন অর্থাৎ ২৮ সেপ্টেম্বর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শিকাগো থেকে ইন্ডিয়ানাপলিস বা বাফেলো হয়ে বস্টনে চলে যান। এসময়ে তাঁকে বিখ্যাত ‘লাগুয়েল বক্তৃতামালা’ জুড়াও প্রায় দুশো সংকিপ্ত ভাষণ দিতে হয়। সারাটা দিন তিনি পড়াশুনা, ভাষণের পরেই লেখা ও বক্তৃতাতেই ব্যস্ত থাকতেন। ৯ ডিসেম্বর ১৮৯৩ তিনি ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করেন। (চক্রবর্তী, সূরথ। ২০১৩: ৬৬-৬৭)। জানুয়ারি, ১৮৯৪-এ তিনি ভারতে ফিরে আসেন। কলকাতায় ফিরে এসে ধর্মসভার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা তিনি বিভিন্ন স্থানে বলেন। সমস্যাটি হল প্রতাপ মজুমদারের বর্ণনার সাথে বিবেকানন্দের বর্ণনার মিল ছিল না। কারণ বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভায় নিজের সাফল্যকে অনেক বাড়িয়ে বলেছিলেন এবং এত বেশি নিজের প্রশংসা করেছিলেন যার সাথে সত্যতার কোনও মিল ছিল না। যেমন আলাসিন্সকে একটি চিঠিতে (২ নভেম্বর, ১৮৯৩) নিজের বাড়িবাড়ি রকমের প্রশংসা করে বিবেকানন্দ লিখেছেন, “পরদিন [১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩] সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাটি সেই দিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছিল; সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। ... প্রায়

শিকাগো ধর্মমহাসভা, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বিবেকানন্দ : কয়েকটি অন্বৃত্তিকর প্রশ্ন

সবল কাগজেই আমাকে খুব প্রশংসা করিয়াছে। খুব গৌড়াদের পর্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে, 'এই সুন্দর মুখ বৈদ্যুতিক শক্তিশালী অদ্ভুত বস্তুই মহাসভার শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছে' ইত্যাদি ইত্যাদি।" (বিবেকানন্দ পত্রাবলী, ১৯৭৭:৯৩)। এইরকম আরও বহু চিঠিতেই তিনি নিজের ঢাক নিজেই পিটিয়েছেন। (বিবেকানন্দ পত্রাবলী, ১৯৭৭:৯৭, ১০৪, ১১৪, ১৬২)।

ঘটনা হল শিকাগো ধর্মমহাসভা (১১ সেপ্টেম্বর - ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩)-র প্রথম দিনের অধিবেশনের পর সেখানকার কোনও প্রধান পত্রিকাতেই বিবেকানন্দের বক্তৃতাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল তা লেখা নেই। শিকাগো ও নিউইয়র্কের প্রধান পত্রিকাগুলি যেমন—শিকাগো ট্রিবিউন, শিকাগো হেরাল্ড, শিকাগো ইন্টারগ্যান, শিকাগো রেকর্ডস, শিকাগো টাইমস, শিকাগো ডেইলি নিউজ, নিউইয়র্ক হেরাল্ড, নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন ইত্যাদিতে ১২-২৮ সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার কথা থাকলেও বিবেকানন্দের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে। এ প্রসঙ্গে ড. রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও মেরী লুই বার্কের গবেষণা উল্লেখযোগ্য। বার্ক বিবেকানন্দ ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিবেকানন্দের এই অতিরঞ্জিত বক্তব্যের সমর্থনে কোনও সংবাদপত্রের উল্লেখ করতে পারেননি।

৩. বিবেকানন্দ যখন দেখলেন যে মজুমদার যা বলে বেড়াচ্ছে তাঁর ঢাক পেটানোর ভালের সাথে সাথে তো মিলছে না এবং প্রকৃত সত্য প্রকাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তিনি পরিকল্পনামাফিক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বিরুদ্ধে এই সব কথা বলতে শুরু করেন। সম্ভবত মার্চ মাসের (১৮৯৪) দ্বিতীয় সপ্তাহতেই তিনি কলকাতার গুরুভাইদের কাছ থেকে জানতে পারেন যে মজুমদার জানুয়ারি মাসের শেষে বা ফেব্রুয়ারিতে শিকাগো মহাসভার সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে তা বলার সময় যে বস্তুনিষ্ঠ থেকেছেন এবং বিবেকানন্দ সম্পর্কে অতিরঞ্জিত কিছু বলেননি। যা বিবেকানন্দকে ক্ষুব্ধ করে এবং মজুমদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে শুরু করেন।

৪. যে অভিযোগগুলি মজুমদার সম্পর্কে বিবেকানন্দ তুলেছিলেন, তার কোনও প্রমাণ বিবেকানন্দ কোথাও উপস্থিত করেননি। এবং এমনভাবে অভিযোগগুলি এমন ব্যক্তির কাছে করেছেন যাদের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও অভিযোগগুলির

৯৮

কলিঙ্গ চৌধুরী

সঠিকতা / বৈধতা যাচাই করা সম্ভব ছিল না। ১২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সম্পর্কে এই মিথ্যা অভিযোগগুলি করে আসা হচ্ছে অথচ কোথাও কোনও লিখিত প্রমাণ অর্থাৎ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের লেখা কোনও রচনা বা পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও সাক্ষাৎকারের মত সাক্ষ প্রমাণ হাজির করা হয়নি। করা হলে সত্যি যদি প্রতাপ মজুমদার এমন ধরনের অভিযোগ বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে কোনও পত্রিকায় করতেন, তাহলে মিশনারীরা কি তার থেকে উদ্ধৃতি দিত না। আসলে প্রতাপ মজুমদারের মতো বিদ্বান, জ্ঞানী মানুষ এই ধরনের কোনও আপত্তিকর অভিযোগই তোলেননি। সমস্তটাই বিবেকানন্দের মনগড়া। যার পিছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করেছিল তা হল প্রতাপ মজুমদারকে হতমান করা, মিথ্যাবাদী, কুৎসা রটনাকারী হিসেবে প্রচার করা যাতে করে, গুরুভাইরা মজুমদারের শিকাগো বর্ণনাকে অবিশ্বাস করে।

গ্রন্থপঞ্জি :

গব্বীরানন্দ, স্বামী। ২০১২।

চক্রবর্তী, সুরথ। ২০১৩।

চট্টোপাধ্যায়, রাজাগোপাল। ২০০৭।

বসু, প্রমথনাথ। ২০১২।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। ২০১১।

বার্ক, মেরি লুইট। ২০১১।

বিবেকানন্দ, স্বামী। ১৯৭৭।

বিবেকানন্দ, স্বামী। ২০১২।

মুগুনায়ক বিবেকানন্দ। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়। তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

"শিকাগো ধর্মমহাসভা প্রসঙ্গে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য"। মজুমদার, রজনীশঙ্কর (সম্পাদিত)। ২০১৩। স্বামী বিবেকানন্দ — সার্বশতাব্দীর আলোয়। কলকাতা : দেব পাবলিশিং।

মিথুনকৃত বিবেকানন্দ। সন্টলেক : রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ। খণ্ড-১। কলকাতা : যতন বুক হাউস।

পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ (মতন তথ্যাবলী)। খণ্ড-১। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়।

পত্রাবলী। কলিকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়। বাণী ও রচনা। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়। দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ। ৭৩-৩, ৬, ৭, ৮ - ২০১১ এবং ৭৩-১, ২, ৪, ৫, ৯, ১০-২০১২।

৯৯

শিকাগো ধর্মমহাসভা, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বিবেকানন্দ : কয়েকটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন

- Burke, Marie Louise. 2000. *Swami Vivekananda in the West : New Discoveries*. Vol - 1. Calcutta : Advaita Ashrama. Vol : 2 - 2006.
- Bassows, Jhon Henry. (ed.) 1893. *The World's Parliament of Religion*. (Two vols). Chicago : The Parliament Publishing Company.
- Basu, Sankari Prasad & Ghosh, Sunil Bihari. 1969. *Vivekananda in Indian Newspapers (1893-1902)*. Calcutta : Dinesh Chandra Basu, Basu Bhattacharyya and Co. (Pvt.) Ltd.
- Chattopadhyaya, Rajagopal. 2011. *World's Parliament of Religions, 1893*. Salt Lake : Author.
- Chattopadhyaya, Rajagopal. 2012. *Swami Vivekananda in the West*. Salt Lake : Author.
- Eastern and Western Disciples. 1997. *The Life of Swami Vivekananda*. Vol - 1. Calcutta : Advaita Ashrama.
- Goodspeed, G. S. 1895. *The World's First Parliament of Religions*. Chicago.
- Hanson, J.W. (ed.) 1894. *The world's Congresses of Religions at the World's Columbian Exposition*. Chicago : W. b. Conkey Company.
- Jones, Jenkin Loyed. 1894. *A Chorus of faith*. Chicago : The Unity Publishing Company.
- Mercer, Lewis P. (ed.) 1893. *Review of the World's Religions Congresses*. Chicago : Rand, McNally & Company.
- Nikhilananda, Swami. 2011. *Vivekananda - A Biography*. Kolkata : Advaita Ashrama.
- Sil, Narasingha P. 1997. *Swami Vivekananda : A Reassessment*. Cranbury : Associated University Press (USA).
- Vivekananda, Swami. 2012. *Complete Works*. Kolkata : Advaita Ashrama.

উন্নয়ন, বিভাজন ও জাতি : বাংলায় নমশূদ্র

আন্দোলন, ১৮৭২-১৯৪৭

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতিবিভাগ, শ্রেণী আর ক্ষমতার সম্পর্কের মধ্যে প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার সনাতন হিন্দু সমাজে যে ভারসাম্য ছিল (রায়, ১৯৮০, পৃ: ৩২৪-২৫; সান্যাল, ১৯৮১, পৃ: ১৯-২৬), ইংরেজ ঔপনিবেশিক সরকার নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধা তৈরি করতে থাকলে তা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। সাধারণ ধারণা এই যে ভূমি বিক্রয় পণ্যে পরিণত হলে, প্রথাবদ্ধ উৎপাদন সম্পর্কের জায়গা নেয় চুক্তিবদ্ধতা। নতুন পেশার সৃষ্টি হল, যার ভিত্তি ব্যক্তিগত যোগ্যতা। যে সব বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যিকর্ম এতদিন আঞ্চলিকতার সীমায় আটকে ছিল, তারা এবার বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানির সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে বাণিজ্য করে অবস্থান উন্নতি ঘটানোর সুযোগ পেল। আর তা বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রাচুর্যের বণ্টনকেও বিষমীকৃত করে। এরই পরিণতি সামাজিক গতিশীলতার বৃদ্ধিতে সমাজে ক্ষমতার সম্পর্ক ভেঙে পড়ার উপক্রম। কিন্তু যদি আদমসুমারির পেশা-সংক্রান্ত তথ্যকে সমাজের কিছু সাধারণ পরিবর্তনের সূচক হিসেবে গ্রহণ করি, যদিও সামাজিক পরিবর্তনের নির্ভরযোগ্য ছবি এর থেকে আদৌ পাওয়া যায় না (কনলন, ১৯৮১), তাহলে আমরা দেখব যে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও (১৯০১-১৯৩১) এই সামাজিক গতিশীলতা ছিল অত্যন্ত সীমিত, সমাজের একেবারে নিচের তলা থেকে কেউ ওপরে উঠে আসছে এ ঘটনাও দুর্লভ।

জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ তখনও তাদের জাতিভিত্তিক পেশাতেই নিয়োজিত, অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে সীমিতভাবে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার শুরু তা গোষ্ঠীসাপেক্ষে স্বতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করেছে। অন্যভাবে দেখলে অর্থনীতি সমষ্টিগত উন্নয়নের গতি কখনো অর্জন করেনি বলেই একই জাতির মধ্যে তৈরি হয়েছে অন্য শ্রেণীরা। অর্থনীতির এই অসম সঞ্চালন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই ঘটনাটাই একদিকে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে— অন্যদিকে তা ঊনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের আরম্ভে নিম্নবর্ণের

জাতিগুলির সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কারণ হয়েই তার ওপর প্রভাব ফেলেছে।

বস্তুত এই সময় গোটা ভারতবর্ষে প্রতিটি জাতির মানুষ ধর্মীয় মর্যাদার দিক থেকে একই অবস্থানে থাকলেও, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে বিভাজিত হয়ে পড়েছিল। কিছু কিছু তথ্যভিত্তিক আলোচনায় একথা উল্লিখিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই বিভাজন প্রক্রিয়ার সঙ্গে এইসব জাতিগুলির সামাজিক জাগরণ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্কটি যে কী তা এখনও সম্যকভাবে বিস্তারিত হয়নি। এইসব আন্দোলনগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে হয় অর্থনৈতিক উন্নতি কিংবা সামাজিক উচ্চাশার কারণ দেখিয়ে। অথবা সামাজিক অত্যাচার এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতিফলন হিসেবে। এইসব আন্দোলনের মধ্যে প্রতিবাদের যে ধারাটি ছিল প্রথমেই ব্যাখ্যায় তা একেবারেই উপেক্ষিত। অন্যদিকে প্রতিবাদী দিকটিকেই খাঁরা বড় করে দেখেন তাঁরা দেখতে পান না যে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক আদর্শবাদের চাপে এইসব প্রতিবাদী নিম্নবর্গীয় মানুষগুলির কল্পনার জগত হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত সীমিত। আবার তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির প্রায়শই প্রতিপক্ষের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় প্রতিবাদও হত অনেকাংশে নিষ্ফল।

অন্যভাবে বলতে গেলে, এই দুই ধরনের ব্যাখ্যাই একটি মূল ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তা হল যে প্রতিটি জাতির মানুষেরা অন্তত চেতনার দিক দিয়ে এক এবং অভিন্ন ছিল। এই বিভেদহীন ‘সম্প্রদায়’-এর ধারণাটি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে, কারণ এইসব আন্দোলনগুলির মধ্যে আমরা শুধুমাত্র সামাজিক উচ্চাশা অথবা শুধুমাত্র প্রতিবাদ দেখি না। বরং এই দুটি ধারারই সম্মেলন দেখি যে কেন বিশেষ আন্দোলনের মধ্যে, এবং তা প্রতিফলিত হয় একই জাতের অন্তর্গত বিভিন্ন স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর চেতনায়। একমাত্র এই ধরনের সম্মিলন ঘটলেই ‘সম্প্রদায়’ গঠন এবং তার সামাজিক সীমারেখাগুলির চিহ্নিতকরণ সম্ভবপর হত। এটি একটি সর্বৈব জটিল প্রক্রিয়া, — এইসব বিভিন্ন সম্প্রদায় অন্তর্বর্তী ভিন্নতা সত্ত্বেও ধর্মীয় বৃত্তে তাদের মর্যাদাহীনতাকেই নিজেদের সমতার ভূমি হিসেবে চিহ্নিত করে ‘সমষ্টিগত চেতনা’র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেয়। আর এই ‘সমষ্টিগত চেতনা’-কে রূপায়িত

করতেই ‘সম্প্রদায়’—নিজ গোষ্ঠীর অতীত উদ্ভাবন করে, দাতা ও গুরুর কল্পনা করে তা নিয়ে গল্প-গাথা রচনা করে, ব্যবহৃত হতে থাকে ভারিত বা ভাষাভীত প্রতীক। আসলে আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধানে এইসব অবদমিত জাতির প্রথম কর্তব্য ছিল প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সম্মানের বেড়াগুলিকে ভাঙা। ফলত, সম্মানিত সামাজিক অবস্থানের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবর্গের সঙ্গে সহিস বা অহিস সংঘাত প্রায় বাধ্যতামূলকভাবেই ঘটে যেত। আর এইসব সংঘাতের মধ্যে দিয়েই ‘সম্প্রদায়’ সমাজের অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত হতে থাকে।

কিন্তু এইসব সংঘাতের দৃষ্টান্তের উপরেই বেশি জোর দিলে ‘সম্প্রদায়’গুলির ভেঙে পড়া, বা তাদের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়া বা আপোস-বোঝাপড়ার অনাটনীয় মুহূর্ত থেকে মনোযোগ সরে আসতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে, কোনো একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে একটি জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীর নানা ধরনের চেতনা তাদের উচ্চাশা অথবা অভিযোগ একই ধারায় এসে মিলে গেলেও অন্য কোনো অবস্থায় আবার যে পৃথকীকরণ ঘটবে না অথবা ‘সম্প্রদায়’ ভেঙে পড়বে না তার কোনো কথা নেই। সেই জাতির লোকজনের উপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধরনের প্রভাবের ফলে তা ঘটতে পারে, যে কারণে সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব আর তাদের আদর্শবাদ সবার ওপরে চাপিয়ে দিতে পারে না। আবার এটা ঘটতে পারে অন্য কোনো ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রক্রিয়ার ফলে, যে কারণে সামাজিক সীমারেখাগুলি নতুনভাবে চিহ্নিত হয় এবং একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আত্মচেতনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা যদি কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তের দিকে তাকাই তাহলে হয়ত কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে এক এবং অভিন্ন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যদি কোনো জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়, অথবা তাদের উপনিবেশিক যুগের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সন্মুখীন হতে দেখা যায়, তাহলেই একমাত্র সম্প্রদায় গঠনের উত্থান-পতনের সবদিকগুলি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। যে বিষয়টি বর্তমান প্রবন্ধে পরিষ্কার করে বলতে চাওয়া হয়েছে তা হল এই ধরনের কোনো আন্দোলনই, বিশেষ করে ১৮৭২ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে বাংলায় নমশূদ্র আন্দোলন, কখনওই এক ধারায় বয়ে

চলেনি। এই আন্দোলনের মধ্যে যা আমরা দেখি তা হল বিভিন্ন স্তরের চেতনা এবং বিভিন্ন ধরনের কার্যধারার সংমিশ্রণ।

সংখ্যার দিক থেকে নমশূদ্ররা ছিল পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে বড় হিন্দু জাতি, আর সমগ্র বঙ্গ প্রদেশে তাদের স্থান ছিল দ্বিতীয় (৯.৮ শতাংশ)। প্রধানত, পূর্ববঙ্গের ছ'টি জেলায়, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর আর খুলনা ছিল মুখ্য নমশূদ্র বসতি; ১৯০১ সালে নমশূদ্র জনসংখ্যার (১,৮৫২,৩৭১) ৭৫ শতাংশই বাস করত এই ক'টি জেলায়। আর এই ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি লোক বাস করত উত্তর-পশ্চিম বাখরগঞ্জ ও দক্ষিণ ফরিদপুরের জলা জায়গায় আর তার সংলগ্ন যশোর জেলার নড়াইল ও মাগুড়া মহকুমায় এবং খুলনা জেলার সদর ও বাগেরহাট মহকুমায়। সারা বাংলার নমশূদ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই বাস করত এই নির্দিষ্ট অঞ্চলটিতে, তাই সঙ্গত কারণেই এটিকে আমরা নমশূদ্র-প্রধান বসতি অঞ্চল বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান, যার প্রধান কারণ সম্ভবত ছিল তাদের কৌম ইতিহাস, সম্প্রদায় হিসেবে তাদের শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস ছিল। ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের ফলে এই অঞ্চলটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে, এদের আন্দোলনও ভেঙে পড়তে থাকে।

বাজলি হিন্দুদের মধ্যে নমশূদ্রের সামাজিক অবস্থান ছিল খুবই নিচের দিকে। এরা একসময় 'চভাল' নামে অভিহিত হত এবং প্রাচীন শাস্ত্রমতে চভালরা অস্পৃশ্য বলে পরিগণিত হত (ঝা, ১৯৮৬-৮৭, পৃ: ১-৩৬)। কিন্তু সঠিক অর্থে অস্পৃশ্যতা বাংলার সমাজে কখনই খুব বড় সমস্যা ছিল না। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর পুরাণে বাংলার চভালদের অন্তর্ভুক্ত এবং সংকরজাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সত্যি সত্যি তাদের অস্পৃশ্য বলে অবজ্ঞা করা হত কিনা আর কোনো ইঙ্গিত নেই। এমনকি ষোড়শ শতকের বাংলার সবচেয়ে গৌড়া শ্রুতিকার রঘুনন্দন-ও চভালদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক এবং পণ্ডিতোজ্ঞান এড়িয়ে চলার কথা বলেছেন কিন্তু তাঁদের স্পর্শ সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলতে হবে এমন কথা জোর দিয়ে বলেননি (চক্রবর্তী, ১৯৭০, পৃ: ৩৩, ২৫৬-৬১)। ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের মঙ্গ লকাব্যগুলিতে উল্লেখ আছে যে চভালরা গ্রাম বা নগরের মধ্যেই বাস করত। মনু যাদের অন্তর্বাসী বলে বর্ণনা করেছেন—অর্থাৎ যারা গ্রাম বা নগর সীমান্তের

গাইরে বাস করে—চভালরা মোটেই তা ছিল না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও বেশ কয়েকটি তথ্যানুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে বাংলায় তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিগুলি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কম যন্ত্রণা ভোগ করত। এই কারণেই হয়ত অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় নমশূদ্রের সামাজিক-আন্দোলনগুলিও ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর।

এতদসত্ত্বেও বাংলায় চভালজাতির লোকেরের নানা ধরনের সামাজিক অবিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে, আর এর ফলেই সুবিধাবাদী উচ্চবর্ণের লোকেরদের সঙ্গে এইসব মানুষের এক বিরাট দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। উচ্চবর্ণের মানুষ কাজে না হলেও মুখে সর্বদাই অস্পৃশ্যতার পক্ষপাতী ছিলেন, বিশেষত সামাজিক প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্যই (পালিত, ১৯১৫, পৃ: ২-৬) এই প্রচার তাঁরা চালাতেন। এই সামাজিক দূরত্ব আরও বেড়ে যেত এই সব অঞ্চলের বিশেষ শ্রেণী-কিন্যাসের জন্য। ১৯১১ সালে উপার্জনশীল নমশূদ্রের ৭৮ শতাংশ নির্ভর করত কৃষিকাজের ওপর। এই কৃষিজীবী মানুষদের মধ্যে মাত্র ১.১৫ শতাংশ নিজের খাজনা পেত; আর বাকিদের 'কৃষি-শ্রমিক', 'চারি' অথবা 'জনমজুর' ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে আদমসুমারির রিপোর্টগুলিতে। অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকেও জানা যায় এদের বেশির ভাগই ছিল প্রজাস্বত্বভোগী কৃষক, যাদের কারো দখলিস্বত্ব ছিল, কারোর ছিল না, আর বাকিরা ছিল ভাগচাষী বা বর্গাদার, ১৯২০-র দশকে যাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। কিন্তু তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই অঞ্চলে জমির ওপর একচেটিয়া দখলদারি ছিল হয় উচ্চজাতের বর্ণ হিন্দু অথবা সৈয়দ মুসলমানদের হাতে। ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম ডিভিশনে, যেখানে নমশূদ্ররা প্রধানত বাস করত, সেখানে 'খাজনাভোগী'দের ৮০-৮২ শতাংশ ছিল ওই দুই সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, আর মাত্র ৩.৭৮ শতাংশ ছিল নমশূদ্র। বাংলার কৃষি সমাজে সবচেয়ে বড় যে বিভেদ তা হল 'খাজনাভোগী' এবং 'খাজনা প্রদানকারী'দের মধ্যে, আর এই ক্ষেত্রে তা নিখুঁতভাবে মিলে গিয়েছিল জাতিভেদের সঙ্গে। এই বিভেদ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলত নানা ধরনের অত্যাচারের ফলে। তার মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ, বেআইনি কর আদায়, খাজনার বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি সহজ নগদ খাজনার বদলে উঁচু হারে

শস্য-খাজনা আদায় করা। কিন্তু এই অবস্থা থেকে এটাও বোঝা যায় যে, সম্প্রদায়টির মধ্যে সামাজিক পৃথকীভবন ঘটছিল, কারণ একটি ছোট গোষ্ঠী সামাজিক মর্যাদার সিঁড়ি বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠছিল, প্রধানত এই অঞ্চলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে যে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটছিল তার সুযোগ নিয়ে। এঁদের মধ্যেই কেউ কেউ মহাজনী ও অন্যান্য নানা ধরনের ছোট ব্যবসা শুরু করেন এবং পরে শিক্ষা এবং অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত হতে শুরু করেন। তবে যদি আদমসুমারির বৃদ্ধি-সংক্রান্ত পরিসংখ্যানকে আদৌ বিশ্বাস করা যায়, তবে ১৯১১ সালে এই বর্ধিত গোষ্ঠী গোটা নমশূদ্র জাতির ২ শতাংশেরও কম ছিলেন।

আমরা তাই সম্ভবত মনে করতে পারি যে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আড়াআড়ি বিভাজনটা তখনও পর্যন্ত এমন কিছু তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠেনি যাতে তাঁদের আভ্যন্তরীণ একা ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা একটি সাধারণ গোষ্ঠীচেতনার উদ্ভব ব্যাহত হয়। কৃষকেরা এই অঞ্চলের শোষণকারী উচ্চজাতের লোকদের থেকে পৃথক হয়ে ছিলেনই, বর্ধিত ব্যক্তিরও সংখ্যার দিক দিয়ে ছিলেন এত কম, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ছিলেন এত দুর্বল এবং সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে ছিলেন এত নিচের দিকে, যে তাঁরাও উচ্চজাতের ভদ্রলোকদের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে ভাবতে পারতেন না। আর সেই সঙ্গে এঁদের নবলব্ধ আর্থিক অবস্থা এঁদের সামাজিক মর্যাদার অসঙ্গতি সত্ত্বে আরও বেশি সচেতন করে তুলেছিল। অন্যদিকে এই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষদের মধ্যেও এক নতুন আত্মমর্যাদাবোধের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ একদিকে তাঁরা বিল অঞ্চলের বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে অনবরত যুদ্ধে যুদ্ধেই নিজেদের স্থিতিশীল কৃষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে বেশ কিছু উদারপন্থী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংস্পর্শেও এসেছিলেন, যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় অথবা কর্তাভজা সম্প্রদায়, অথবা অষ্টাদশ শতকের স্থানীয় ধর্মগুরু শাহলাল পীর, যাঁরা সবাই জাতপাতের বাধা অস্বীকার করে সর্বমানবের মধ্যে সাম্যের বাণী প্রচার করে আসছিলেন (বেভারিজ, ১৮৭৬, পৃ: ২৬০-৬৫, যসিমুদ্দিন, ১৯৭৭, পৃ: ৩৬-৪২, ২৫৯, ২৬২)। কাজেই এই সম্প্রদায়ের মধ্যে দুটি গোষ্ঠীর স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষা আলাদা হলেও উচ্চজাতের ক্ষমতা ও আধিপত্যকে অস্বীকার করা এবং চূর্ণ করার একটি সম্মিলিত অভিলাষ ছিল। এই

অভিলাষই তাঁদের ক্রমশ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূলমন্ত্রের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, কারণ বাংলায় এই রাজনীতিতে ছিল উচ্চজাতের হিন্দু ভদ্রলোকদের একচেটিয়া প্রভাব। এই বিচ্ছিন্নতাবোধের উৎসে ছিল এমন এক আদর্শবাদ যা অতীত এবং বর্তমান বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব ধারণার জাতক, অপরপক্ষে তা জাতীয়তাবাদী ধারণা থেকে সবিশেষ স্বতন্ত্র।

নমশূদ্রদের এই সামাজিক আন্দোলন শুরু হয় ১৮৭২-৭৩ সালে ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ অঞ্চলে। এই অঞ্চলের এক বিশিষ্ট নমশূদ্র গ্রামীণ নেতার মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উচ্চজাতের লোকেরা আসতে অস্বীকার করলে তাদের সঙ্গে সমস্ত রকম সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। এই সামাজিক বর্জনের আন্দোলন প্রায় ছ'মাস ধরে চলে। এই সময়ে কৃষিকাজে, ঘর ছানি দেওয়ার অথবা অন্য কোনো রকম কাজে উচ্চজাতের লোকদের সঙ্গে কোনো রকমভাবে সহযোগিতা করতে নমশূদ্ররা অস্বীকার করে (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৯, পৃ: ১৮৩-৮৪)। এই আন্দোলন অবশ্য বেশি দিন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর এই প্রথম অসফলতার পরেই এঁদের মধ্যে উদ্ভব হয় এক সংগঠিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের, যার নাম হল মতুয়া। এই সম্প্রদায় তার সামাজিক ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি এবং সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত ধারণা আহরণ করেছিলেন প্রচলিত বৈষ্ণব ধারা থেকে। কিন্তু তাদের চিন্তায় এই ধ্যান-ধারণাগুলি এমন এক নিজস্বতা লাভ করে যাতে এগুলির সাহায্যে প্রচলিত ক্ষমতার সম্পর্ককে সার্থকভাবে মোকাবিলা করা যায়। এঁদের প্রধান ধর্মগুরু শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর, জন্মেছিলেন এক বর্ধিত কৃষক পরিবারে। অন্যান্য বৈষ্ণবগুরুদের মতন তিনিও প্রচার করেছিলেন যান্ত্রিক ভক্তি, জাতিভেদের অবসান ও সর্ব-সাম্যের মতাদর্শ। কিন্তু তার ওপরেও তিনি যা প্রচার করেছিলেন তা হল এক কর্মের নীতি যা একটি সামাজিক গতিশীল সম্প্রদায়ের উচ্চাশা পূরণে সহায়ক হতে পারে। বাঙালি ভদ্রলোক সমাজ যখন রামকৃষ্ণের প্রভাবে বেদান্তের কথা ভাবছে অথবা পার্থিব সম্পদ বর্জন করে আধ্যাত্মিক মুক্তির কথা ভাবছে, গুরুচাঁদ তখন তাঁর শিষ্যদের শিক্ষিত হয়ে অর্থ উপার্জন করে সম্মানীয় হয়ে উঠতে বলছেন। 'হাতে কাম মুখে নাম', অর্থাৎ পার্থিব দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়েই মুক্তিলাভ, এই ছিল তাঁর ভক্তদের প্রতি গুরু উপদেশ,

যাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন জাতে নমশূদ্র। উঁচুজাতের বৈষম্যের তাঁদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করলে মতুয়া ভক্তদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ঐক্য আরও বেড়ে যায়। আর এই সংগঠন ও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা আরও গুরুত্ব পায় গুরু উপদেশে। 'যার দল নেই তার বল নেই', তাঁর এই শিক্ষায় সম্প্রদায় গঠন করে সমষ্টিগত প্রয়াস চালানার কথাই প্রকাশ পেয়েছিল। এই সম্প্রদায়ের নিত্যকর্ম ছিল কীর্তনগান। এই সমবেত কীর্তনগান এবং সম্মিলিত ভক্তি সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত চরিত্রকে জোরদার করত। এছাড়াও অন্যান্য নিয়মিত সম্মেলন—যেমন বারুণী মেলা-ভক্তদের মধ্যে অধিকতর সামাজিক আদান-প্রদানের সহায়ক হত (সরকার, ১৯১৬; ম. হালদার, ১৯৪৩; ন. হালদার, ১৯৮৫, ১৯৮৬, পৃ: হালদার, ১৯৮৬)।

এই মতুয়া ধর্ম সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করেই ঊনবিংশ শতকের শেষে নমশূদ্রদের সামাজিক আন্দোলন শুরু হয় এবং গুরুচাঁদ ঠাকুরের পৈতৃক গ্রাম, ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দি হয়ে ওঠে এই আন্দোলনের প্রধান কর্মক্ষেত্র। এই ধর্মসম্প্রদায় ছাড়াও ১৯০২ সালে একটি সমিতি গঠন করা হয় এবং জাতি-আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দেবার জন্য নিয়মিত 'উন্নয়নী সভা'-র আয়োজন করা হতে থাকে। এছাড়া প্রচারের জন্য অন্যান্য মাধ্যমও ব্যবহার করা হত, যেমন যাত্রা-অনুষ্ঠান অথবা প্রতিটি পরিবার থেকে সাপ্তাহিক 'মুষ্টি' সংগ্রহ। এরপর ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত Bengal Namasudra Association ও তার জেলা শাখাগুলির মাধ্যমে এই আন্দোলন পুরোপুরিভাবে সংগঠিত হয়ে ওঠে।

এই আন্দোলন যত এগোতে থাকে ততই কিন্তু এর মধ্যে চেতনার দুটি স্তর এবং কার্যাবলীর দুটি ধারা প্রকট হয়ে উঠতে থাকে—এর একটি স্তর হল সম্ভ্রান্ত নেতৃবৃন্দের, আর অন্যটি হল তাদের কৃষক অনুগামীদের। নেতৃবৃন্দের প্রধান দাবি ছিল পুরোনো অসম্মানজনক 'চন্ডাল' নামের পরিবর্তে তাঁদের নতুন 'নমশূদ্র' নামের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন। ১৯১১-র আদমসুমারিতে শেষ পর্যন্ত এই চন্ডাল নাম মুছে যায়। এছাড়াও তাঁরা নানারকম সাংস্কৃতিক প্রতীক ধারণ করতে থাকেন, যাতে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা সূচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, তাঁরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করতে থাকেন এবং তার স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দাখিল

শাস্ত্রের পারিবারিক মহিলাদের বাজারে যাওয়া বন্ধ করেন। এগার দিন অশৌচ শাসন করতে থাকেন এবং সর্বোপরি উপবীত ধারণ করাও আরম্ভ হয়। 'Sanskritisation' বা সংস্কৃতায়নের সে তত্ত্ব আছে তা দিয়ে এই ব্যবহারকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ এই তত্ত্বে প্রতিবাদের দিকটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। আসলে এই নিম্নবর্ণের লোকেরা যা করছিলেন তা হল ক্ষমতার প্রতীক কতগুলি চিহ্নকে ধারণ করে সেগুলিকে অর্থহীন করে দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সমাজে ক্ষমতার যে সর্বোচ্চ প্রতীক সেই উপবীত এই নিচু জাতের লোকেরা গ্রহণ করতে শুরু করলে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি ভদ্রলোকেরা একে 'সিকি পয়সার সুতো' বলে বর্ণনা করতে শুরু করেন (রায়, ১৯২৬, পৃ: ৪৯৩)। সম্ভ্রান্ত নমশূদ্রদের এই প্রতিবাদ কিন্তু পুরোপুরি সচেতনভাবে না হলেও, এক ধরনের সমঝোতা অথবা প্রচলিত আচার-ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। নিজেদের বর্ধিত সামাজিক এবং ধর্মীয় পদমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে সব পৌরাণিক উপাখ্যানের অবতারণা তাঁরা করছিলেন তার প্রত্যক্ষ উপাদান ছিল সেই হিন্দুশাস্ত্র। আর এই কাহিনীগুলিকে এমনভাবে রচনা করা হচ্ছিল যার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সমাজে উঁচু-নিচু-এ বিভেদ ঘুচিয়ে ফেলা অথবা আচার-বিচারের জগৎটাকে সম্পূর্ণ উন্টে ফেলার উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে নিজেদের উচ্চ সামাজিক পদমর্যাদার স্বীকৃতিটুকুই তাঁরা চাইছিলেন (বিশ্বাস, ১৯১১, পৃ: ৪৫-৫৩, শর্মা, ১৯১৩, পৃ: ৬-৯)।

আরও বৈষয়িক স্তরে নমশূদ্র নেতারা বুঝতে শুরু করেছিলেন যে সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন হল শিক্ষা এবং চাকরি। কারণ এগুলিই হল সামাজিক মর্যাদার নতুন উৎস। উঁচু জাতের লোকদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা এবং নানা ধরনের খোলাখুলি অথবা প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতিত্বই ছিল শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে তাঁদের পিছিয়ে থাকার কারণ। কাজেই ১৯০৬ সাল থেকে ঔপনিবেশিক সরকার মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি যে পক্ষপাতমূলক সহায়তার নীতি চালু করেছিলেন তা নমশূদ্র নেতাদেরও ওই ধরনের সুযোগ ও সুবিধা দাবি করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে তোলে। ১৯২০-র দশকে ১৯৩০-এর দশকে গোড়ার

দিকে এই ধরনের শিক্ষা ও চাকরি সংক্রান্ত কিছু সুবিধা সুযোগ তাঁদের দেওয়াও হল। কিন্তু তাতেও তাঁদের সম্প্রদায়ের অবস্থার কোনো উন্নতি হল না, কারণ স্থানীয় আমলারা এই ধরনের নিয়ম-কানুন প্রায়শই অমান্য করতেন।

নমশূদ্র নেতৃত্বের অন্য অসন্তোষের কারণ ছিল প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করতে না পারা। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব খানিকটা বাড়লেও, প্রাদেশিক আইনসভায় তাঁদের প্রতিনিধিত্ব ছিল একেবারেই নগণ্য। একদিকে এই প্রতিনিধিত্বহীনতা ও অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান কমতা হস্তান্তর এইসব নেতাদের উচ্চজাতের স্বৈরাচারী শাসন সম্বন্ধে ভীত করে তুলল। অতএব, মণ্টাগু-চেম্‌সফোর্ড সাংবিধানিক সংস্কার প্রস্তাব ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯১৭ এবং ১৯১৮ সালে দুটি সম্মেলন তাঁরা 'সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের' পাবি তুললেন, যাতে পশ্চাদপদ জাতিগুলির ভবিষ্যৎ উন্নতি ব্যাহত না হয়। এর ফলস্বরূপ ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় অনুন্নত শ্রেণীর একজন প্রতিনিধির মনোনয়নের নীতি স্বীকৃত হয়। কিন্তু এই একজন প্রতিনিধি ছাড়া, এই বিশাল অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের আর কোনো উপায় ছিল না। নমশূদ্র অধ্যুষিত কেন্দ্রগুলি থেকে নির্বাচিত হতে থাকেন সেই কথিহু প্রার্থীরাই।

আর এইভাবে রাজনৈতিক উচ্চাশাপূরণে ব্যর্থ হলে নমশূদ্র নেতৃত্বের মনে ব্রিটিশ রাজের প্রতি একধরনের আনুগত্য জাগল আর সেই সঙ্গে সৃষ্টি হল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্বন্ধে একটা সন্দেহ, কারণ এই আন্দোলন উচ্চজাতের হিন্দু ভ্রমলোকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিল। তবে তাদের এই রাজনৈতিক অবস্থানের মূলে ছিল এক আদর্শবাদ, যা গড়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক শাসনের চরিত্র সম্বন্ধে তাদের ধারণা এবং নিজস্ব ইতিহাসবোধ থেকে, যা জাতীয়তাবাদীদের চিন্তাধারা থেকে একেবারে আলাদা। জাতীয়তাবাদীরা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠাকে দেখতেন এক স্বর্ণময় যুগের অবসান হিসেবে, আর নমশূদ্রদের চোখে বর্তমান শাসনব্যবস্থা ছিল সেই অতীতের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। কাজেই তাঁদের কাছে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে কোনো আন্দোলনই হয়ে ওঠে ইতিহাসকে পশ্চাদমুখী করে তোলার সামিল-খড়ির ঝাঁটাকে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে

দেওয়ার প্রয়াস। এই আন্দোলনগুলিকে তাই তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করতেন। এই কারণেই তাঁরা স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, হোমরুল আন্দোলনের সমালোচনা করেছিলেন, এমনকি গান্ধিজীর নেতৃত্বে গণআন্দোলনের যুগেও তাঁরা অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন ও ভারত ছাড় আন্দোলন থেকে দূরে সরে থেকেছেন, যদিও জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব, এমনকি গান্ধিজী নিজেও তাঁদের সমর্থন লাভ করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে পরিত্যাগ করার প্রবণতা শুধু যে সম্ভ্রান্ত নেতৃবৃন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, নিচের স্তরের মানুষদের মধ্যেও এই চেতনা সমানভাবে লক্ষ্য করা যায়, কারণ নেতারা সার্থকভাবেই কৃষকদের বুঝিয়েছিলেন যে জাতীয়তাবাদ হল উচ্চজাতের সামন্তশ্রেণীর একটি আদর্শবাদ মাত্র। স্বদেশী আন্দোলনকে এই ধরনের একটা আখ্যা দেওয়া মোটেও কষ্টকর ছিল না, কারণ এর নেতৃবর্গ ও সমর্থকরা সবাই ছিলেন ঐ শ্রেণীভুক্ত এবং তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা যথেষ্টভাবে প্রয়োগ করেই কৃষকদের এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন (সু. সরকার, ১৯৭৩, পৃ. ৩৫৫-৬০)। কৃষকেরা এই আচরণ মোটেই পছন্দ করেননি এবং এর ফলে যে বিরূপতার সৃষ্টি হয়েছিল তা অসহযোগ, আইন অমান্য এবং ভারত ছাড় আন্দোলনের যুগেও একই গতিতে সক্রিয় ছিল। কিন্তু এই যোগ না দেওয়াটাকে, অথবা কখনও কখনও সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করাটাকে ব্রিটিশরাজের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের প্রতিফলন বলে ধরে নিলেও ভুল করা হবে। বরং উচ্চজাতের জমিদাররা তাঁদের ওপর যে নানা ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচার চালিয়ে আসছিলেন এটা ছিল তার বিরুদ্ধেই এক ধরনের প্রতিবাদ, কারণ এই শ্রেণীর লোকেরাই ছিলেন রাজ-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে। বস্তুতপক্ষে সরকারের প্রতি নমশূদ্র কৃষকদের মনোভাব ছিল স্বার্থক। সাধারণভাবে তাঁরা কাছের অত্যাচারীদের চেয়ে দূরের শাসককেই পছন্দ করতেন বেশি, এবং প্রায়শই বাজার লুণ্ঠন এবং গৃহে লুণ্ঠরাজ চালিয়ে উচ্চজাতের কমতাজালী জমিদারদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। কিন্তু সরকার যদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে জমিদারদের পক্ষ নিয়ে হস্তক্ষেপ করতেন, যেমনটি ঘটেছিল

একাধিকবার ১৯০৯ সালে ফরিদপুর জেলায়, নমশূদ্র কৃষকেরা সেক্ষেত্রে পুলিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে দিখা করেননি। মনে রাখা দরকার, স্থানীয় কৃষকদের চেতনায় পুলিশবাহিনীই কিন্তু ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের একমাত্র প্রতিনিধি।

নমশূদ্র কৃষকদের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে যেটা সব সময়ই প্রকাশ পেত তা হল আর্থিক শোষণ মুক্তি আর সামাজিক সম্মানলাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য তাঁরা কখনও জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ নিয়েছেন, কখনওবা উঁচুজাতের হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন— যেমনটা ঘটেছিল ১৯০৮-৯ সালে যশোর, খুলনা, ফরিদপুর এবং ময়মনসিংহ জেলার কিছু কিছু অঞ্চলে। আবার অবস্থান্তরে সম্প্রদায়ের সম্মান বজায় রাখার জন্য এই মুসলিমদের সঙ্গেই তাঁদের তীব্র সংঘাত ঘটেছে যার নিদর্শন আমরা দেখি যশোর, খুলনা, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার কিছু কিছু অঞ্চলে ১৯১১, ১৯২৩-২৫ এবং ১৯৩৮ সালে।

নমশূদ্র কৃষকেরা তাঁদের সম্প্রদায়ের নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন কারণ এই নেতৃত্ব তাঁদের অভাব-অভিযোগগুলি কাজে লাগিয়ে একটি জাতিভিত্তিক আদর্শবাদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁরা নিয়মিতভাবে উল্লেখ করতেন ‘নিচু জাতের কৃষকদের’ ওপর ‘উঁচুজাতের জমিদারদের’ অত্যাচার ও শোষণের কথা অথবা ‘ভদ্রলোক রাজনীতিকদের কর্তৃত্বের’ কথা এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন জনসভা ও আইনসভায় তুলে ধরতেন কৃষকদের নানা অভাব-অভিযোগের কথা। এই সমস্ত নেতারা, অন্তত মুখের কথায় হলেও, সামাজিক কর্তৃত্বের প্রচলিত কাঠামোটাকে বদলানোর কথা বলতেন বলে তাঁদের রাজনীতির স্বপক্ষে জনমত গঠনে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু ১৯৩০-এর দশক থেকে এই নমশূদ্র নেতৃত্ব ক্রমশ তাঁদের কৃষক সমর্থকদের কথা ভুলতে শুরু করলেন। এই পরিবর্তনটা লক্ষ্য করা যায় ১৯৩০-এর খুলনা জেলা সম্মেলন থেকে, যাকে বর্ণনা করা হয়েছিল কৃষকদের নয়, তাদের শিক্ষিত ও পেশাদারি উত্তরসূরিদের সম্মেলন বলে। এই সম্মেলনেই তাঁদের নেতা গুরুচাঁদ ঘোষণা করলেন যে, সম্প্রদায়ের সামাজিক ও পার্শ্ব উন্নতির জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতালভের একান্ত প্রয়োজন আছে এবং এই ক্ষমতা আদায়ের জন্য

প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা একান্ত জরুরি। এরপর থেকে কয়েকটি জনসভা, সরকারের কাছে একটি দুটি আবেদন অথবা আইনসভার কিছু প্রশ্ন ছাড়া, এই বর্ধিষ্ণু নেতৃত্বের কর্মসূচীতে দরিদ্র কৃষকদের জন্য আর বিশেষ কিছু লক্ষ্য করা যায় না। জনসংযোগ এবং গ্রামভিত্তিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও শিথিলতা দেখা দিতে শুরু করল। কারণ অধিকাংশ নেতাই কলকাতা কেন্দ্রিক হয়ে গেলেন। যে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা সুযোগ তাঁরা চাইছিলেন ১৯৩৫ সালের সাংবিধানিক সংশোধনে সেগুলি অনুমোদিত হলে এই সব নেতাদের কাছে জনবলের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে যায়। ফলে সাধারণ সমর্থকদের অবহেলা করার প্রবণতাও বাড়তে থাকে, যা অত্যন্ত প্রকটভাবে চোখে পড়ে ১৯৩৭ সালের পরবর্তী পর্বে।

১৯৩০-এর গোড়া থেকেই নমশূদ্র নেতৃত্ব সাংবিধানিক রাজনীতিতে খুব বেশিভাবে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। ‘সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা’-কে তাঁরা স্বাগত জানানেন, পুণা চুক্তিকে নিন্দা করলেন এই বলে যে তা ‘ড. আশ্বদকরের রাজনৈতিক ভুল’। আবার পরে, অকংগ্রেসী বর্ণহিন্দুরা এই চুক্তির সমালোচনা শুরু করলে, এর সমর্থনে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হন। তবে এই সমর্থন ছিল ‘প্রয়োজনের চাপে’, ‘স্বেচ্ছায় নয়’, কারণ এর ফলে তাঁরা গৃথক নির্বাচনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। এইভাবে নেতাদের রাজনীতি ক্রমশ প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক হয়ে উঠলে তাঁদের মধ্যে গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বও শুরু হয়ে যায় এবং ১৯৩২-এর পর থেকে আমরা দুটি সংগঠনকে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখি। যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এই সংগঠনগুলি দাবি করছিল তাতে দরিদ্র গ্রামীণ শ্রেণীর উপকার হবার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম, কারণ সেগুলি কাজে লাগানোর মত বিদ্যা বা সঙ্গতি তাঁদের ছিল না। ফলে এই আন্দোলনের গণ-আবেদনও ক্রমশ কমতে থাকে।

এই সময় প্রজা আন্দোলন কৃষকদের জন্য এক শ্রেণীভিত্তিক কর্মসূচি তুলে ধরলে নমশূদ্র নেতৃত্বের জনসমর্থন আরও কমে যায়। বস্তুত ১৯২০-র শুরু থেকেই নমশূদ্র কৃষকেরা তাঁদের নিজস্ব দাবি আদায়ের জন্যে স্বাধীনভাবে নিজেদের সংগঠিত করতে শুরু করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে উঁচুহাের শস্য-খাজনাকে সহজ নগদ খাজনায় পরিবর্তনের

দাবি। অথবা ১৯২০-র দশকে বর্গাদার বা ভাগচাষিদের তিন-চতুর্থাংশ ফসলের দাবি (ত. সরকার, ১৯৮৭, পৃ. ৩৮-৪১)। এরপর আরও সুসংবদ্ধভাবে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি এই সময়ে পূর্ববঙ্গের মুসলিম ও নমশূদ্র কৃষকদের সংগঠিত করতে শুরু করে। নমশূদ্র সম্প্রদায়ের কিছু নবীন নেতা, যেমন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল অথবা বিরটিচন্দ্র মণ্ডল এই নতুন প্রজা-আন্দোলনের জন্য নমশূদ্র কৃষকদের সমর্থন আদায়ের পেছনে ছিলেন। কিন্তু এই কৃষক প্রজা পার্টিও ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে মুসলিম লীগের সঙ্গে মুসলিম ভোটের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুবাদে তার তফসিলি জাতিভুক্ত সমর্থকদের পরিত্যাগ করেন। ফলে এবার সম্প্রদায়ের নেতৃত্বকে সমর্থন করা ছাড়া নমশূদ্র কৃষকদের সামনে আর কোনো রাস্তা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত নেতার ১৯৩৭-এর নির্বাচনে হেরে যাওয়া থেকেই প্রমাণ হয় যে নমশূদ্র কৃষকশ্রেণী তাঁদের নেতৃত্বের রাজনীতিকে পুরোপুরিভাবে এই সময়ে সমর্থন করেছিলেন না। অন্যদিকে কংগ্রেসও এই অবস্থার সুযোগ নিতে পারেনি, কারণ ওই বছরে নির্বাচিত নমশূদ্রদের মধ্যে মাত্র একজনই ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। কিন্তু বাখরগঞ্জ জেলার নমশূদ্র অধ্যুষিত এক অসংরক্ষিত কেন্দ্রে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল নির্দল প্রার্থী হিসেবে পরাজিত করেন কংগ্রেসের কায়স্থ প্রার্থী সরল দত্তকে, যিনি ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সেই সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক উত্তরসূরী। তাঁদের নিজের জাতের কোনো নেতা যদি তাঁদের দুঃখের সমব্যর্থী হতেন, তবে তাঁকে সমর্থন করার জন্য নমশূদ্র কৃষকেরা যে কতখানি দৃঢ়সংকল্প ছিলেন, এই ঘটনা তারই প্রমাণ।

প্রায় ১৯৩৭ পর্যন্ত নমশূদ্র আন্দোলন বাংলায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূলস্রোতের থেকে উৎসারিত কোনো ধারা নয়, এক পৃথক সমান্তরাল চেতনার ধারা হিসেবেই চলে আসছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনকালের শেষ দশকে, ক্ষমতা হস্তান্তর যখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে আসছে, তখন রাজনীতির মূলস্রোত সমান্তরাল এই ধারাগুলিকে আত্মস্থ করতে সচেষ্ট হয়। বাংলা যখন বিভক্ত হয় এবং ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে, নমশূদ্র আন্দোলন তখন তার পৃথগম্ন মনোভাব ছেড়ে এই প্রদেশের রাজনৈতিক মূলস্রোতের সঙ্গে মিশে গেছে। তবে এই

আন্দোলনের মধ্যে যেহেতু বিভিন্ন ধরনের চেতনার সহাবস্থান ছিল, এই মিশে যাওয়ার ঘটনাটিও তাই ঘটেছিল বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন রূপে।

প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত নমশূদ্র নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব রেখেই চলছিলেন, তার প্রমাণ সে বছরের নির্বাচনী ফলাফল। তের জন সফল নমশূদ্র প্রার্থীর মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন কংগ্রেস সভ্য এবং এইসব 'নির্দল' সাংসদরা ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ-প্রজা পার্টির সম্মিলিত সরকারকে সমর্থনও জানিয়েছিলেন (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯০ ক, পৃ: ১৮১-৮২)। কিন্তু নতুন সরকার তফসিলি জাতির উন্নয়নের জন্য বিশেষ কিছু না করায় অচিরেই তাঁদের মোহভঙ্গ হয়, এবং এই মত্বিসভায় তাঁদের প্রতিনিধি মুকুন্দবিশারী মল্লিককে ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে কাঁচরাপাড়ার এক জনসভায় প্রকাশ্যেই সমালোচনা করা হয়। কংগ্রেস এইবার এই অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে তফসিলি জাতি আন্দোলনকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা শুরু করে, কারণ আইনসভায় তফসিলি জাতি সাংসদদের উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করার আর কোনো উপায় ছিল না। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে গুরুত্বপূর্ণ মুতু ঘটলে যে প্রভাব নমশূদ্র আন্দোলনকে কংগ্রেসি রাজনীতির থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল তা অন্তর্হিত হয় এবং এই একই বছরে গঠিত 'ক্যালকাটা শিডিউল্ড কাস্ট লীগ' এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ শুরু করে। যে সমস্ত বিশিষ্ট নমশূদ্র নেতা এই নতুন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পৌত্র প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্যদিকে কংগ্রেসের পক্ষে যাঁরা এই নতুন মৈত্রীবন্ধনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুভাষ এবং শরৎ বসু-ভ্রাতৃদ্বয়। ১৯৩৮ সালের ১৩ই মার্চ অ্যালবার্ট হলের এক সভায় কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি সুভাষ বসু গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা করেন 'অতিমানব' বলে, 'যিনি বাংলার হিন্দু সমাজে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করে তাকে পুনর্জাগরিত করেছিলেন।' এই সভার তিনদিন পরে তফসিলি জাতির প্রায় কুড়িজন সাংসদ, যাদের মধ্যে ছিলেন প্রমথরঞ্জন ঠাকুর এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শরৎ বসুর বাড়িতে মিলিত হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করার এবং সম্মিলিত সরকারের প্রতি সমর্থন তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা একটি নতুন সংসদীয় দল গঠন করেন, যার নাম দেওয়া হয় Independent

Scheduled Caste Party। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল হলেন এর সচিব এবং এই দল 'কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলবে' বলেই ঠিক হয়।

১৯৩৮ সালের ১৮ই মার্চ কলকাতায় গান্ধীজীও কয়েকজন বিশিষ্ট নমশূদ্র সাংসদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর ব্যক্তিগত অনুরোধেই জুলাই মাসে প্রমথরঞ্জন ঠাকুর কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলি সফর করেন এবং সফর শেষে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে এইসব কংগ্রেসি সরকারগুলি তফসিলি জাতির উন্নয়নের জন্য যা করেছে তা দেখে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এরপর আগস্ট মাসে হক মন্ত্রিসভার দশজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দশটি পৃথক কংগ্রেস-সমর্থিত প্রস্তাব আনা হয় আইনসভায়। নমশূদ্র মন্ত্রী মুকুন্দবিহারী মল্লিকের বিরুদ্ধে প্রস্তাবটি আনেন নমশূদ্র নেতা প্রমথরঞ্জন ঠাকুর এবং সমর্থন জানান আরেক নমশূদ্র নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। এই আস্থা ভোটে ভোটভূটির নমুনা থেকে দেখা যায় যে এই সময় তফসিলি জাতিভুক্ত একত্রিশ জন এম.এল.এ-র মধ্যে অন্তত যোল জন ছিলেন কংগ্রেস সমর্থক। নমশূদ্রদের ক্ষেত্রে এই রাজনৈতিক স্থান পরিবর্তন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় ১৯৩৯ সালের ২৯শে মে তমলুকের নিখিলবঙ্গ নমশূদ্র সম্মেলনে, যেখানে প্রমথরঞ্জন ঠাকুর তাঁর সভাপতির ভাষণে নমশূদ্র সম্প্রদায়কে 'জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে' উপদেশ দেন। পিতামহের রাজনৈতিক পৃথকীকরণের নীতির বদলে আসে পরবর্তী প্রজন্মের একীকরণের আশীর্বাদ। এদের সাহায্যে ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে মুসলিমলীগ সমর্থিত হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করে কংগ্রেস-সমর্থিত প্রগ্রেসিভ কোঅ্যালিশন সরকার, সাধারণভাবে যা 'শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা' নামেই পরিচিত ছিল। রাজবংশী নেতা উপেন্দ্রনাথ বর্মণ এই মন্ত্রিসভায় তফসিলি জাতির প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন (বর্মণ, ১৯৮৫, পৃ: ৮১-৮৪)।

তবে সব নমশূদ্র নেতাই যে কংগ্রেসের সঙ্গে একীকরণের নীতি মেনে নিয়েছিলেন তা নয়, বরং এই সময়ে তাঁদের আন্দোলন একটা স্পষ্ট ভাগ্যভাগির চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যে সব নেতারা এই কয়েক বছর ধরে মুকুন্দবিহারী মল্লিককে ঘিরে সংগঠিত হচ্ছিলেন, তাঁরা তাঁদের ইংরেজ সরকারের প্রতি পাখি

এবং নৈতিক সমর্থনের পুরোনো নীতিই ধরে রইলেন। আগের মতোই তাঁরা অধিক চাকরি এবং শিক্ষার সুযোগ দাবি করতে থাকলেন এবং মন্দিরের দ্বার উন্মোচন অথবা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের মতো কংগ্রেসি আন্দোলনগুলির শূন্যগর্ততা উন্মোচিত করার চেষ্টা করে চললেন। প্রস্তাবিত ক্রিপস মিশন এবং সাংবিধানিক সংস্কারের সম্ভাবনা সর্বপ্রথম মল্লিকগোষ্ঠীকে কংগ্রেস-সমর্থক ঠাকুরগোষ্ঠীর কাছাকাছি নিয়ে আসতে পেরেছিল। ১৯৪২ সালের ২৬শে মার্চ তাঁরা ঘোষণা করেন যে এক যৌধ দল দিল্লি গিয়ে স্টাফোর্ড ক্রিপস-এর কাছে তাঁদের দাবিদাওয়া জানাবে। কিন্তু ক্রিপস মিশন অসফল হলে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে স্থায়ী সমঝোতার সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যায়।

নতুন করে সক্রিয় স্থাপনের সম্ভাবনা আরেকবার দেখা গিয়েছিল ১৯৪২-এর এপ্রিল মাসে, যখন কলকাতায় তফসিলি জাতির বেশ কিছু নেতা মিলিত হয়ে স্থাপন করলেন এক নতুন সংগঠন, যার নাম রাখা হল বেঙ্গল শিডিউল্ড কাস্ট লীগ, এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল হলেন তার সভাপতি। প্রথম দিকে এই সংগঠন কংগ্রেস সমর্থদের নীতি বজায় রাখে এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে গান্ধীজী গ্রেন্ডার হলে তার নিন্দা করে। তবে ইতিমধ্যেই সুভাষ বসু-বিতর্কের কারণে মণ্ডল কংগ্রেস সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এই দুরত্ব আরো বাড়ে ১৯৪৩-এ তিনি মুসলিম-লীগ সমর্থিত নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভায় যোগদান করলে। কারণ আর সব তফসিলি নেতাই এই মন্ত্রিসভাকে 'সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক' বলে বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন (বর্মণ ১৯৮৫, পৃ: ৮৪; মণ্ডল ১৯৭৫, পৃ: ৫১)। তবে নতুন মন্ত্রিসভায় ছিলেন আরো একজন নমশূদ্র নেতা, পুলিশবিহারী মল্লিক (মুকুন্দবিহারীর ভাই) এবং একজন রাজবংশী নেতা, প্রেমহরি বর্মা, আর মুকুন্দবিহারী হলেন নতুন সংযুক্ত দলের সহযোগী নেতা। এই অবস্থা থেকে নমশূদ্র নেতৃবৃন্দ একটা স্পষ্ট বিভাজন সহজেই চোখে পড়ে। দুই মাসের মধ্যেই আশ্বেদকর কর্তৃক ১৯৪২ সালে স্থাপিত সর্বভারতীয় তফসিলি জাতি ফেডারেশনের বঙ্গীয় শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্বেদকর রাজনীতিতে ইতিমধ্যেই গভীরভাবে দীক্ষিত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল হলেন এই শাখার প্রথম সভাপতি। ১৯৪৫-এর এপ্রিল মাসে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জে অনুষ্ঠিত এই শাখার প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগেন্দ্রনাথ তাঁর

সভাপতির ভাষণে ঘোষণা করেন যে ফেডারেশনের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হবে তফসিলি জাতিগুলির জন্য এক পৃথক রাজনৈতিক আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করা। তবে এই সময় সমগ্র তফসিলি সম্প্রদায়ের মনের কথা তিনি বলেছিলেন একথা ভাবাটো বোধহয় ঠিক হবে না। কারণ অনেক বিশিষ্ট নেতাই এই সম্মেলন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। একটি বর্ণনা অনুযায়ী এই সময় সমগ্র বাংলার ৩১ জন তফসিলি এম.এল.এ-র মধ্যে মাত্র তিনজন এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। আশ্চর্যকর সম্ভবত এই অবস্থার কথা জানতে পেরেই শেষ মুহুর্তে তাঁর সম্মেলনে যোগদানের কর্মসূচি বাতিল করেন।

এই সময়ে 'সমস্বয়বাদী'রাই নমশূদ্র তথা বঙ্গীয় তফসিলি জাতি আন্দোলনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এর সম্যক প্রতিফলন আমরা দেখি ১৯৪৬-এর নির্বাচনী ফলাফলে। এই নির্বাচনে তফসিলি জাতি ফেডারেশনের মাত্র একজন প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন—তিনি হলেন সভাপতি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। মুকুন্দবিহারী মল্লিক নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন তাঁর নিজস্ব কেন্দ্র খুলনা থেকে। কিন্তু অন্যদিকে কংগ্রেস সমর্থিত তফসিলি প্রার্থীরা জয়ী হল ৩০টি সংরক্ষিত কেন্দ্রের ২৪টিতেই। রাজবংশী নেতা প্রসন্নদেব রায়কর এবং নমশূদ্র নেতা প্রমথরঞ্জন ঠাকুর নির্দল প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে জিতলেও, পরে দুজনেই কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৪৬-র নির্বাচনের ফলাফলে তাই ১৯৩৭-র অবস্থার সম্পূর্ণ আবর্তন দেখি, কারণ ওই শেখোক্ত বজ্রের তফসিলি জাতির বহুশতকজন নির্বাচিত সাংসদের মধ্যে মাত্র সাতজন ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। কংগ্রেস এতদিনে নমশূদ্র তথা তফসিলি জাতি আন্দোলনের মধ্যে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'দের একঘরে করে এই আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে কুক্ষিগত করে নিয়েছে। আর ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হওয়ায় এই নির্বাচনী ফলাফলকে সাধারণ মানুষের মনের প্রতিফলন হিসেবেও খানিকটা ধরা যেতে পারে।

তফসিলি জাতি ফেডারেশনের নির্বাচনী অসাফল্য সংবিধান সভা-র (Constituent Assembly) নির্বাচনেও প্রতিফলিত হল। এই সভার জন্য বঙ্গীয় আইনসভার সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত তফসিলি জাতির ৬ জন প্রার্থীর মধ্যে একজনই মাত্র ছিলেন ফেডারেশনের প্রার্থী, তিনি হলেন বি. আর. আশ্বেদকর,

নিজের প্রদেশ মহারাষ্ট্রে নির্বাচনে অনিশ্চয়তার জন্য যিনি নির্ভর করেছিলেন তাঁর বাঙালি বন্ধুদের ওপর। বাংলার আইনসভার চেয়ারা থেকে অন্যান্য সফল প্রার্থীরা করা হবেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। এঁরা সবাই ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী, আর অন্যদিকে পরাজিতদের মধ্যে ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং মুকুন্দবিহারী মল্লিক। বহুতপস্কে গোটা সংবিধান সভায় তফসিলি জাতি ফেডারেশনের একমাত্র নির্বাচিত প্রার্থী ছিলেন আশ্বেদকর স্বয়ং। ফলে ব্রিটিশ সরকারও এই সংগঠনকে তফসিলি জাতির যথার্থ প্রতিনিধি বলে স্বীকার করতে অস্বীকার করে। ভারত সচিব হাউস অব লর্ডস-এ ঘোষণা করেন যে সংবিধান প্রণয়নী সভায় কংগ্রেসই তফসিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব করবে।

বাংলায় আশ্বেদকরবাদীরা আরও একঘরে হয়ে পড়েন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সুরাবর্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ মহল্লিসভায় যোগদান করলে এবং ১৯৪৬-র আগস্ট মাসে সংগঠিত কলকাতা-দাদার পর তিনি ও মুকুন্দবিহারী মল্লিক মহল্লিসভার বিরুদ্ধে অনীত অনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। দাদার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির এক 'খোলা চিঠি'-তে মণ্ডলের কাছে আবেদন জানায় লীগ মহল্লিসভার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে পুনর্বীর জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জন করার জন্য। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না, বরং লীগের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব কাজে এল যখন ১৯৪৬-এর অক্টোবর মাসে জিন্না তাঁকে অন্তর্বর্তীকালীন মহল্লিসভায় বাংলা থেকে লীগের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করলেন। তবে যে রাজনীতির স্বপক্ষে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সে রাজনীতিটাই ক্রমে অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ ১৯৪৭-এর জুলাই মাসে একটি উপনির্বাচনে বঞ্চে কংগ্রেস সংসদীয় দল আশ্বেদকরকে তাঁদের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করে। পরে তিনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তারও পরে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম সরকারের আইনমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন (জেলিয়াট ১৯৮৮, পৃ: ১৯৩-১৯৪)। কংগ্রেস এইভাবে তফসিলি জাতির আন্দোলনকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করে নেয়, যদিও এই প্রক্রিয়া নিম্নবর্ণের চেয়ে ওপরের তলার মানুষদের মধ্যেই বেশি কার্যকর হয়েছিল বলে মনে হয়।

১৯৩৮ সাল থেকে নমশূদ্র নেতারা মোটামুটিভাবে, যাকে বলা যায়, সম্ভ্রান্ত

শ্রেণীর গোষ্ঠীচিন্তার রাজনীতিতেই নিম্ন হয়েছিলেন। ঠিক যেমন ক্রমবর্ধমান গতিতে তাঁরা কংগ্রেসের ছত্রছায়া আসতে শুরু করেন, ঠিক তেমনি ভাবেই গণআন্দোলনের ব্যাপারেও তাঁদের উৎসাহে তাঁটা পড়তে থাকে। বেশির ভাগ নেতা এবং তাঁদের সংগঠনগুলি এই সময়ে হয়ে পড়েছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। কচিং কখনও তাঁরা গ্রামে যেতেন 'কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে বোঁজ বকর নিতে'। এবং আরো কপাচিং তাঁরা কৃষকদের দাবি-মাওয়া নিয়ে কথা বলতেন—তাঁদের বিভিন্ন সভার অনুষ্ঠানসূচী থেকে অন্তত তাই মনে হয়। এই অবস্থা থেকে যেটা সহজেই বোঝা যায় তা হল নমশূদ্র নেতৃত্ব ও তাঁদের কৃষিজীবী সমর্থকদের মধ্যে এক দূরত্ব মনসিক এবং পার্থিব ব্যবধান ক্রমশ তৈরি হয়ে চলেছিল।

১৯৩৭ সালের পর থেকে নমশূদ্র কৃষকেরা কি করছিলেন দক্কিন দস্তাবেজ তার সরাসরি হদিশ পাওয়া যায় না বলে আমাদের কিছুটা তা অনুমান করে নিতে হয়। একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে হিন্দু সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মানসিকতা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রীহত্ত জেলার হরিগঞ্জ মহকুমার শিমুলখর গ্রামে তাঁরা বহিষ্কৃতদের উপস্থিতিতে জুতো পরে থাকার অধিকার আদায়ের জন্য এক দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন শুরু করেছিলেন, মাঝে মাঝেই যা হিংসার পথ ধরছিল। কিন্তু অন্যদিকে এমন প্রমাণও আছে যে তাঁরা ওই সময় হিন্দু সমাজের সঙ্গে অনেক বেশি করে একত্বাবোধ করছিলেন এবং এই হিন্দুয়ানি কখনও কখনও তাঁদের জাত-ভিত্তিক আত্মচেতনাকে ছাপিয়ে উঠছিল।

নমশূদ্র জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুত্ববোধ জাগিয়ে তোলার পেছনে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনগুলির প্রচেষ্টাও ছিল। যেমন হিন্দু নিশন তিনের দশক থেকে এই ধরনের মানুষের মধ্যে কাজ শুরু করে এবং ১৯৩৮-এর পর তাদের কার্যগতি আরও বেড়ে যায়। এই সময় থেকে ভারত সেবাক্রম সমাজের স্বামী প্রণবানন্দ যশোর, খুলনা, ফরিদপুর এবং বাথগঞ্জ জেলার নমশূদ্রদের মধ্যে কাজ শুরু করেন, যাতে তাদের সংগঠিত করে হিন্দু সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল সর্বভারতীয় হিন্দু মহাসভা। এই সংগঠন ১৯৩৯-৪০ সাল থেকেই তফসিলি জাতিভুক্ত কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে বিশেষ উৎসাহী হয়ে ওঠে।

১৯৪৪ সালের মধ্যে পূর্ববঙ্গের বাথগঞ্জ জেলায় এদের ৬৫টি, ঢাকায় ৫০টি, গরিনপুরে ৪৩টি, যশোরে ২৯টি এবং খুলনায় ৩১টি গ্রামীণ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুখ্য নমশূদ্র বস্তির যে সব অঞ্চলে এই শাখাগুলি খোলা হয়েছিল তার অনেকগুলি ইতিমধ্যেই নমশূদ্র আন্দোলনের জন্য প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। এমন প্রমাণও আছে যে এই অঞ্চলগুলির কিছু তফসিলি নেতা তফসিলি জাতিভুক্ত জনগণকে সংগঠিত করার কাজে অর্ধ সাহায্য পাচ্ছিলেন মহাসভার কাছ থেকে। ঢাকা নমশূদ্র সমিতির মতো সংগঠনও এই সময় মহাসভার সভাপতিশ্য প্রদান করেছিল। ঢাকা নমশূদ্র সমিতির সুসম্পর্ক বজায় রাখতে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিল।

নমশূদ্রদের মধ্যে হিন্দুত্ববোধ জাগিয়ে তোলার এই যে সুসংবদ্ধ প্রয়াস তার প্রতিফলন আমরা দেখি পরবর্তীকালে এঁদের সঙ্গে স্থানীয় মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভিন্ন ঘটনায়। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা আগেও হয়েছে, কিন্তু তা ছিল অস্থায়ী চরিত্রের। জন্ম নিয়ে বিবাদ অথবা মহিলা সংক্রান্ত এবং সাম্প্রদায়িক মান রাখার জন্য সংঘাত ঘটেছে, যেখানে ধর্মের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে কদাচিৎ। এবং সবচেয়ে বেশি পাশাপাশি সহযোগিতার নিদর্শনও রয়েছে প্রচুর (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯০ খ)। কিন্তু ১৯৪০-র দশক থেকে অবস্থানটি পাল্টাতে থাকে। হিন্দু মহাসভার প্রভাবে নমশূদ্ররা এবার মুসলমানদের মুখোমুখি হতে শুরু করে আগের মতো শুধুমাত্র নমশূদ্র হিসেবে নয়, হিন্দু হিসেবেও।

এই নতুন মনোভাব পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হতে থাকে ১৯৪১-এর ১৮-২১ মার্চের ঢাকা দাঙ্গার পর থেকে, কারণ রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার এই নতুন জঙ্গি মনোভাব নমশূদ্রদেরও সমানভাবে প্রভাবিত করে। ঢাকা দাঙ্গার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৪১-এর ২০ মার্চ খুলনা জেলায় আরেকটি দাঙ্গা ঘটে, যাতে 'একটি হিন্দু নমশূদ্রগ্রাম এবং একটি মুসলমান গ্রাম সম্পূর্ণ ভাঙ্গীভূত হয়ে যায়।' এই দাঙ্গাটি সম্বন্ধে তার বিশেষ কিছু জানা যায় না; কিন্তু ঠিক এই সময়ে যে কান্ডটি ঘটেছিল তা মনে করায় যে, নিছক জমি বা গরু-ছাগল নিয়ে বিবাদ এর কারণ ছিল না। এই সময় থেকেই হিন্দু মহাসভার খেজরসেবীরা এই অঞ্চলে তাদের সংগঠনের কাজ শুরু করেছিলেন, আর তার ফলস্বরূপই আমরা দেখি স্থানীয় নমশূদ্র এবং মুসলমান জনগণ বাগেরহাটে একে অন্যের সম্প্রদায় হজ্জেন সরাসরি রাজনৈতিক

সাম্প্রদায়িকতার স্লোগান মুখে নিয়ে—একদিকের স্লোগান ছিল, 'হিন্দু শক্তি কি জয়' এবং 'শ্যামাপ্রসাদ জিন্দাবাদ', আর অন্যদিকের 'মুসলিম শক্তি কি জয়' এবং 'শ্যামাপ্রসাদ ফরংস হোক।' খুলনা জেলার স্থানীয় শাসনকর্তারা সম্ভবত সংগত কারণেই মনে করতেন যে এই বিরূপতা ছিল হিন্দু মহাসভার সংগঠকদেরই তৈরি।

১৯৪৬-৪৭ সাল নাগাদ পূর্ববঙ্গের নমশূদ্র কৃষক তাদের হিন্দু আত্মপরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবেই অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং হিন্দু মহাসভা এই সময়ে বাঙালি হিন্দুদের জন্য এক পৃথক রাজ্যের যে দাবি তুলেছিল তার স্বপক্ষেও তাঁরা যথেষ্ট সরব ছিলেন। বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং খুলনা জেলার হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি যাতে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সে রাজ্য যাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়, তার দাবিতে উক্ত জেলাগুলির বিভিন্ন গ্রামে সংগঠিত হয়েছিল বহু জনসভা, যাতে বিপুল সংখ্যার নমশূদ্র কৃষকরা যোগ দেন। তাঁদের এই মনোভাব তাঁদের নেতাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। ব্যতিক্রম ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, যিনি একমাত্র সমর্থন জানিয়েছিলেন শরণ বসু ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের আবুল হাসেম-সুরাবদী গোষ্ঠী কর্তৃক আনীত 'সার্বভৌম সংযুক্ত বাংলা'-র প্রস্তাবকে। বঙ্গীয় আইনসভার বাংলাভাগের প্রস্তাবটি ভোটগুটির জন্য এলে চারজন বাদে আর সব তফসিলি জাতির সাংসদই ভোট দেন কংগ্রেস মহাসভার পরিকল্পনার স্বপক্ষে, যাতে ছিল পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে গঠন করে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার কথা (গার্ডন ১৯৮৯, পৃ: ৫৮১-৮২, ৫৮৬)। কিন্তু দেশবিভাগ শেষ পর্যন্ত নমশূদ্রদের সাহায্য করেনি, কারণ এর ফলে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব স্থায়ী বসতভূমি হারালেন। তাঁদের আশা এবং সব আবেদন সত্ত্বেও যে ভৌগোলিক অঞ্চলটিকে আগে আমরা এদের প্রধান বসতি অঞ্চল বলে চিহ্নিত করেছিলাম, তার সমস্তটাই চলে যায় পূর্ব পাকিস্তানে, পশ্চিমবঙ্গে নয়। পূর্ববাংলার শেষ ব্রিটিশ গভর্নর F.C. Bourne-এর ১৯৫০ সালে লিখিত একটি প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি যে দেশবিভাগের অব্যবহিত পরেই যে হিংস্র উদ্ভত্ততা দেখা দিয়েছিল তার ফলে এদের অনেকেই শুধুমাত্র তাঁদের জীৱন এবং পরিহিত বস্ত্র ছাড়া আর সবকিছুই হারিয়েছিলেন।

তবে পূর্ববঙ্গের নমশূদ্র কৃষকদের একীভবনের আরও একটি স্তর ছিল। যাঁরা

হিন্দুকরণের রাজনীতিতে সাড়া দিচ্ছিলেন, তাঁরাই কিন্তু আবার শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলনেও যোগ দিচ্ছিলেন। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি কিভাবে কৃষক প্রজা পার্টি ১৯৩০-র দশক তাঁদের সংগঠিত করে এবং পরে ১৯৩৭-এ কেনই বা তাঁদের আবার পরিত্যাগ করে। অন্যদিকে কিন্তু এই সময়েই ১৯৩৭-এর মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষাণ সভা বাংলায় নিম্নবর্ণের কৃষকের এই প্রতিবাদী মনোভাবকে সংগঠিত করার চেষ্টা শুরু করে দেয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে সারা প্রদেশে তাঁদের মাত্র ৫০,০০০ সভ্য থাকলেও (শেন ১৯৮২, পৃ: ৭৫-৭৮), ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি থেকেই খুলনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় 'কম্যুনিষ্ট ধাঁচে কৃষক সমিতি' গড়ে উঠতে শুরু করে; আর এই জেলাগুলিতে হিন্দু কৃষকের অধিকাংশই ছিলেন নমশূদ্র। কৃষকদের দলবদ্ধ করার এই কম্যুনিষ্ট প্রয়াস আরও বেড়ে যায় ১৯৪২ সালের ২৮-২৯ জুন রংপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন হওয়ার এবং জুলাই মাসে কম্যুনিষ্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর থেকে।

এই সংগঠনের ফল আমরা লক্ষ্য করি ১৯৪৭-এর তেভাগা আন্দোলনে, কারণ পূর্ববাংলায় এই আন্দোলনে যোগদানকারীদের অধিকাংশই ছিলেন ফরিদপুর, খুলনা এবং যশোর জেলার নমশূদ্র ভাগচাষি। এই অঞ্চলে কখনও কখনও অবশ্য বাইরের ফড়যন্ত্রের ফলে আন্দোলনকারীদের দৃষ্টি ঘুরে যায় মুসলমান প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁদের পুরনো বৈরিতার দিকে, এর ফলে আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্তও হয় যথেষ্ট পরিমাণে (কুপার, ১৯৮৮, পৃ: ২২৫-২৬, ২৫৩, ২৫৬-৫৭, ২৬০)। তবে এই অবস্থা থেকে এটাও বোঝা যায় যে 'শ্রেণী', 'ধর্ম' এবং 'জাতের' প্রতি তাঁদের আনুগত্য একাধার-অস্তিত্বকে বজায় রেখেছিল। এই আত্মপরিচয়ের সমূহ ভিন্নতা কারো স্বনৈচ্ছ্যিত ঘটয়নি বা সমাধ্বিতও হতে পারেনি। অন্যদিকে, নমশূদ্র জাতি আন্দোলনের স্নাতন নেতারা ভাগচাষিদের এই সংগ্রাম নিয়ে কখনই মাথা ঘামাননি, এবং বরাবরি দূরে সরে থেকেছেন, যদিও উত্তরবঙ্গের রাজবংশী নেতাদের মতো সরাসরি বিরোধিতা করেননি কখনও। এর থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যেন নমশূদ্র আন্দোলনে একটি বিভাজনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে সাম্প্রদায় কেন্দ্রিক আত্মপরিচয়

সময় গড়ে তোলা হয়েছিল তা এবার ভাঙতে শুরু করেছে। নতুন আত্মপরিচয় গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। অথবা তার নতুন সংজ্ঞা নিরাপিত হতে চলেছে।

১৮৭২ থেকে ১৯৪৭ সালের বাংলা নমশূদ্র আন্দোলনের এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে এই ধরনের আন্দোলন কখনই আগাগোড়া সম্প্রকৃতির থাকে না। এগুলির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আমরা বিভিন্ন স্তরের চেতনা, বিবিধ উদ্দেশ্য এবং নানান ধরনের কাজকর্ম লক্ষ্য করি, তবে এর সবকিছুই একই আচ্ছাদনে ঢাকা থাকে, তাই সাধারণ মানুষেরা যখন সম্প্রদায়ের সম্মানহানির কল্পিত ভয়, সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রোষ এবং অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিয়ে ভাবিত হয়, তখন তাদেরই মধ্যে অপেক্ষাকৃত বর্ধিষ্ণু গোষ্ঠী ধর্মীয় আচারগত মর্যাদার প্রতীক অথবা প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির সুবিধা-সুযোগ নিয়ে ভাবে। দুই দলই তাদের নিজস্ব উপায়ে সমাজে ক্ষমতার সম্পর্কে পরিবর্তন আনতে চায়। তাই এদের মধ্যে অনান্যজীবীত্বের সম্পর্ক থাকে, কারণ এই দুই দলই, সবসময় সচেতনভাবে না হলেও, জাতিভেদ প্রথার কর্তৃত্বকে ভাঙতে চায়। তবে এই অন্যান্যজীবীত্বের অর্থ কখনোই সমস্ত রকম সংঘাত অথবা পৃথকীকরণের সম্ভাবনার চিরতরে বিনাশ্টি নয়।

কিছুদিনের মধ্যেই একটা সময় আসে যখন নতুন করে স্থান পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। এটা বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় যখন তিনের দশক থেকে সরকার ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের যথার্থ প্রমাণের জন্য নিম্নবর্ণের আন্দোলনগুলি সমর্থন করতে শুরু করে। এই সময় এই আন্দোলনগুলির অনেক নেতাই দেশের সব থেকে ক্ষমতাপালী দল কংগ্রেসের সঙ্গে একাত্ম হওয়াই অনেক বেশি সুবিধাজনক বলে মনে করতে শুরু করেছিলেন। এই ধরনের একটা পরিণতি খানিকটা অবশ্যজীবীও ছিল, কারণ শেষ পর্যন্ত এই সব নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের ক্ষমতার আসনে বসানো, বৃহত্তর সমাজ থেকে নিজেদের পৃথক করে রাখা নয়। আর চারের দশকেই ভারতে রাজনৈতিক জাতির প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেস সর্বকম বাস্তবিক অর্থেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কংগ্রেসও ১৯৩৫-এর সাংবিধানিক সংস্কারে বিধিবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এইসব নেতাদের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল, ফলে একীকরণ হয়েছিল সহজতর।

অন্যদিকে নিম্নবর্ণের জনসাধারণও সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য তাঁদের অসমাপ্ত সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যায়। কখনও তার মাধ্যম ছিল জাত-ভিত্তিক সম্প্রদায়, যদিও একেই ক্ষমতার একমাত্র আধার বলে মেনে নিতে আর রাজি ছিলেন না তাঁরা। তাই কখনও তাঁরা জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন, কখনও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, আবার কখনও বা সরাসরি শ্রেণীভিত্তিক কর্মসূচি ও সংগঠনের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, যে আন্দোলন এক সময় শুরু হয়েছিল 'নিম্ন বর্ণের আন্দোলন' হিসেবে, তা একদিন বিভিন্ন পথে চলতে শুরু করে, কারণ জাতভিত্তিক আত্মপরিচয়কে বিভক্ত করে অথবা আচ্ছন্ন করে এমন অনেক নতুন আত্মপরিচয় গড়ে উঠতে অথবা সরব হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে তাই সমপ্রকৃতি অথবা একমুখীন প্রগতির খোঁজ না করে এই ধরনের জটিলতারই অনুসন্ধান করা উচিত। সেই অনুসন্ধানই উত্তর দিতে পারবে কেন অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া এইসব নিম্নবর্ণের প্রতিবাদ ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ক্ষমতার সম্পর্ককে ভেঙে ফেলতে সমর্থ হয়নি।

(ড. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলিংটন-এর ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনারত। বাংলার নমশূদ্র আন্দোলন ও উত্তর ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে জাতি, বর্ণ, বিভাজনের ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে তিনি বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও বই লিখেছেন। এই প্রবন্ধটি শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ দাশগুপ্ত ও ভোল্লান সেন্দেল (সম্পাদিত) Bengal : Development, Communities and States (১৯৯৪) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।)

কুমারী পূজা

প্রতিভা মণ্ডল

(১)

সকালে ঘুম ভাঙতেই কাবেরী টের পেলো মনের মধ্যে একটা কোকিল ডেকে চলেছে। সত্যি পা-রাখা জুন মাসের এই সবে শুরু বর্ষান্তেও। বর্ষাটা অবশ্য কাল মাঝ রাত অবধি আসেনি, যদিও আবহাওয়া দপ্তরের ঠিকঠাক পূর্বাভাসের প্রমাণস্বরূপ অদূরেই কোথাও বর্ষা নামার খবর ছিল দক্ষিণী জানলার হাওয়ায়, শতভিয়ার ফোনটা আসার বেশ খানিক পরে।

রাত দশটা দশ-পনেরো নাগাদ ফোন করেছিল শতভিযা। কাবেরী শুয়ে পড়েছিল যেমন সাধারণত পড়ে। উপড় হয়ে একটা বই পড়ে প্রস্তুতি নিচ্ছিল চোখের পাতা ভারী হওয়ার। পাতা সবে আধ-ভারী হয়েছিল, এমন সময় ল্যাভফোনটা বেজে উঠল। বিছানা ছেড়ে, অতএব, কাঠের বুক-শেলফটার কাছে যেতে হলো যার ওপরের তাকে ফোনটির বরাদ্দ আসন। কেননা, রাত দশটার কাছাকাছি ল্যাভফোনের কড়া বেজে ওঠা মানে, হয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা, নয়ত পুরনো কোন মানুষ যাকে মোবাইলটা কেনার পরে নম্বর জানানোর অবকাশ হয়নি। অনেকদিন পর শুনলে প্রিয় পুরনো মানুষের স্বর দ্বিগুণ মিঠে লাগে, ঘুমচোখেও। অতএব, রাত দশটার পর ল্যাভফোন ডাক দিলে এবং একেবারে ঘুমিয়ে না পড়লে, বুকের মধ্যে রক্ত কিষ্কিৎ দাপাদপি করে। উতল হয় জানতে — গুরুত্বপূর্ণ কথা, না প্রিয় পুরনো মানুষ?

(২)

রিসিভারটা কানে নিয়ে ‘হ্যালো’ বললে কাবেরী শুনতে পায় ও প্রান্তের মিঠে নারী কণ্ঠ — কাবেরীদি, শতভিযা বলছি। ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

শতভিযা! কাবেরী দারুণ খুশি। অনেক দিনের না হলেও, শতভিযা মোটামুটি পুরনো মানুষ কাবেরীর কাছে। আন্তর্জাতিক এক এনজিও-র ভারতীয় শাখার পূর্বাঞ্চলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। বছর সাতেক আগে মাস দুয়েকের জন্য

১২৬ 

কাবেরীর সংস্থায় কাজ করেছিল। অমিতের সঙ্গে কাবেরীর ভাঙব-ভাঙব দাম্পত্যের তখন দ্বিতীয় বছর। সেই দুঃসময়ে আলাপ হয়েও কেন যে তার চেয়ে বছর আষ্টেকের ছোট শতভিয়ার তাকে ভাল লেগে যায় তা ভেবে কাবেরী আজও অবাক হয়। সেই ভাল লাগার ফলস্বরূপ অন্য সংস্থায় গিয়েও শতভিযা তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, ক্রমশঃ নজর-কাড়া পদোন্নতি সত্ত্বেও। এমনকি কাবেরী যখন অমিতের কাছ থেকে চলে আসে শতভিযা তাকে মাস তিনেক আশ্রয় দিয়ে একটা নিরাপদ ঘর খুঁজে দেয় টালিগঞ্জে। সেই ঘরেই কাবেরী আজও আছে, ভাড়াটে-বাড়িমালিকের আইনি বন্দোবস্ত মেনেই। তারপর যা হয়—নিজের নিজের কাজের ভিন্নতা এবং চাপে যোগাযোগটা ক্রমে ক্ষীণ হয়। সময়ে-অসময়ে মনে পড়ে; কিন্তু ফোনটুকুও আর করা হয়ে ওঠে না। বস্তুত, প্রায় ছমাস হয়ে গেল শতভিয়ার সঙ্গে কাবেরীর কোনও কুশল বিনিময় হয়নি।

অতএব, শতভিযা ফোন করেছে শুনে কাবেরীর ঘুম-ভাবটা এক বাটকায় কেটে যায়। ও উচ্ছ্বসিত হয় ফোনে — আরে শতভিযা! অনেকদিন পর। না, না, ঘুমোইনি। কেমন আছ?

প্রত্যুত্তরে শতভিয়ার মিঠে স্বর — ভাল — ভাল। তুমি ভাল তো? কী করছ এখন? ওই এনজিও-তেই আছ?

কাবেরীর বুকের রক্ত আবার একটু দাপাদপি করে। শতভিযা কি তাদের অফিসে তাকে নেওয়ার কোন প্রস্তাব দেবে? যদি দেয়, সে তো এক পায়ে খাড়া লুফে নেওয়ার জন্য। তার এই অমনোমতো কাজের চাকরি থেকে যা মাইনে পায় কাবেরী, শতভিয়ার অফিসে তত মনোমতো নয় কাজে পেতে পারে কম করেও চার-পাঁচ গুণ বেশি। অবশ্য এখানে সে পার্ট-টাইম করে, শতভিয়ার অফিসে তার কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু, টাকা বেশি হলে অনেক কিছুই সামলে নেওয়া যায়। অতএব, শতভিযাকে বলে — হ্যাঁ, ওখানেই। আর কোথায় যাব বল? আমি তো তোমাদের মতো ইংরিজিতে ফ্লুয়েন্ট নই। আর, আমার কোনও কানেকশনও নেই, জানো।

শতভিয়ার প্রতিক্রিয়া — আচ্ছা ওসব কথা এখন থাক। শোনো, তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে। আগে বলো তো তোমার ডিভোর্সটা কি হয়ে গেছে?

১২৭ 

কাবেরী নিভে যায়। এই রাত দশটায় অনেকদিন পর শতভিয়ার এই প্রশ্ন তার ভাল লাগে না। এর চেয়ে শতভিষা যদি বলত শুধুমাত্র কুশল জানার জন্যই ফোন করেছে তাতেও তার যথেষ্ট ভাল লাগত। কিন্তু তার খারাপ লাগাটা সে শতভিষাকে বলতে পারে না। শতভিয়ার সঙ্গে তার সে সম্পর্ক নয়। বস্তুত, তার নিজের উদ্দেশ্যে করা ফোনে শতভিয়ার উষ্ণ সাড়াতেই সে ধন্য হয়ে যায়। আর আজ যখন শতভিষা যেচে ফোন করেছে, তাও যোগাযোগহীন প্রায় মাস ছয়েক বাদে, তখন কী করেই বা জানায় তার খারাপ লাগার কথা। অতএব, সে অনুতাপেই উত্তর দেয় — হ্যাঁ, দু'মাস আগে।

শতভিষা উচ্ছ্বসিত — ওহু, গ্রেট। শোনো, আমি তোমার একটা নতুন বিয়ের ব্যবস্থা করেছি।

কাবেরীর মাথার কোষগুলো হতচকিত হয় বিষ্ময়ে। তার অর্থাভাব-পীড়িত, আত্মীয় সহানুভূতিহীন জীবনে শতভিয়ার এমন অভাবনীয় স্বেচ্ছাসেবী সক্রিয়তায়। কাবেরী বিষ্ময় ওগরায় — বিয়ে! আবার! এই বয়সে!

— কেন, আপত্তি কোথায়? তোমাকে তো খুব প্রগ্রেসিভ আর সাহসী বলেই জানি। দ্বিতীয় বিয়ে করতে আপত্তি কোথায়?

— না, মানে...

— শোনো, ওসব 'না, মানে' ছাড়ে। তোমার সঙ্গে সব বিষয়ে মানানসই হবে এমনই পাত্রই দেখেছি।

কাবেরীর মোটেও বিশ্বাস হয় না তা। অমিতই যদি তাকে নিয়ে ঘর করতে না পারে, অন্য কোনও পুরুষ কি-পারবে? বয়সে তার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট অমিত তারই মতো ঠিক সাংসারিক ছিল না, এবং বিয়েটা তারা করেছিল যথেষ্ট প্রাজ্ঞ বয়সে — তার নিজের সঁইক্রিশ, অমিতের চৌত্রিশ। তবু বিয়েটা টিকল না। বছর পাঁচেক জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে অবশেষে কাবেরী বেরিয়ে এসেছিল। অবশ্য বেরিয়ে এলেও ডিভোর্স মামলা রুজু করেনি কারণ তা করার মতো অর্থ বা সময় তার ছিল না। এছাড়াও আশা ছিল যদি অমিত তার ভুলটা বোঝে এবং আবার...। কিন্তু, চলে আসার দ্বিতীয় বছরে কাবেরী যখন খবর পায় অমিতকে খুব

সম্প্রতিত এবং চকচকে এক মহিলার সঙ্গে নানা জায়গায় দেখা যাচ্ছে, তখন বুঝতে পারে তার আশা দুরাশা। অতএব, কিছু আশঙ্কা কিছু উদাসীনতা নিয়ে অপেক্ষায় থাকে অমিতের ডিভোর্স আবেদনের নোটিশ আসার। কিন্তু, আরও বছর দেড়েক কেটে গেলেও অমিতের দিক থেকে কোনও ডিভোর্স নোটিশ আসে না। কাবেরী নতুন খবর পায় অমিতের সঙ্গে ঘুরছে নতুন এক মহিলা। আগের জনের তুলনায় অনেক নীরসে। না, এ খবর পেয়ে কাবেরীর নতুন কোনও আশা-দাশা তৈরি হয় না। বস্তুত, তিন বছর একা থেকে সে তার স্বাধীনতাকে ভালবেসে ফেলেছিল। অমিত যদি ফিরেও আসত, কাবেরী তার স্বাধীনতা ছেড়ে আর যেতে চাইত কি-না সন্দেহ। অমিত অবশ্য ফেরেনি। পরিবর্তে আরও মাস ছয়েক পরে তার রুজু করা ডিভোর্স মামলার নোটিশই আসে। কাবেরী মামলাটা এক্সপার্ট হতে দেয়। ন'মাস লাগে।

অমিতের কাছ থেকে চলে আসার পর কাবেরী আর নতুন বিয়ের কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। ভারতের নিম্ন-মধ্যবিত্ত বর্ণভুক্ত কোনও নারীর চল্লিশোর্ধ বয়সে বিয়ে করার ভাবনা আকাশ-কুসুম। বিশেষত, একটা বিয়ের অভিজ্ঞতার পর। এছাড়া কাবেরী তার রূপ এবং বিস্তারিত দারিদ্র্য সম্পর্কে মধ্য কুড়ির পর থেকেই সচেতন। তবু অমিতের সঙ্গে তার বেশি বয়সে যে বিয়েটা হয়ে উঠেছিল সেটা ছিল সমাজ রীতির এক ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমের আয়ু সচরাচর বেশি হয় না। অমিত-কাবেরীর ক্ষেত্রেও হয়নি। শতভিয়ার কথা শুনে কাবেরী তাই নিশ্চিত যে, 'সব বিষয়ে মানানসই' পাত্রটি নিঃসন্দেহে স্কুল-গণ্ডির উপর দিকে পড়া এক বা দু-সন্তানসহ বিবাহ বিচ্ছিন্ন অথবা বিপত্নীক এক পুরুষ। এরকম এক পুরুষের দ্বিতীয় বিয়েকে কি তাঁর সন্তানরা ভাল চোখে দেখবে? দেখবে যে না এ তো জানা কথা। এই পর্যন্ত ভেবে কাবেরী আঁতকে ওঠে মনে মনে। না বাবা, ভাত-কাপড়ের স্বচ্ছল নিশ্চয়তার জন্য এমন বামেলায় সে পড়তে চায় না। এই বেশ আছে। অতএব, কাবেরীর স্বর অনাগ্রহী — শতভিষা, এ ব্যাপারটা বাদ দাও। অন্য কথা বলো।

প্রতিক্রিয়ায় শতভিয়ার মিষ্টি ধমক — আরে শোনো তো। শোনো, শোনো। শুনলেই তোমার পছন্দ হবে। পাত্র হলেন ভাস্করের বস।

ভাস্করের বস! শুনে চমকায় কাবেরী। ভাস্কর শতভিয়ার স্বামী। দ্বিতীয় স্বামী।

খুব ভাল মানুষ। ইঞ্জিনিয়ার। কাবেরীর চমকানোর কারণ আরও এক ভাল-লাগা। শতভিষা একা নয়, ঘটকালিতে জড়িয়ে আছে ভাস্করও।

অতএব, আর বাধা না দিয়ে কাবেরী শতভিষার 'পাত্র' বর্ণনা শুনতে থাকে—
নাম পিনাকপাণি কর। বয়স একম। অবিবাহিত।

কাবেরী আবার হৌচট খায়। না, বয়স জেনে নয়। বয়স তো ঠিক আছে। ছেলিশ বছরের কাবেরীর জন্য মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে এরকম বয়স একেবারে যথার্থ। কিন্তু, 'অবিবাহিত'? এটা কি করে সম্ভব একম বছর বয়সী বিবাহে ইচ্ছুক একজন পুরুষের পক্ষে! তবে কী প্রথম জীবনে প্রেমে আঘাতজনিত সম্যাস নিয়ে এখন আবার সংসারী হওয়ার বাসনা জেগেছে? কৌতূহলে কাবেরী শতভিষার বর্ণনায় বাধা না দিয়ে পারে না — সে কী? ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে একমতে অবিবাহিত। এই, তুমি আমার সঙ্গে মজা করছ না তো শতভিষা?

'আরে, ধৈর্য ধরে শোনো তো আগে। আমি মজা করব তোমার সঙ্গে। তা-ও এরকম একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে? কাবেরীদি, তুমি না হয়ে অন্য কেউ হলে একুশি কিন্তু ফোনটা কেটে দিতাম।' — শতভিষার স্বর ইথৎ ফুর।

কাবেরী অপ্রতিভ হয়। সত্যি, শতভিষা এরকম নিষ্ঠুর কোনও মজা তার সঙ্গে কেন, কারোর সঙ্গেই করার মানুষ নয়। সত্যি বলতে কী, শতভিষার মধ্যে মজা করার ব্যাপারটাই তেমন নেই। সর্বশী বা কাবেরীর নিজের মতো যখন তখন তো দূরের কথা, কোনও সময়ই প্রিয়জনকে আদর-মজা করে মুদু-খ্যাপানোর ব্যাপারটাও নেই। অতএব কাবেরী ক্ষমাপ্রার্থনায় বিনয়ী — স্যরি, তুমি এরকম করবে না জানি। বলো, বলো, যা বলছিলে।

শতভিষার গলায় আগের সুর ফিরে আসে এবং তার পরে এক নাগাড়ে প্রায় মিনিট দশেক ধরে যা বলে তা এরকম: ভদ্রলোক এতদিন বিয়ে করেননি দুটো কারণে। উনি বাড়ির বড় ছেলে। ওঁর নিচে দু-বোন, দু-ভাই। ওঁর বাবা মারা যান উনি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরিতে ঢোকান মাস দুয়েকের মধ্যেই। তখন, ভাই-বোনদের দায়িত্ব অনেকটা ওঁকেই নিতে হয়। দু-বোনের নিচে দু-ভাই হওয়ায় বোনদের বিয়ে দেওয়া, ভাইদের পড়ানো এইসব দায়িত্ব। সে-সব করতে করতে ওঁর বয়স হয়ে যায় চল্লিশ-বিরাল্লিশ। তার মধ্যেই ওঁর মেজ ভাইয়ে ও বিয়ে হয়ে

যায়। লাভ-মারোজ, এবং চাকরির সূত্রে তিনি দিল্লিতে সেটল করেন। এরপর ভাই-বোনদেরই কোন একজনের যোগাযোগে ওঁর একটা সখ্য প্রায় ঠিক হয়ে যায়। আর তখনই বাধা হয়ে দাঁড়ায় দ্বিতীয় এক কারণ — ওঁর বৃকে একটা বাধা ধরা পড়ে এবং ডাক্তাররা জানান ওঁর আয়ু অনিশ্চিত। উনি নিজেই তখন সখ্যটো ভেঙে দেন। এরপর বিয়ে হয় ছোট ভাইয়েরও। এবং তারও কিছুদিন পর ভদ্রলোক পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে একটা কল্যাণ কিনি একা থাকতে শুরু করেন। শতভিষাদের কল্যাণের থেকে মিনিট দশের ইটা-দূরত্বে ওঁর কল্যাণ। তো গত দু-বছরে ভদ্রলোকের আর কোন ব্যথা হয়নি বৃকে। দু-মাস আগে ভেলোরে চেক-আপ করে জানেন উনি সম্পূর্ণ সুস্থ। এরপর, শতভিষা আর ভাস্কর ওঁকে বলে বিয়ে করতে। গত মাসে। ভাস্করকে উনি ছোট ভাইয়ের মতো গ্রেহ করেন, এবং শতভিষা-ভাস্কর প্রায়শই—শনি বা রবিবার — ওঁকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করে। শতভিষার হাতের রান্না উনি পছন্দ করেন।

শতভিষা বলতে থাকে — এক মাস আগে আমরা তোমার কথা ওঁকে প্রথম বলি। কাল উনি রাজি হয়েছেন। কাল অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল বলে তোমায় আর ফোন করিনি। আজও সারাদিন নানা ব্যস্ততায় এর আগে আর হয়ে ওঠেনি। এবার বলো, তোমার কি আরও কিছু জানার আছে যা জরুরি? তা নাহলে, আজ এখন রাখছি। কাল ভোরেই আমায় সুন্দরবন রওনা দিতে হবে। ওখান থেকে ফিরে আবার ফোন করব। ঠিক আছে?

কাবেরী সন্ধিদ্ধ গলায় বলে — না ঠিক নেই।

শতভিষার গলায় তাড়াহুড়ো — কেন? কী প্রভ্রম?

কাবেরী দ্বিধাচ্ছিত — তোমরা কি ভদ্রলোককে বলেছ যে আমায় দেখতে ভাল নয়?

শতভিষা শাসনকারী বড় দিদির মতো বলে — স-ব, স-ব বলা। তোমার রঙ, তোমার মুখের গড়ন, হাইট, বিদ্যো স-ব। স-ব শুনে উনি রাজি হয়েছেন বলেই তোমায় বলছি। ঠিক আছে? এখন ছাড়ি?

— হ্যাঁ, ঠিক আছে।

— শুভরাত্রি। নিশ্চিন্তে ঘুমোও এখন।

(৩)

আর নিশ্চিন্তে ঘুম! ফোন রেখে বরং ওখানেই খানিক ধম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে কাবেরী। খুব একটা খারাপ খবরে যেমন হয়, তেমনই বেশ-একটা সুখবরেও মাথাটা কেমন ফেন কিছুক্ষণের জন্য নিঃসাড় হয়ে যায় তার। আর, বাস্তবিক পক্ষে একটা তো নয়, শতভিষার ফোন দু-দুটো সুখবর দিয়েছে কাবেরীকে। একটা সুখবর নিশ্চয়ই শতভিষার দেওয়া খবরটা। সঙ্গতিসম্পন্ন পাত্র ভ্রমলোক — নামটাই যা কেমন পুরনো ধরনের — কাবেরীকে দেখতে খারাপ জেনেও বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন। অন্য সুখবরটা এই যে এই স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর দুনিয়ার এক স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত মহিলা হয়েও শতভিষা তার জন্য এ্যা-ভো-টা ভাবতে পারে এই জানাটা। শুধু কি উদ্যোগী হয়ে বিয়ের ঘটকালি করা? তা তো নয়। তার মতো দেখতে খারাপ, চালচলোহীন এক মহিলার সঙ্গে স্বামীর 'কস'-এর বিয়ের ঘটকালি করা। ভাবা যায়!

ল্যান্ডফোনের কাছে দাঁড়ানো কাবেরীর মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে সাময়িক নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে এইসব কথায় মগ্ন হয়। আস্তে আস্তে শরীরেও সচলতা আসে। মশারির ভেতর বিছনায় ঢুকে বইটা বন্ধ করে কাবেরী বালিশে মাথা এলোয়। অফ করে বেডসুইচ। সে জানে, ঘুম চট করে কাছ না-ঘেসলেও, বইয়ের বাক্যরা এখন চোখ বেয়ে মাথার পৌছবে না। সেখানে এখন নানা ভবিষ্যমুখী হৃদয় মেধশরীর-চিকরকের অলস উড়ান। তাদের সঙ্গে বিছনায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে একসময় কাবেরী টের পায় দূরে কোথাও শুরু হয়েছে এই বর্ষার প্রথম বরিষণ। তৃপ্ত পৃথিবী তৃপ্তি ভরে পান করছে সেই বারিষ। শীতল হচ্ছে তার চাতক গর্ভ। কাবেরীর মনেও আজ দীর্ঘ শুখা দিনের পর প্রেমের বরিষণ-বোধ।

(৪)

ভাস্করের সঙ্গে শতভিষার প্রেম কীভাবে গড়ে ওঠে সে সম্পর্কে আজও কাবেরীর কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। কাবেরীর সঙ্গে শতভিষার পরিচয়ের আগেই শতভিষার বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় বড় সমস্যা ও ব্যাপারগুলোর সমাধান এবং সংগঠন সম্পূর্ণ। সুতরাং, ভাস্করের সঙ্গে শতভিষার প্রেমের

প্রারম্ভিক ব্যাপারটি সম্পর্কে কাবেরীর কিছু কৌতূহল থাকলেও সে কৌতূহল কাবেরী কখনও প্রকাশ করেনি। কাবেরী জানে, কোনও বুদ্ধিমতী সাংসারিক জ্ঞানসম্পন্ন রুচিশীল নারীই ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে যারা কাজে আসবে না, তাদেরকে ব্যক্তিগত সমস্যা বলার মতো মূর্খামি করে না। বিশেষত, সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাওয়ার পরে। শতভিষা যে কাবেরীকে বেশ কিছুটা মূল্য দেয় তার অন্যতম কারণ নিঃসন্দেহে অন্যের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কাবেরীর এই কৌতূহল প্রকাশ না-করার স্বভাবটি।

কিন্তু, কৌতূহল প্রকাশ না-করা মানে তো এই নয় যে কৌতূহল নেই বা ছিল না। তবে সেই কৌতূহল মেটাতে হয়েছে মূলত নানা প্রসঙ্গে শতভিষার নিজের টুকরো টুকরো উচ্চারণ এবং শতভিষাকে চেনে এরকম দু-একজনের দু-একটি মন্তব্য জোড়াতালি দিয়ে। গল্পটা তার পরে কাবেরীর কাছে যা দাঁড়িয়েছে তা এরকম : ভাস্করের সঙ্গে শতভিষার বন্ধুত্ব কিশোরী বেলা থেকে। সম্ভবত, প্রতিবেশী ছিল ওরা। ভাস্কররা জাতে সেনার বেনে; শতভিষার কায়স্থ, ব্রাহ্ম। শতভিষার স্লেটবেলা কেটেছে রীচিতে। রীচির এক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শতভিষা যখন ক্লাস নাইনে, শতভিষার বাবা ট্রান্সফার পেয়ে কলকাতায় আসেন। শতভিষা ভর্তি হয় পাঠভবনে। ভাস্কর তখন ক্লাস ইন্টেনে। ভাস্কর পড়াশোনার ভাল ছলেও, আগাগোড়া বাংলা মিডিয়াম।

ভাস্করের সঙ্গে শতভিষার একটা অনুরাগ সম্পর্ক তৈরি হয় শতভিষা ক্লাস ইন্টেনে পড়ার সময়। কিন্তু সেটায় ইতি পড়ে যায় শতভিষা যখন বট্যানি-অনার্সের প্রথম বর্ষের ছাত্রী, আর ভাস্কর ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দ্বিতীয় বর্ষে, এক বছর কেমিস্ট্রি অনার্সে বায় করার পর। ভাস্করের তিন দিদির মধ্যে দু-দিদির ততদিনে বিয়ে হয়ে গেছে; স্লেটদি পাস-কোর্সের তৃতীয় বর্ষে। ভাস্করের প্রতি শতভিষার টান লক্ষ্য করে শতভিষার উদ্বাসিক কায়স্থ বাবা শতভিষার অনিচ্ছা এবং স্ত্রীর আপত্তি সত্ত্বেও বিয়ে দিয়ে দেন এক স্বজাতীয় অভিজাত বাড়ির ছেলের সঙ্গে। শতভিষার পার্ট-ওয়ান পরীক্ষাটাও দেওয়া হয়ে ওঠে না।

কিন্তু, বিয়েটা শতভিষাকে তো বটেই, শতভিষার বাবাকেও স্বস্তি দেয় না। স্বামীর বিশেষ কিছু আচরণ মেনে নিতে না-পেরে বছর দুই-আড়াইয়ের মধ্যেই

শতভিষা স্বপ্নের বাড়ি থেকে চলে আসে। সঙ্গে বছর খানেকের মেয়ে। নতুন করে কলেজে ভর্তি হয় শতভিষা। অনার্স নেয় ইংরিজিতে, এবং এক রবিবার সকালে মেয়েকে নিয়ে এক ডাক্তারের কাছে যাওয়ার মুখে পাড়াতৈই দেখা হয়ে যায় ডাক্তারের সঙ্গে। শতভিষা আবিষ্কার করে তার প্রতি ডাক্তারের অনুরাগ তখনও অমলিন। মাঝের দু-আড়াই বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে ডাক্তারের ছোড়নির, এবং ডাক্তার নিজেও চুকেছে একটা ভাল বেতনের চাকরিতে। শতভিষা ডাক্তারের দ্বিপাক্ষিক অনুরাগ পরিণত হয় প্রেমে। শতভিষার বাবা এবার উদাসীন থাকেন ডাক্তারের সঙ্গে শতভিষার মেলামেশায়, এবং শতভিষার বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়ার আগেই গ্রন্থসিনে মারা যান। শতভিষার বিবাহ-বিচ্ছেদ পেতে চার বছর গড়ায়। বিবাহ-বিচ্ছেদের অল্প পরে ডাক্তার আর শতভিষা রেজিস্ট্রি বিয়ে করে দুই পরিবারের অতি অল্প কয়েকজন আত্মীয়জনের উপস্থিতিতে। ডাক্তার তার অফিসের লোকজনদের জন্য একটা ছোট পার্টি দেয়। কিন্তু একসঙ্গে সংসার পাতার জন্য ওদের আরও প্রায় বছর পাঁচেক অপেক্ষা করতে হয় কারণ, শতভিষাকে ডাক্তারের মা-বাবা একমাত্র ছেলের পুত্রবধূ হিসেবে মেনে নিতে পারেননি; অন্যদিকে ডাক্তারও রাজি হয়নি ঘরজামাই হতে। বিয়ের অল্প পরে শতভিষা একটি এনজিও-তে চাকরি পায়। মেয়েকে ভর্তি করে রীটির এক আবাসিক কনভেন্ট স্কুলে। মাসে অন্তত দু-বার ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েকে দেখতে যেতে থাকে। কাবেরীর সঙ্গে ফোন আলাপ শতভিষা-ডাক্তারের যৌথ টাকায় বুক-করা ফ্ল্যাটটা তৈরি হতে তখনও দু-বছর বাকি। নতুন ফ্ল্যাটে ওদের সংসার পাতার বছর খানেকের মাথায় কাবেরী চলে আসে অমিতের কাছ থেকে। পরের বছরই শতভিষা তার ক্লাস সেভেনে-ওঠা মেয়েকে কলকাতায় এনে ভর্তি করে দেয় লোরেটোয়।

(৫)

খোলা জানলায় বর্ষার রিমঝিম বালিকা-নাচ। ঘুম ভেঙে মনের মধ্যে কোকিলের গান শুনে শুনে সেই নাচে চোখ রাখে কাবেরী। এক খলক ঘাড় ফিরিয়ে দেওয়াল ঘড়িটা দেখে। অন্য সকালের চেয়ে এক ঘণ্টা পরে ঘুম ভেঙেছে। তবুও

তার বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। সুমিত্রাদি এলে উঠবে। সুমিত্রাদিকেই চা করতে বলবে।

সুমিত্রাদি যথাসময়ে আসে। খুশি হয় শুনে আজ আর রান্নার আনন্ডপাতি কুটতে হবে না। সুমিত্রাদিকে কাবেরী জানায়, বর্ষার প্রথম বৃষ্টিটা আরও খানিকক্ষণ বিছনায় গড়িয়ে উপভোগ করতে চায় সে। শুনে সুমিত্রাদি আধ-ফোকলা দাঁতে গ্রাসে, এবং কাবেরীর নির্দেশমতো চা করে কাবেরীকে দিয়ে নিজে খেয়ে বাসন মাজতে শুরু করে। বিছনায় বসে চা খেতে খেতে কাবেরী অফিসে ফোন করে জানিয়ে দেয় আজ দুপুরে ওখানেই ভাত খাবে সে।

সুমিত্রাদি চলে গেলে কাবেরী চান করে। একটা ম্যাগি সিদ্ধ করে সুমিত্রাদির তৈরি করে যাওয়া অমলেট দিয়ে প্রাতঃরাশ সারে। কর্মস্থানে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে হতে আকাশ কিঞ্চিৎ ধরে। ব্যাগে ছাতা ভরে কাবেরী সাড়ে-নটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ে। বাইরের কেউ টের পায় না তার ভেতরে কোকিলের কুজন। অফিসে অবশ্য ঘন ঘন হাই তুললে পাশাপাশি বসা সহকর্মীরা জিজ্ঞেস করে রাতে ঘুম হয়নি কি না, এবং না হয়ে থাকলে কেন হয়নি। কাবেরী বলে একটা উপন্যাস পড়তে পড়তে রাত হয়ে গিয়েছিল। ওরা আর কথা বাড়ানি। কাবেরীর বই-পড়ার নেশা সম্পর্কে ওরা ওয়াকিবহাল, এবং ওদের কারোরই সে অভ্যাস নেই।

(৬)

শতভিষার ফোন আবার আসে চার দিনের মাথায়। এবারে সঙ্গে আটটা নাগাদ। অফিস থেকে ফিরে ফ্রেশ হয়ে এক কাপ চা হাতে কাবেরী টিভি-টা খুলে বসেছিল। একটা হিন্দি সিরিয়াল দেখছিল অমনোযোগে। মনের মধ্যে প্রতীক্ষা ছিল শতভিষার ফোনের। প্রতীক্ষাটা আগের দিনের সঙ্গে থেকেই শুরু হয়ে গেছে। বাড়িতে থাকাকালীন গত চক্ষিখ ঘণ্টায় যে তিন-চারটে কল এসেছে ল্যান্ডফোনে, সব কটাতেই বুকের মধ্যে আকুলতা নিয়ে দৌড়ে গিয়ে রিসিভার তুলেছে। অফিসেও যে দুটো ফোন এসেছিল তাকে ডেকে দেওয়ার জন্য সেগুলোতেও রিসিভার ধরার আগে হুথপিনের স্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল। কেননা, সেদিন রাত্তিরে শতভিষাকে

মোবাইলের নম্বরটা আর দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

কাবেরী রিসিভার হাতে নিয়ে 'হ্যালো' বললে শতভিয়ার স্বর জানায় — শোনো, পরশুদিন পিনাকদাকে ডিনারে বলেছি। পরের সপ্তায় তোমাদের দুজনকে মিট করাতে চাই। ধরে রাখো শুক্রবার, ছটা নাগাদ। পার্কস্ট্রিটের কোনও এক রেস্টুরেন্টে। তুমি তোমার অফিস থেকে পাঁচটার মধ্যে আমার অফিসে চলে এসো। ভাস্কর পিনাকদাকে নিয়ে গারাসরি পার্কস্ট্রিটে চলে যাবে।

কাবেরী লাজুক গলায় বলে — বাবা, একদম পরের সপ্তাহেই!

— কেন, অসুবিধে আছে কোনও?

— না, মানে, একটু ভয়ভয় করছে আর কী! এভাবে তো কখনও ঠিক...।

— আরে, তোমরা দুজনেই দেখছি ভয় পাচ্ছ। উনি বলছিলেন, তুমি এতো বিদ্যেবতী, ডক্টরেট ডিগ্রি আছে, ওঁকে কি পান্ডা দেবে! আর, তুমি বলছ 'এভাবে তো...।' শোনো, আমি আর ভাস্কর তো সঙ্গে থাকব, না কী! তাছাড়া, মঙ্গল বা বুধবার তুমি আমাদের বাড়িতে আসবে, অফিস ছুটির পর। রাতে থাকবে। আমি ছোট হয়েও তোমাকে কিছু তালিম দেবো কাবেরীদি। তুমি বড্ড সব কথা সকাইকে অল্প আলাপেই বলে ফেল। আমি তোমায় শিখিয়ে দেবো পিনাকদাকে কী বলবে, কতটা বলবে। তুমি সেদিনও তোমার অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আমার অফিসে চলে এসো। এখন থেকে আমার সঙ্গে যাবে। আমি তোমায় সোমবার সন্ধ্যায় বন্ধফার্ম করব করে আসবে — মঙ্গল না বুধ।

কাবেরীর মনে পড়ে যায় শতভিয়াকে মোবাইল নম্বরটা জানানোর কথা। নম্বরটা দিয়ে একটু বিধাষিত স্বরে বাকি রয়ে-যাওয়া প্রশ্নটা করে — আচ্ছা, ভদ্রলোকের পড়াশোনার অভ্যাস কীরকম? শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কই-ই পড়েন? না সাহিত্য-টাহিত্য পড়ার অভ্যাসও আছে? বাধা দেন না তো রিসার্চ-গ্রান্ট পেয়ে বা না-পেয়ে আমি যে গবেষণামূলক লেখালিখিগুলো করি সেগুলো চালিয়ে যাওয়ায়তো?

শতভিয়ার প্রতিবেদন — দ্যাখো, উনি যে খুব সাহিত্য-টাহিত্য পড়েন তা নয়। তবে, পড়েন। পছন্দ করেন ভ্রমণ-সাহিত্য এবং ডিটেক্টিভ গল্প। অবশ্যই রিসার্চ

পরতে দেবেন। তোমার সব কিছু ওঁকে বলেছি। ভাস্কর তো আমার চেয়েও এক পাঠি বাড়া। ও বলেছে, 'কাবেরীদিকে শুধু একটু ঠিকঠাক খেতে. দেনে। দেখবেন, দিনরাত বই পড়া আর লেখাজোখার মধ্যেই ডুবে আছে। আপনাকে কোনও বামলো দেবে না।' শুনে অবশ্য পিনাকদার মুখ একটু কাচুমাচু হয়ে গিয়েছিল। আমি সেটা মানেজ করে দিয়েছি। ভাস্করকে বকেছি, আর পিনাকদাকে বলেছি 'কাবেরীদি শুধু পড়াশোনা করতেই ভালবাসে না, ভালবাসে ঘর সাজাতেও।' সেটা শুনে বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ওঁর মুখ।

শতভিয়ার এই আশ্বাসে, শতভিয়া দেখতে পায় না, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল কাবেরীরও মুখ।

(৭)

পরের সোমবার অফিস থেকে ফেরার পথে আকাশ কোমর বেঁধে কলকাতাকে ধুতে নামে। বাস থেকে নেমে বাড়ি ফেরার মিনিট দশেকের হাঁটা পথে ছতার সাধ্য হয় না কাবেরীর কাকভেজা আটকায়। বাড়ি ফিরে গরম জলে চান সেরে ধাতু হয় সে। চা তৈরি করে নিয়ে টিভি চালিয়ে বসে। পাশাপাশি পড়ে খবরের কাগজের উত্তর-সম্পাদকীয়। নটা বাজলে ডিনার সারে। এবং মনের মধ্যে কুহতান নিয়ে শতভিয়ার ফোনের অপেক্ষায় টিভি দ্যাখে রাত এগারোটা পর্যন্ত। অন্য রাতের মতো ঘুমোনের আগে মোবাইলটা অফ করে না। ল্যান্ডফোনটা তো জেগেই থাকে সারা দিনমান। সে নিশ্চিত, আজ আসেনি বটে, কাল সকাল কিম্বা বিকেলে শতভিয়ার কোন আসবে।

কিন্তু পরের দিনও সারা নির্যুৎ সময় জুড়ে শতভিয়ার ফোন আসে না। রাত এগারোটার পর কাবেরী শুয়ে পড়লেও ঘুম আসতে দেয়ী হয়। আশঙ্কা করে খায় কোনও তালিম ছাড়া শুক্রবারে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপের সময় কী বলতে কী বলে ফেলবে। উন্টোপান্টা বলার ফলে সম্বন্ধটা না কেঁচে যায়। কিন্তু, একে একে বুধ, বৃহস্পতি এমনকি শুক্রবারও আসে এবং চলে যায়। শতভিয়ার ফোন আসে না। কাবেরীর লজ্জা করে নিজে থেকে ফোন করতে। যদি তাতে কাবেরীকে হাংলা ভাবে ওয়া। অতএব, কাবেরী ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু আশায় প্রতীক্ষা করে যায়—

ছদ্ম, সাতদিন, অটল। দু-সপ্তা, তিন সপ্তা, চার সপ্তা...। তারপর বোঝে ফোঁটা আর আসবে না।

(৮)

সাত-আট মাস পরের কথা। এক রবিবার সম্ভ্রমকাল ইছাপুর থেকে ট্রেন ফিরছিল কাবেরী। দুপুরে গিয়েছিল সূচদ্রার বাড়ি। সূচদ্রা দুপুরে তো খাইয়েছিলই, আবার রাতের খাবারটাও ছাঁদা বেঁধে দিয়ে দিয়েছিল। সূচদ্রার দু-কামরার ছোট স্টেশনের লাগেয়া। বাসের চেয়ে ট্রেনে যাতায়াত সুবিধাজনক কাবেরীর টালিগঞ্জের বাস থেকে। কিন্তু, সেদিন রবিবার হওয়ায় যাওয়ার সময় বাসে শেয়াসদা পর্যন্ত গিয়ে ট্রেন ধরেছিল। ফেরার সময় প্রান ছিল দমদমে নেমে মেট্রো ধরব। সূচদ্রা ট্রেনে তুলে দিতে স্টেশনে এসেছিল। প্রাটফর্ম ট্রেন এসে গিয়েছিল ওরা মহিলা-কামরার জায়গায় পৌঁছনোর আগেই। তাড়াতাড়ি করে একটা জেনারেল কামরাতাই উঠে পড়েছিল কাবেরী। দিনের বেলায় মতো ঠাসা-ভাঁড় ছিল না। ট্রেন ছেড়ে দিলে এবং সূচদ্রা দুটির আড়াল হলে সে একটু ভেতরে ঢুকে দাঁড়ায়। দেখতে চেষ্টা করে কোথাও একটু কসার ঠাই অনামন পড়ে আছে কিনা। হঠাৎ শুনতে পায় — ‘কাবেরীদি, এদিকে এসো।’ পুরুষ-কণ্ঠ। স্বরের অনুসরণে কাবেরী তাকিয়ে দেখে ভাস্কর আর শতভিষা হাসিমুখে দেওয়াল-ঠেসা এক সীটে, জানলার ধারে। কাবেরী একটু চমকায়, কিন্তু হেসে ওদের দিকে এগিয়েও যায়। ভাস্কর উঠে দাঁড়িয়ে কাবেরীকে কসতে বলে। কাবেরী কসতে কসতে জিজ্ঞেস করে — কী ব্যাপার, তোমরা কোথেকে?

শতভিষা কাবেরীর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কাবেরীকে জিজ্ঞেস করে একই প্রশ্ন। তারপর ‘এখনও মার্চ পড়েনি, কীরকম গরম-গরম ভাব’ ধরনের দু-একটা ভাসা ভাসা কথায় আড়ম্বল্য কাটিয়ে বলে — তুমি নিশ্চয়ই আমাদের ওপর খুব রেগে আছ। খুব খারাপ ভাবছ আমাদের।

কাবেরী এর উত্তরে কী বলবে ভেবে পায় না। কুঠাসহকারে বলে — ছেড়ে দাও। ভদ্রলোকই নিশ্চয়ই কোনও কারণে রাগিছন। তা-ই তোমরা...

ভাস্কর বলে ওঠে — ‘হ্যাঁ, কাবেরীদি’। তারপর শতভিষার দিকে তাকিয়ে বলে

১৩২ ৫৩২৮

— দেখলে, আমি তোমায় বলেছিলাম না কাবেরীদি ঠিক বুঝবে। ফোন করে ওখনই বললে কাবেরীদি মোটেও আমাদের ওপর রাগ করত না।

শতভিষা কুণ্ঠিত গলায় কাবেরীকে বলে — ‘আমার ভীষণ লজ্জা করছিল কাবেরীদি! যে কারণে...’, এ পর্যন্ত বলে ও একবার ভাস্করের দিকে তাকিয়ে আবার কাবেরীর দিকে ফিরে বলে — ‘আমি আসলে ভাবতেই পারিনি কারণটা।’

ভাস্কর এই সময় শতভিষাকে ধামিয়ে দেয় আশপাশের লোকের কথা ভেবে। বলে — ‘কাবেরীদি, তুমি তো টালিগঞ্জ যাবে?’

কাবেরী বলে—হ্যাঁ, দমদম থেকে মেট্রো ধরার প্রান আছে।

ভাস্কর একবার কাবেরী একবার শতভিষার দিকে দৃষ্টি রেখে বলে—ছেড়ে দাও কাবেরীদি। আমাদেরও সেরকম প্রান ছিল। এখন প্রান বদলে চলে, আমরা কং সবাই শেয়াসদায় নমি। ওখান থেকে টালিগঞ্জ নিয়ে তোমায় রাসবিহারিতে ছুপ করে আমরা গড়িয়াহাট কিরব। কথাগুলো টালিগঞ্জে কলাই ভাল।

কাবেরী ঘাড় নাড়ে — হ্যাঁ।

শতভিষা কেনে একটু সময় পেয়ে হাঁক ছাড়ে — ভাবলে তো খুবই ভাল হয়। তাছাড়া, কাবেরীদি, তোমার অসুবিধে না থাকলে তুমি তো আমাদের বাড়িও যেতে পার আজ। কাল অফিস থাকলে আমাদের ওখান থেকেই যেও।

কাবেরীর আত্মসম্মানবোধ অবশ্য তাতে সায় দেয় না। ওই ঘটনার পর ওদের থেকে টালিগঞ্জ লিফট নিতে রাজি হয়েই এই-ই ঢের। বাড়িতে যাওয়াটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। অতএব, ও বলে — অফিসের কিছু কাগজ-পত্র বাড়িতেই আছে। সেগুলো না নিলে...। তাছাড়া কাজের দিকিকও বলা নেই।

শেয়াসদা থেকে রাসবিহারি পর্যন্ত টালিগঞ্জ সময়টুকুতে শতভিষা আর ভাস্কর মিলে যা বলে তা এরকম: কাবেরীকে শতভিষা বৈদ্যি শেষ ফোন করেছিল, তার পরের শনিবারই পিনাকবাবু ওদের আমন্ত্রণে ডিনারে এসেছিলেন। উভয়ত উদ্দেশ্য ছিল কাবেরীর সঙ্গে ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ করানোর ব্যাপারটা সিনাকবাবু চূড়ান্ত করা। খাবার টেবিলে গরম খাবারের সুত্রে মিশে শুরু হয়েছিল মিষ্টি কথা। যাওয়াটা যখন মক পথে, কাবেরীর টালিগঞ্জে এক ঘর ডাড়া নিয়ে থাকার প্রসঙ্গ

১৩২ ৫৩২৮

ওঠে। শতভিষা দুঃখ প্রকাশ করে বলে মাস দুয়েক আগে কাবেরীর বিবাহ-
বিচ্ছেদের কথা। শুনেই না কি পিনাকবাবু আহত-বিস্ময়ে খাওয়া থামিয়ে বলেন—
উনি ডিভোসী? এটা তো তুমি আমাকে বলনি ভাস্কর। আমি তো জনতাম
ভদ্রমহিলা কোনও কারণে আমার মতোই অবিবাহিত।

ওঁর এই উচ্চারণেও শতভিষা না-কি প্রথমে বুঝতে পারেনি উনি কী বলতে
চাইছেন। শতভিষার মনে হয়েছিল উনিও বোধ হয় ওঁদের মতো কাবেরীর প্রতি
সহানুভূতি থেকেই ভাস্করকে একটু স্নেহের বকুনি দিচ্ছেন। ভাস্করও সেরকম
ভেবেছিল। শতভিষা তাই বলে উঠেছিল — সত্যি বলতে কী, আপনাদের আলাপ
হয়ে যাওয়ার পরে ব্যাপারটা বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু, কথায় কথায় এখনই মুখ
দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমরা ভেবেছি কাবেরীদের ব্যক্তিত্বটা যদি আপনি পছন্দ
করেন — দুজন উচ্চশিক্ষিত মানুষের একসঙ্গে থাকার পক্ষে যা জানা জরুরি—
তবেই ব্যাপারটা বলব। কাবেরীদের আগের বিয়েটা একেবারেই মিসম্যাচ ছিল।
একটা দুর্ঘটনা বলতে পারেন।

শতভিষার এই কথা শুনে পিনাকবাবুর মুখ নাকি বেশ গম্ভীর হয়ে উঠছিল।
উনি আর খাচ্ছিলেনই না। সেটা দেখে ভাস্কর কথার ব্যটনটা শতভিষার থেকে
নিয়ে একটু নার্ভাস স্বরে বলে — কাবেরীদের সঙ্গে আলাপ হলে আপনার ভাল
লাগবে; খুব সরল। সংসারের মারপ্যাচটা ঠিক বোঝেন না...

পিনাকবাবু না-কি তখন স্নেহের গলায় বলেন — একটা বিয়ে বা ডিভোসকে
খুব ক্যাজুয়াল ব্যাপার মনে হয় তোমাদের? এক ডিভোসি মহিলার সঙ্গে তোমরা
আমার বিয়ের সম্বন্ধ করছ।

ভাস্কর-শতভিষা এতক্ষণে, পিনাকবাবু চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার
পর, বুঝতে পারে পিনাকবাবুর গম্ভীর হয়ে-ওঠা মুখাবয়বের যথাযথ কারণ। পাত্রী
হিসেবে ডিভোসি মহিলা ওঁর পছন্দ নয়। এবার, শতভিষাও নার্ভাস বোধ করে।
আত্মপক্ষ সমর্থনের স্বরে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে — আসলে, আমি
ভেবেছিলাম ভাস্কর আর আমার ব্যাপারটা আপনি যেহেতু জানেন...। মানুষের
জীবনে তো...

এ পর্যন্ত শুনে পিনাকবাবু তাঁর মাথাটা নীচু করে বাঁ-হাতে কপালটা টিপে
ধরেন। কিছু বলেন না, নতুন করে কোনও গ্রাসও মুখে তোলেন না। ভাস্কর তখন
শতভিষাকে বকে — থাক, থাক এখন ওসব কথা।

শতভিষা চুপ করে যায়। একটু আগের উষ্ণ পরিবেশটা তেতো হয়ে ওঠে।
অনেক অনুন্নয় করে কোনক্রমে ওরা পিনাকবাবুকে খাওয়া শেষ করায়।
নিজেদেরও খাওয়া ঠিক মতো হয় না। হ-সাত রকমের সুস্বাদু পদ সবই বিশ্বাদ
ঠেকে। তারপর খাওয়া শেষে পিনাকবাবু চলে গেলে ভাস্কর-শতভিষার মধ্যে
তাদের আত্মশুকির লজ্জা এবং বিনষ্ট পরিকল্পনার শোকের বিনিময় চলে নেভা-
গলায়।

আধঘন্টা পরে পিনাকবাবুর ফোন আসে ভাস্করের মোবাইলে — ভাস্কর,
তোমাদের কাছে কি পরিষ্কার যে, আই অ্যাম নট গোয়িং টু মারি এ ডিভোসী অর
এ উইভো?

ভাস্কর তার শাশ্বত নম্রতায় বলে — হ্যাঁ, স্যার। ভুল হয়ে গেছে।

পিনাকবাবু বলেন—‘দ্যাট ইজ ওয়াইজ অব ইউ। ওডনাইট। সোমবার অফিসে
দেখা হবে’ এবং ভাস্করকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ফোন কেটে দেন।

দিন চলে যায় একের পর এক। শতভিষার হাত ওঠে না কাবেরীর নম্রতা
টেপায়।

(৯)

পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো শতভিষার কাবেরীকে রাসবিহারিতে নামিয়ে দেয়। ওখান থেকে
বাসে টালিগঞ্জে আসে কাবেরী। রাতহান সেসে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখে সুচন্দ্রার ছাঁদা
বেঁধে দেওয়া খাবার। এক কাপ দুধসহ দুটো মাত্র বিস্কুট খায়, এবং বিছানায় গা
তেলে দেয়। খুব যে বেদনা বোধ হচ্ছে তার তা নয়। এ বিষয়ে বেদনা বোধের
আয়ু তো কবেই ফুরিয়েছিল। সেই ফোন না-আসার মাস খানেকের মধ্যেই কাবেরী
তার প্রতিদিনের অ-রোম্যান্টিক সংগ্রামী জীবনের অভ্যন্তরীণ ফিরে যেতে
পেরেছিল শোক-রেশহীনভাবেই। কিন্তু তার মধ্যে একটা অপমান বোধ রয়েছে
গিয়েছিল, তা ভাস্কর শতভিষার কাছে স্বীকার না করলেও। অপমানবোধটা

পিনাকবাবুর কারণে নয়, শতভিয়ার ফেন না করার কারণে। আজ সেই বোখটা থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারছে। ক্ষমা করতে পারছে শতভিয়াকে তার আন্তরিক লজ্জা দেখে। কিন্তু একই সঙ্গে অবাকও হচ্ছে ভেবে যে এত সাংসারিক জ্ঞানসম্পন্ন শতভিয়া এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন ভুলটা করল কী করে! এরকম বিদ্রী় একটা অভিজ্ঞতা হওয়ার আগে পর্যন্ত ও জানত না বিয়ের বাজারে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাহিদা। ভাস্কর তাকে এক কন্যাসহ বিয়ে করেছে বলে সে ধরে নিয়েছিল পিনাকবাবুও বিধা করবেন না ডিভোর্সি এক মহিলাকে বিয়ে করতে। জানত না ভাস্কর এক ব্যতিক্রমী পুরুষ। অথবা, ভাস্করও হয়ত নয়। তাকে ব্যতিক্রমী করেছে নানা প্রাসঙ্গিক শর্ত। তাকে ব্যতিক্রমী করেছে প্রথম প্রেমের টান। ব্যতিক্রমী করেছে জাত, অভিজাত্য ও শিক্ষা-মাধ্যমের বিচারে শতভিয়ার উচ্চতর বর্ণীয় পরিচয়। জানত না লোভনীয় শর্তের অনুপস্থিতিতে অনুঢ় যে কোনও পুরুষই — তা সে শারীরিকভাবে কুমার থাকুক চাই-না-থাকুক — প্রথম বিয়ে করার সময় এক কুমারীকে চায়! একেবারে এক নিটোল কুমারী।

এবং কাবেরী কুমারী নয়। কোনও বিস্তবান, উচ্চশিক্ষিত অনুঢ় পুরুষ আসবে না বিবাহের অর্চনায় তাকে অর্চিত করতে। কাবেরী মনে মনে ক্ষোভ জানায় শতভিয়াকে — হায়, শতভিয়া! যে সাংসারিক জ্ঞানটুকু আমারও আছে তা তোমার মতো প্র্যাকটিকাল নারীর ছিল না! যে সমাজের সবচেয়ে বড় উৎসবের অঙ্গ ‘কুমারী পূজা’ নামের এক আচার, সেই সমাজে ডিভোর্সি কোনও মহিলার সম্বন্ধ করার শুরুতেই তো বলা উচিত — ‘জানেন, আমাদের জন্য এক ডিভোর্সি মহিলা আছেন যিনি...’

হ্যাঁ, সবচেয়ে আগে ‘ডিভোর্সি’ কথাটা বলা, তারপর বাকি সব কথা।

বা-কি সব কথা তারপর।

অনুসন্ধানী

সবসাচী গোস্বামী

আমাকে আপনারা সবাই পাগল ভাবেন কিন্তু বিশ্বাস করেন স্যার, আমি কিন্তু পাগল নই। আমি একজন সন্ধানী। আমি খুঁজে চলেছি সেই বাড়িটা... সেই যে রঙচটা একতলা হলুদবাড়ি। চারপাশে আগাছার জঙ্গল। পূব দিকে রয়েছে সেই জামরুল গাছ আর সেই বিরাট নিম গাছটা। যে নিমগাছে পাতা দিয়ে ঠাকুমা আমাকে প্রায়ই নিমবেগুন রন্ধে ঝাওয়াত। ... আমি না সেই বাড়িটা আর খুঁজে পাচ্ছি না! কত খুঁজছি। খুঁজেই চলেছি। কিন্তু কী অদ্ভুত! দুনিয়া থেকে আস্ত একটা বাড়ি হওয়া হয়ে গেলো মশাই!

আপনারা আমাকে পাগল ভাবেন। কিন্তু কেন বলুন তো? কী পাগলামি দেখলেন আমার মধ্যে? না-হয় একটু চেয়ে চিনতে বিড়ি খাই! পরসাও যে চাই না, তা অবশ্য নয় - কী করব বলুন মশাই? পেটের জ্বালা যে বাগ মানেনা - তখনই তো... এমনতে তো খেটেও খাই। এই যেমন মানিকতলা বাজারের দিকটা যখন থাকি, তখন ভোর ভোর উঠে বাজারের ব্যাপারীদের হাতে হাতে কত কাজ করে দিই। ভান থেকে বুড়ি উঠিয়ে দিই। নামিয়ে দিই। বাজার শেষে দোকানগুলো বারপোছ করে দিই বিস্তর। বিনিময়ে কী এমন পাই! কখনো ঘুগনি - রুটি। মাঝে মাঝে মাটির ভাড়ে দু'একবার চা। আর কটা গাঁজা ভরা বিড়ি। এই তো! তবে হ্যাঁ! হরিণা হাটে সপ্তাহের যে দুদিন যাই - পশ্টুদার চায়ের দোকানের বাসন কোসন, কাপ, প্লেট, মাজার কাজে সে - দুদিন আমার হাতে দু'চার পরসা আসে। পশ্টুদা লোক ভালো, দিনের শেষে যে ঘুগনিটা আলুরদমটা বাচে - সেটা আমায় দিয়ে দেয়। সপ্তাহের স্নেহ ওই দুই দিনই পশ্টুদার দয়ার আমার কপালে একটু ভাত জোট। সপ্তাহের ওই দুই দিন, যেখানেই থাকি না কেন, আমি ঠিক হরিণা হাটে চলে যাবই। আরে মশাই কি বলব, বলতে লজ্জা করে, ওইখানে খালের ধারে যে পটলার মা আছে না। আরে হ্যাঁ - হ্যাঁ! ঠিকই ধরেছেন কাগজ কুড়োয়। মাতাল ভোলার বউ! ওর সাথে না আমার একটু ইন্টুপিটু আছে। আরে! না - না! তেমন বলার মতো কিছু নয়। ওই একটু চোখা চোখি। হসা

হাসি। ওই পর্যন্তই। তবে পশুটা কিন্তু ব্যাপারটা টের পায়। মাঝে মাঝে বকুনিও দেয়। বলে, 'দেখ তো ভদ্রলোকের ছেলে বলে মনে হয় রে উদয়, পেটে পেটে এসব বুদ্ধিও বুঝি হচ্ছে আজকাল' ... ও হ্যাঁ! একটা কথাতো বলাই হয়নি এতক্ষণ - এখানে, অর্থাৎ হরিশার হাটে না, সবাই আমাকে উদয় বলে ডাকে! সপ্তাহের ওই দুটো দিনই উদয় হই কিনা! তাই ভালবেসে পশুটাই প্রথম এ নামটা আমায় দিয়েছে। পশুটা আসলে ওড়িয়া, তবে কয়েক পুরুষ ধরে কলকাতায় থেকে বাজলি হয়ে গেছে। আমাকে ভালবাসে বলে আমি সপ্তাহে দু'দিন ওর কাছে এখানে কাজ করতে আসি। পটলার মা, মালতীর টানেও অবশ্য আসি। ওরা এখানে সবাই আমাকে উদয় বলেই ডাকে। আমি একজন নামহীন, বলতে পারেন বন্ধুত্বময় বিনীত মানুষ। কারো চোখে গাঁজাখোর। কারো চোখে পাগল। কারো চোখে ভবধুরে। আমার একক জায়গায় একেক নাম। একেক পরিচয়। হরিশা হাটে যেমন লোকে আমায় ডাকে উদয় বলে, তেমনই আমার মানিকতলা বাজারে সবাই আমায় ডাকে জংলু বলে। আমার যেহেতু মাথা ভর্তি চুল দাড়ির জঙ্গল, তাই জংলী থেকে জংলু হয়ে গেছি আবার শিয়ালদা ফ্লাইওভারের নীচে যখন থাকি, ওখানকার ভিখারীগুলো আমায় মরণ বলে ডাকে। প্রথম প্রথম যখন ওখানে ভিক্ষা করতে যেতাম আমাকে দেখে একবার এক বুড়ি বলেছিল, 'আ! মরণ, নিজেদেরই জোটে না কোথেকে এক নতুন আপদ জুটলো দেখো দিকিনি!' প্রথম প্রথম ওরা আমাকে দেখলেই তেড়ে আসত। মারধরও করত। আস্তে আস্তে আমি ওদের গা-সওয়া হয়ে গেলাম। এখন দূর থেকে ওরা আমাকে দেখলেই বলে, 'ও বুড়ি তর মরণ আসছে!' তাই শিয়ালদা ফ্লাই ওভার চত্বরে আমি মরণ।

ওদের নির্দিষ্ট কাজ আছে। এলাকা আছে। আমার কোনও নির্দিষ্ট কাজও নেই, এলাকাও নেই। আমি হলাম উড়ান পনছি। আজ শিয়ালদা তো কাল গড়িয়া; পরশু অশোকনগর তো তারপর দিন ঘুটিয়ারি শরিফ। রাতের আস্তানা বলতে কখনো ফুটপাথ তো কখনো প্ল্যাটফর্মের ধার, কখনো হয়ত বা ফুটব্রিজ - যখন যেমন জোটে আর কি। তবে সপ্তাহের ওই দু'দিন বেশ্পতিবার আর রোববার। আমি ঠিক চলে যাবই। হরিশার হাটে। পশুটার টানে। পটলার মা মালতীর টানে।

আমি আসলে একজায়গায় থিতু হয়ে বসতে পারি না। কেনো জানেন তো? আসলে আমি খুঁজি সেই বাড়িটা, বর্মনদের পুকুর পাড়কে বাঁ দিকে রেখে যে রাস্তাটা গেছে - নাক বরাবর তার কিছুটা গিয়ে ডান দিকে পড়বে একটা ছুঁতম গাছ - সেদিকে বাঁক না নিয়ে, আবার বাঁ দিকে গেলে পরবে একটা মাঠ - মোঠো পথ ধরে কিছুটা গেলে পড়বে ডানদিকে একটা পানের বরজ - পান বরজ ছাড়িয়ে আর কিছুটা এগোলেই পড়বে আমাদের গ্রাম। গ্রামের সেই রাস্তাটা হলুদ বাড়িটা। যার চারপাশে আগাছার জঙ্গল। পূর্বে জামরুল গাছ। নিম গাছ। যে নিম গাছের কচি পাতা ভেজে নিম বেগুন রন্ধে খাওয়াতো আমার ঠাকুমা। উঠানে মা বড়ি শুকোতে দিত। আর আমি লাঠি হাতে পাহারা দিতাম যাতে কাকপক্ষীও তা না ছুঁতে পারে। ... কি আশ্চর্য! একটা আস্ত বাড়ি। নিমগাছ। জামরুল গাছ। মা। ঠাকুরমা। সবই কিনা বেমালুম গায়ের হয়ে গেলো এই পৃথিবী থেকে। এক পাগল আছে। আমার বন্ধু। শিক্ত পাগল। সে বলে সুকুমার রায়ের কথা। ছিল বেড়াল, হয়ে গেলো রুমাল। ছিল গ্রাম, পুকুর, শস্য ক্ষেত হয়ে গেলো সিমেন্ট কারখানা। ধুর মশাই! তাও আবার হয় নাকি!

আমি কি করে কলকাতা শহরে চলে এলাম জানি না। আবার আবার মনে পড়ে... অনেক ভিড়, পুলিশ লাঠি চার্জ... আর কিছু মনে পড়ছে না। ভুলে গেছি। সবার কি সব কিছু মনে থাকে! দাদুরও তো মাঝে মাঝেই চশমা হারাতো। কোথায় রেখেছে মনে করতেই পারতো না। ঠাকুমা হরিসভায় গিয়ে হারিয়ে ফেলতো লাঠি, জুতো। মা তো কতদিন ভুল করে দুরার ডালে নুন দিয়ে দিতো। বাবা তো একবার তাস খেলতে গিয়ে বাজারে সাইকেলটাই ভুলে ফেলে চলে এলো! পাওয়াই গেল না। সব মানুষের মধ্যেই ভুলে যাওয়ার কম বেশি রোগ থাকে। তাহলে শুধুমাত্র আমার ভুলে যাওয়াটাকেই সবাই পাগলানো ভাববে কেন? বলুন না মশাই, আমি কি খুব ভুল বলাছি?

তবু তো আমি চেষ্টা করছি ভুলে যাওয়া বাড়িটাকে খুঁজে বার করতে। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না যে... মাঝে মাঝে মাথায় এতো যন্ত্রণা হয় না... তখনই ভেসে ওঠে টুকরো টুকরো আবার ছবিগুলো মানুষের ভিড়, পুলিশ, লাঠিচার্জ... এই সব... আচ্ছা বাড়িটা না হয় পাওয়া গেলো না, কম সে কম বর্মনদের পুকুরটা

টুকরো কথা কানে আসছিল। আশ্বে আস্তে দেখলাম ভিড়টা পাতলা হতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত আমি সেদিন কোনও মতে পিঠ বাঁচিয়ে মানে মানে কেটে পড়তে পাড়লাম।

না মশাই! বিশ্বাস করুন আমি পাগলও নই। ভবঘুরেও নই। চোরও নই। খোঁচরও নই। আমি একজন সন্ধানী। যে প্রতিদিন খুঁজে ফেরে শাঁপলা ফুলে ভরা একটা পুরুর। তার নাম বরাবর গেলে পড়বে একটা ছাতিম গাছ। একটা মাঠ। মেঠো পথ। পান বরজ। একটা রঙচটা হলুদ একতলা বাড়ি। নিমগাছ। জামুল গাছ। যে বাড়ির ঠাকুমা প্রতিদিন নিম ভেজে, নিম বেগুন রেখে বসে থাকে সবার জন্য। মা বাড়ি শুকোয় উঠোনে। ঠিক সেই বাড়িটাই আমি খুঁজছি। একটুও এদিক ওদিক হলে হবে না। যেখানে আছে আমার মার একটা লোহার ট্রাক। যাতে রয়েছে আমার ডায়েরি। আমার ছেঁড়া দিনলিপি। আমার হারানো অতীত...

তো পাওয়া যাবে! যে পুরুরটায় ভেসে থাকত শাঁপলা ফুল ... ওই তো কিছুদিন আগেই খুঁজে পেয়েছিলাম ওরকম একটা পুরুর... কিন্তু পুরুরে শাঁপলা ফুল নেই ... নাক বরাবর গিয়ে দেখলাম ছাতিম গাছটাও নেই। কম সে কম ছাতিম গাছটাও তো থাকতে পারত। কিন্তু কী হলো জানেন, কিছু এগিয়ে দেখি দাঁড়িয়ে আছে ছাতিম গাছ নয় মস্ত একটা কদম গাছ। তবু গেলাম আশায় বুক বেঁধে। আরো কিছুটা। বাঁ দিকে গিয়ে একটা মাঠও পড়ল। কিন্তু কোথায় কী! মেঠো পথ ধরে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, সেই পান বরজও খুঁজে পেলাম না, সেই রঙচটা হলুদ বাড়িটারও খোঁজ পেলাম না। পথে অবশ্য একটা নিম গাছ পেয়েছিলাম। বাস! ওই পর্যন্তই। আরেকবার ট্রেনে চেপে চলে গেছি হৃদয়পুর। ওই মশায় উত্তর বারাসাতের ওখানটায়। আমাদের তো আবার মামার ট্রেন। টিকিটও লাগে না, চেকারও ধরে না। হয়েছে কি প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে হেঁটে চলে গেছি অনেকটা। হাঁটিছি তো হাঁটিছি। হঠাৎ দেখি, আরে! একটা একতলা রঙচটা হলুদ বাড়ি। না! না! কোনও জামরুল গাছও নেই, কোনও নিমগাছও নেই। তবে বাড়িটার উঠোনে দেখি বাড়ি শুকোতে দেওয়া হয়েছে। কৌতূহল হলো। উকিঝুকি মারতে লাগলাম। হঠাৎ কতগুলো পাড়ার ছেলে আমাকে ঘিরে ফেলল। একজন আমার চুলের মুঠি ধরে বলল — ‘কি মতলবে উকিঝুকি মারছিস শুনি’? আমি তো... স্যার কি বলব, একেবারে ভাবাচাকা খেয়ে গেছি। চোর সন্দেহে আগেও কবার উত্তম মধ্যম খেয়েছি। থানায় দু’রাত থাকতেও হয়েছে, তবে জেল পর্যন্ত যেতে হয়নি, এই যা রক্ষে - ফলতঃ বুঝলাম আজ কপালে শনি আছে। পাবলিক তো আমাকে এই মারে কি সেই মারে। হঠাৎ মোটর সাইকেল চেপে একটা যম্ভা মার্কী লোক এলো। পিছন পিছন এলো তার কিছু চেলুয়া। তারা যে ছেলেটা আমার চুলের মুঠি ধরেছিল তাকে সাইডে ডেকে কী সব বলাবলি করছিল। আমার শুধু বরাবর খোঁচর শব্দটা কানে আসছিল। কেউ বলছে - নার্কোটিক্স দপ্তরের লোকও হতে পারে, কিছু দিন আগেই তো চোলাই খেয়ে মরেছে পাশের গ্রামের কিছু মানুষ, কেউ বলছে না না সিবিআইয়ের লোক মনে হয়। একজন তো স্পষ্ট শুনলাম বলাবলি করছে - চিট ফ্যান্ডের এজেন্ট ধরতে এসেছে, সম্ভ্রাটনা তো আগে থেকেই খবর দিয়েছিল ... নানা রকম ছেঁড়া ছেঁড়া শব্দ,

প্রতিবেশী

দুলালকুমার বিশ্বাস

বিকরগাছের গরুহুটিয় একটা গাই গরু খুঁজছিলে রাজা খাঁ—বেতগাঁর রাজা খাঁ। সঙ্গে নাতি চুলিলাল, রাজা খাঁর নন্দাদার নাতি। চোখে ভাল দেখতে পান না, শরীরে তাগদও কমেছে। তাই একা বেশি দূরের হাটে যেতে পারেন না রাজা খাঁ—এ অঞ্চলের একচ্ছত্র মাতঙ্গর। হিন্দু-মুসলমান একতাকে সবাই তাঁকে চেনে। লাঠি হাতে এদিক-ওদিক পা ফেলতেই সবাই পথ করে দেয়। কিন্তু তবুও রুপায়ে হাত আড়াল করে জনতে চান—ভাল তো মনি? চুনিরে দেখলে? কথানে যে গেল শালা! ও ভাড়ি (ভাইটি) চুলে, কথানে তুই?

রাজা ঠাউন্দের গালিমিস্তিত আয়ানে চুলিলাল হাজির—কী কচ্ছ, ও ঠাউন্ডা? দ্যাটটা ভাল গাই দেখিছ ঠাউন্ডা। তুমি চলো তাড়াতাড়ি।

রাজা খাঁও তাড়া লাগান—তালি (তাহলে) চল তাড়াতাড়ি। আবার বিজা (কে না-কে) আসে ভাডাল বাঁধাবেসে।

চুলিলালের পেছন পেছন একটু দ্রুত পা ফেলতে চেষ্টা করেন রাজা খাঁ—আরে শালা, আস্তে যা। আমাদের কি জুয়াল (জোয়ান) পাইছিস নাহি? এটু আস্তে হাঁট দেখি, দালা।

বে গরুটার কাছে এসে চুলিলাল দাঁড়ায়, তাকে রাজা খাঁর মনে ধরে। মেটে রঙ, গলকফলটা সাপা এবং গাই গরু হলেও তার ছাড় আর পিঠের সংযোগ স্থলের হুটটা বেশ উঁচু, ফলদের বেদন হয় আর কী।

গাইটার মাসিক ছবির আলি রাজা খাঁকে দেখে সালাম দেয়—কাহা (কাহা), আমার গাইজরে মনে ধরে? পেখম পেখম চার শ্যার (সের), সাড়ে চার শ্যার দুখ দেবে। দাহ, তুমার মনে যদি ধরে।

রাজা খাঁ তেজি গাইটা দেখেন আর মনে মনে বলেন, সে মনি, তুমার গাই সেহেই (সেখই) বুঝি। তার পর শব্দ করে বলেন, তা কত দিতি হবেন, মনি? চুলিলালের আর তর সয় না। সে গাই-এর মাথায় হাত রাখে। কিন্তু তেজি গাই

সজোরে মাথা বাঁকায়। চুনি বলে, ওরে বাবা, কী ত্যাগ দ্যাহ। চাচা, তুমার গাই-র বয়েস কত হবেন?

ছবির আলি তার গাইয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে—কাকল এক বিয়েন সেছে। বাজুর দুখ ছাড়েছে এই মাস খালেক হবেন। শিপগিরি (শীঘ্র) আবার জাকবেন।

গাই ডাকা—যাঁড়কে সন্তান উৎপাদনের জন্য আহ্বান। রাজা খাঁ খুশি—তা মনি, কয়ে ফালো, কত দিতি হবেনে তুমারে।

ছবির সন্নিয় বলে—কাহা, তুমারে গাই ব্যাচপো (বেচবে), কেনমনি ভাবিনি। তুমি যা দিবা তাই নেব।

রাজা খাঁ মিষ্টি করে হাসেন—কামন বিপনে ফেললে কও সেহি মনি।

চুলিলাল ভাবে, ঠাকুরলা নিশ্চয় বেশি দাম দিয়ে দেবে। তাই সে বলেই ফেলেন—কত আর হবে তুমার গাইর দাম—এই ধর এক কুড়ি?

ছবিরের মুখ শুকিয়ে যায়। চুনি সোটা লক্ষ করে বলে—কান, খুব কম কঙ্গাম নাহি? ঠিক আছে থাক তর (তবে)। ঠাউন্ডা চলো—অন্যদিকি যাই।

কিন্তু রাজা খাঁর মনে ধরেছে ছবিরের গাই। তিনি এগিয়ে গিয়ে গাই-এর পিঠে হাত রাখেন। গাই তার লেজ নেড়ে খুশির সাড়া দেয়। এমনকী তার লম্বা জিত নিয়ে রাজা খাঁর হাত একবার চেটেও দেয়। তা দেখে ছবির বলে—কাহা, তুমারে আমার গাইর মনে ধরেছে। কিন্তু...। খেমে যায় ছবির। কণ্ঠে পারে না—আরো একটু দাম বাড়াত। রাজা খাঁ ছবিরের দ্বিধার ভাবটা লক্ষ করেন। বলেন—তা মনি, তোর গরুর দাম চুলে বলবে, না তুই বলবি? বল সেহি, কত দিতি হবেনে তোরে।

কিন্তু ছবির বলে, — তুমি যা দিবা, কাহা, তাই নেবো।

কিন্তু মনি, তোর গরুর দাম আমি কই কামনে? তুই বল—কত চাস। জানি তো ঠাকুর পড়ে গাই কেতি আইছিস। ক' নেহি কত হলি তোর মনে দুঃখ হবে না?

রাজা খাঁর চাপিয়ে দেওয়া দায় থেকে উদ্ধার পেতে ছবির বলেই ফেল তার সমস্যার কথা—কাহা, সেনার দায়ে বেচতিছি আমার গাই। তরফদার চাচারে কথা দিলাম, কথা রাখতি গাই বেচতিছি।

তুলারামপুরের তরফদারেরা ধনী লোক, রাজা খাঁর সঙ্গে তাদের উঠা-বসা। বংশের সব চাইতে বড় যিনি, সেই 'ঠিরি' তরফদার অবশ্য একেবারেই ছোটখাটো মানুষ, কলঙ্কের মধ্যে তামাক ধরে রাখার ঠিকার মতো তাঁর আকৃতি। ইনি আবার রাজা খাঁর বন্ধুস্থানীয়, যদিও তরফদার রাজা খাঁকে কাকা বলেই ডাকেন। লোকে যে তরফদারকে 'ঠিরি' বলে উল্লেখ করে, সে একেবারেই ব্যঙ্গার্থে নয়। রাজা খাঁ ছবির আলির গাইয়ের পিঠে হাত বুলাতে বুলাতেই তার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আর ছবির গাই তার লম্বা জিব বের করে রাজা খাঁর হাত বারবার চেটে দিচ্ছিল। রাজা খাঁ ঠাট্টা করেন—দ্যাখ মনি, তোর গাই কিন্তু আমার হয়ে গেছে। তা মনি, কত টায়া পাবেনে তরফদার?

ছবির তার গাই-এর দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলে। তোরে অ্যাতদিন পাললাম, আর আমারে ছুলে গেলি। কাহা, এ তুমার গাই। অ্যাহু, তুমি যা ভাল বোঝ, তাই দ্যাও।

কোমরে বাঁধা গামছা দিয়ে ছবির তার চোখ মোছে। তারপর গাইয়ের গলায় বাঁধা দড়িটা রাজা খাঁর হাতে তুলে দিয়ে সে বলে, তুমারে কাহা আমি চিনি। তুমি কত বড় মানুষ! জানি, তুমার কাছে আমার গাই ভাল থাকবে। আমি কিন্তু মাঝেসাজে ওরে দেখতি যাব।

গলা ধরে আসে ছবির আলির। রাজা খাঁ তার কাছে জানতে চান, সে কেন গাঁয়ের লোক। ছবিরের উত্তর শুনে রাজা খাঁ বলেন—ও! তুইও তুলোরামপুরির মানুষ। তালি তো আমারে চিনিবি। কত যাই আমি তোগের গিরামে। মস্তবড় গিরাম তোগের।

চুনিলালের কান এড়িয়ে ছবির রাজা খাঁকে তার দেনার পরিমাণটা জানিয়ে দেয়। রাজা খাঁ চুনিকে বলেন—ভাড়ি, দড়ি ধর, তুই আগো (এগিয়ে যা), আমি আস্তে আস্তে আসতিছি।

চুনি এগিয়ে গেলে রাজা খাঁ ছবিরের হাতে তার দেনার চেয়ে কিছু টাকা বেশি দিয়ে বলেন, শুনে দ্যাখ তো মনি, কম দিলাম নাহি।

ছবির রাজা খাঁর পায়ে হাত দেয়—তুমার টায়া গুণতি হবে? কিন্তু কাহা, আমার

গাইর দাম তো য্যাত (অত) না। তুমি আমারে...

ছবির কথা শেষ করতে পারে না। তার গলা বন্ধ হয়ে আসে। রাজা খাঁ তার মাথায় হাত রাখেন—মনি, চোহে ভালো দেহি না, সন্ধ্যে নামতেছে। তুই বাড়ি যা, আমারে তো অনেকটা হাঁটতি হবে। যা, বাড়ি যা।

কথা বলার মধ্যে দূরে চলে যাওয়া গাই-এর উপর থেকে ছবিরের চোখ সরে না। সে বলে, কাহা আমিও তুমার সাথে খেয়াঘাট পর্যন্ত যাই, তুমারে আগোয় (এগিয়ে) দি।

খেয়াঘাটে পৌঁছবার আগে ছবির বলে, কাহা, আমি এবার মাঠ ভাঙে বাড়ি যাব, খেয়াঘাট দেখা যাচ্ছে। যাই?

রাজা খাঁ হাত তোলেন—ভাল থারিস, মনি। যা পা চালা। দেহে আসিস, গাই ডাকলো কিনা।

খেয়াঘাটে এসে রাজা খাঁ দেখেন যে চুনি গাই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই চুনি বলে—ঠাউদা, গাইডারে বোটে তুলতি পারলাম না কিছুতেই। মনে হয় ছবির চাচারে লাগবে। তুমি অ্যাহু গাই ধরে দাঁড়াও, আমি ছবির চাচারে ডাহে নিয়াসি (নিয়ে আসি)।

চুনিলাল গাইয়ের গলায় বাঁধা দড়িটা রাজা খাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালায় আর ভাবতে থাকে—চাচারে পালি হয়! নালি (না হলে) আনসার মিয়া ঝঙ্কটি বাঁধাবে।

আনসার মিয়া খেয়াঘাটের ইজরাদার। সে সুযোগ পেলেই হিন্দুদের সঙ্গে ঝামেলা পাকায়। আবার যাঁরা এদের মধ্যে প্রভাবশালী, আনসার তার দলের লোকদের তাঁদের পেছনে লাগিয়ে দিয়ে মধ্যস্থতা করে। ভান করে সে কত ভাল লোক—ওই রাজনীতি করা লোকদের মতই তার কি।

চুনি রাজা খাঁর হাতে দড়ি ধরিয়ে চলে গেলে আনসার রাজা খাঁর কাছে আসে—আদাব চাচা, সব ভাল তো?

গলার স্বরে রাজা খাঁ চিনে নেন আনসারকে। তিনি তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে আনসার তার এক সাগরেরদকে ইঙ্গিত করে। সে অন্যমনস্ক রাজা খাঁর হাতে

ধরা দড়িতে হেঁচট খায়। দড়ি রাজা খাঁর হাত থেকে ছিটকে গেলে ছবিরের গাই উর্দ্ধশ্বাসে ছুট লাগায়। আনসার লোকটাকে ধমক লাগায়—এই কনা হারামজাদা, নিলি তো—যা, যা, ধরে আন রাজা খাঁর গাইজা।

কিন্তু ততক্ষণে গাই পণার পার। রাজা খাঁ বুঝলেন, এসবই আনসারের কারসাজি। তিনি হতশ মুখে অপেক্ষা করেন চুনিলালের। আনসার আস্তে আস্তে সরে পড়ে। কিন্তু যাওয়ার সময় একটু খৌঁচাও দেয় — রহিমুদ্দিন তুমার গাই ঠিক ধরে আনবেন, চাচা।

চুনিলালকে সব কথা বলেন না রাজা খাঁ। তিনি জানেন, তাতে কামেলা বাড়বে। হতশ চুনি রাজা খাঁকে জানায়, ছবির আলি বাড়ি ফিরে কোথায় যেন গেছে। আমি ওর বিবিরে আর কিইবা কই। তুমার টায়াও গেল, গাইও গেল।

ফেরি বোট এপারে এলে দু'জনে নদী পেরিয়ে বাড়ি ফেরে। রাজা খাঁর পুত্রবধূ সব শুনে গুম হয়ে যান। তিনি কেবল চুনিকে বলেন, বুড়ো মানবির হাতে কেউ জোয়ান গরু ছাড়বে, মনি?

অন্ধকার রাত্রি। মাঠের মধ্যে গরু খোঁজা চলে না। সকালের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। চুনিকে কাল আবার পাঠাতে হবে ছবির আলির বাড়ি। শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকেন রাজা খাঁ।

শীতের শেষ, ফাল্গুনের শুরু। রাজা খাঁর আজ বেশ ব্যক্তি গেছে। তিনি ছবিরের উপর ভরসা রাখলেও চুনি কিন্তু ভাবে—আনসারের গায়ের মানুষ ছবির। ওর ভাল মানুষি হয়ত ওই আনসারের মত। সে ভাবে ঠাউন্টার টায়াটা জলে গেল। উঠান পেরিয়ে পূর্ব পোতায় চুনিদের ঘর, আর পশ্চিম পোতায় রাজা খাঁর ঘর। রাজা খাঁ তার মস্তবড় টিনের ঘরের বারান্দায় রাত কটান। ঘরের ভিতরে শোওয়া তার একেবারেই অপছন্দ। চুনিও তার রাজা ঠাউন্টার মত তাদের ঘরের পশ্চিম বারান্দায় দুমায়। আজ সারাদিন অনেক ধকল গেছে। বিজ্ঞানায় গা পাতেই চুনিলাল নাক ডাকতে শুরু করে। উঠান পেরিয়ে সে নাক ডাকার শব্দ রাজা খাঁর কানে যায়। রাজা খাঁ ভাবেন — এবার শালারে বিয়ে দিতি হয়। তয় (তবে) যদি ওর নাক ডায়াঙেও (ডাকা থেকে) বাঁচি।

পরদিন সকাল। ছবির গাই নিয় হাজির—কাথ, বেরি হমালো। তরফদার বাড়ি গেয়ে আজান (একান)। রাজা খাঁ তুপ্তির হাসি হাসেন—কামন আছে ঠিরি শাখদার? টায়া ফেরে পাইয়ে খুশি তো?

ছবির হাসে—রাজা কাথ, তরফদার কয়, টায়া লাগবে না, তোর গাইজা রাহে (এবে) যা। আমি কলাম (কইলাম) চাচা, এ গাই তো আমার না, এতা ব্যাতগার গাজ খাঁর। সব শুনে তরফদার চাচা আমারে বকা দিল—তুই আগে তো ব্যাতগার গাবি: যা যা, রাজাকার কী দুশ্চিন্তে গেছে কতো।

রাজা খাঁ ছবিরের দিকে এবার ভাল করে তাকান, অর্থাৎ অধিক আলো আড়াল পরবার জন্য কপালের উপর বা হাতের তালুটা ছড়িয়ে ধরেন। তখনই লক্ষ করেন যে ছবিরের পরনের লুঙ্গির কোমরের দিকে ভিজা, কোমারে ঝাঝ গামজুটাও ভেজা। তিনি বলেন, — আরে ছবির, তোর কাপড়-চোপড় ভিজা কান, মনি? এলোও শীত যায়নি, তুই এই ভিজা কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল?

ছবির বকন গাই নিয়ে খেয়া যাটে হাজির হয় তখন খেয়া নৌকা জপর পারে। খেয়াখাটের মালিক আনসার মিয়া ছবিরকে ডাকে—ও মিয়া, অ্যাত সবহলে (সকালে) কহানে যাও গাই নিয়ে? বোট তো ওপারে, ততক্ষণ ধর, বিড়ি খাও।

গাইটাকে চিনতে আনসারের ভুল হয়নি। রাজা খাঁর হাত থেকে এই গাইটাকে সে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তার মানে, আজ ছবির গাই নিজে রাজা খাঁর বাড়িতি নিয়ে যাচ্ছে—ভাবে আনসার। দাঁড়াও মিয়া, তুমারে মাখাছি মজা। আনসার ছবিরকে বিড়ি ধরিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে যায়। সেখানে তার ঢেঙ্গা বদর ঘুমাইছিল। সে সারারাত ঘাট পাহারায় ছিল, এখব ঘুম নিয়ে রাতের না খুমানো ঘুম পুথিয়ে নিছিল। আনসার পা নিয়ে বদরকে টেঙ্গা দেয়—এই শালা ওঠ। কাজ আছে। কহিল রাজা খাঁর হাতেতে (হাত থেকে) যে গাইজা ছাড়ার নিচ্ছিলি, সেভা তুলোরামপুরির ছবিরের। শালার খুব কিছুপোর সাথে পিরিত। ও শালারে জলে ফেপতি হবে ওর গাই শুকো বুঝলি? ও যখন গাই নিয়ে পাটাতনে ওঠবে, তুই কছিত জোরে টান মারবি, বুঝলি?

কাজলা নদী পেরোবার ফেরি নৌকা বোট হলেও এ বোট সাধারণ আর পাঁচটা নৌকার মত নয়। সব নৌকার গলুই থাকে, কিন্তু এই বোটের কোন গলুই নেই।

বোটের দুই দিকই আড়াআড়ি কটা যাতে যখন বোট পাড়ে ভিড়বে তখন পাড়ের অচমকটা জায়গা জুড়ে সে চেপে থাকতে পারে। একটা কাছি বোটের উপর দিয়ে নিয়ে নদীর দুই পাড়ে বাঁধা। বোটের উঠে কাছি ধরে টান দিলে বোট এগার থেকে ওপার অথবা ওপার থেকে এগারে পৌছায়। হ্যাঁ, গাড়ি অথবা গরু-ছাগল বোটের তুলনায় একটা অতিরিক্ত ব্যবস্থা থাকে। গাড়ির চাকা বরাবর দুটো চওড়া ভারি পটিতন পেতে বোটের সঙ্গে নদী পাড়ের সংযোগ স্থাপন করা হয়। এই পটিতনের উপর দিয়ে গাড়ি অথবা গরু-ছাগল বোটের উপরে উঠতে পারে বা নদী তীরে বোট থেকে নামতে পারে।

আনসারের নির্দেশ শুনে বদর বলে, তালি তো তুমার পটিতনও নদীতে পড়ে যাবেনে? এখন ভাটার টান বুঝ, ভাসে যাবেনে পটিতন।

সে কথার আনসার তাকে ধমকায়—তোরে যা কলাম (বললাম), তুই তাই করবি। পটিতনের ব্যবস্থা আমি করবানি।

হ্যাঁ বদর আলি তার কাজ ঠিক ঠিকই কেবল করেনি, সে কাছিতে এত জোর টান দিয়েছিল যে গাই শুকো নদীতে পড়ে ছবির সেধে বোট চলে গেছে মাঝ নদীতে। ছবির সবই বুঝল, সে বোটের ফেরার অপেক্ষা না করে গাই নিয়ে সীতের নদী পার হল। কিন্তু এতসব কথা ছবির রাজা থাকে বলে না। সে বলে, বোটের উঠতি গিয়ে গাই শুকো নদীতে পড়ে গিছিলাম।

রাজা খাঁর হঠাৎ মনে হলো, ছবিরের গাইটা নিয়ে বজ্র উল্টোপাল্টা ঘটনা ঘটছে। গত সন্ধ্যার কথা মনে পড়ল—গরুর দড়িতে বদরের আঁজড় খাওয়ার ঘটনা। আজ বোটের উঠতে গিয়ে একেবারে গাই শুকো ছবির জলে?

সাধারণত বোটের যাত্রীরাই কাছি টেনে নদী পারাপার করে। বদর কেন তা হলো বোটের উঠল? রাজা খাঁ তাঁর মনের প্রশ্নটা চেপে গিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে দেখেন, কে যেন ছবিরের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি কপালের উপর হাত নিয়ে আগমুখকে দেখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আগমুখ তার আগেই তার পরিচয় জানায়—কাহ্ন, আমি বদর, খেয়াঘাটের বদর আলি। কাহ্ন, ছবির আলি ঠিক কথা কহেছে না।

কিন্তু রাজা খাঁ বদরকে তার কথা শেষ করতে দেন না। তিনি গাইয়ের পিঠের

উপর থেকে তার ডান হাতটা অনামনক ভাবে সরিয়ে নিতে সে লেজের ঝাপটা মারতে থাকে। সীতের নদী পেরিয়ে আসায় তার লোমগুলো সকালের সূর্যলোকে ঝলমল করছে। রাজা খাঁর উত্তোলিত ডান হাতের দিকে চোখ পড়তে বদর খেমে যায়।

ছবির বদরের কথায় কান না দিয়ে বলে—রাজা কা, বাড়িতি গিয়ে চান করবানি। তুমার গোয়াল কোনতা, গাইজা বান্দে আসি।

বদর ছবিরকে থামিয়ে দিয়ে বলে, আমি চিনি কাহ্ন'র গুয়াল (গোয়াল)। দাও আমি বান্দে রাহে আসি।

ছবিরের হাত থেকে প্রায় সে ভিনিয়ে নেয় গাই-এর গলায় বাঁধা দড়িটা। ছবির রাজা খাঁর কাছে হাত জোড় করে যাওয়ার অনুমতি চায়। কিন্তু রাজা খাঁ আপত্তি করেন—সেকি, গেরস্তের বাড়ি সাত সয়ালে (সকালে) আলে, আর কিছু মুহি না দিয়ে চলে যাবা? দুটো মুড়ি মুখি দাও।

ছবির একটা ঠোঙায় কিছু মুড়ি আর গুড় নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। বদর এসে দেখে, রাজা খাঁ ছবিরের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে নিম্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। ছবিরের গাই হরানোর ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভাল লাগছে না, নিজেকে যেন অপরাধী মনে হচ্ছে। বদরকে দেখে তাঁর সঙ্কিত ফেরে। তিনি জানতে চান—কী কচিঙ্গি তহন, ক'মেহি।

বদরের কথা শোনার পর রাজা খাঁ জানতে চান, এত সব করে ইহানে আলি কান? পাগ করিঙ্গিস, মনে হইলো?

বদরের কান্না পায়। কহ কষ্টে বলে, আনসার মিয়ার কথা না শুনি আমারে ভাড়াই দেবেনে। তালি যাবো কী? বউ ছল-মায়ে নিয়ে মরতি হবে।

রাজা খাঁ কেনন যেন ধম্পে পড়ে যান—বেশ তো, আনসারের কাছেই থাকতিস, ইহানে আবার আলি কান?

বদর চোখ মোছে—কাহ্ন, জেটী ছলটা মরতি কহেছে। বিপিন ডাকারকা কলো, পেস্তোক দিন ছলারে আক পোয়া করে দুখ খাওয়াতি হবে। ছবিরের পাশে থাকি, ওরে কলাম ডাকারের কথা। রাজা কা, ছবির আমার হলভারে বাঁচালো। আর আমি কিনা ...।

বদরের কথা আটকে যায়।

ইচ্ছে করে, তুমি এখানে দাঁড়াও। চোখ বন্ধ কর। আমার রক্ত মাথা হাতে তোমাকে একটু ছুঁয়ে নিলাম। আমার ভালবাসার হৃদয়ক রক্তসের রক্ত, যা তোমাকে ভাষায় বোঝাতে পারিনি, যা তোমাকে তীব্র আলিঙ্গন দিয়ে বোঝাতে পারিনি, আজ রক্তের স্বেদায় বোঝাতে চাইছি। আজ মনের পেল, দোলের রক্ত, রক্তের উৎসব—ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

বসন্তের আগমনের খবর সবুজ নবপত্র, লাল কৃষ্ণচূড়া, হলুদ রাধা চূড়া, লাল-কমলা পলাশের রঙের প্রকৃতি প্রথম জানাল কেন। তারপর পশু-পক্ষিরা প্রাণীকুল। শীত ঘুম শেষ। বোকিলের কুহ কুহ ডাক—খোল খোল ছাৱ, কসন্ত এসে গেছে। বোকিল হাতঘ্যা শুঁকে কসন্তের আগমন বার্তা পেয়ে যায়। উজ্জ্বলমেক্ষ সলংগ আলান্ডা, পেলসিলভানিয়ায় গর্ত থেকে গ্লাউন্ড হর্গ বা একধরনের বড় জাতের কাঠবেড়ালি মুখ বার করলেই বুঝতে হবে শীত চলে যাবার সময় এসে গেছে। প্রবল শীতের চার মাস গর্তে থাকে। বের হয় না। সারা বছর ধরে সঞ্চিত ফাটি এই সময়ে অল্প অল্প করে খায় করে। আর মানুষ যথোক্ত কাগলভার বা যন্ত্রের মাধ্যমে। মানুষ তার স্পর্শ অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। তাই পম্পী-প্রকৃতি তাকে চানো না। টানে ভাং-হন-গাজায়।

দৌল বসন্তের রঙ

अनुसूचित विभाग

দেনে দোজ দুলুনি
রাজ্য মাথায় চিকুনি
বর আসবে যথুনি
নিষে যাবে তথুনি।

সদ্য কিশোর বেলার লুকোচুরি, সাতচাত্তর, গান্ধি-পাদি বেলার ফাঁকে মুখ দিয়ে
 বেরিয়ে পড়া ছড়া - গানের অংশ। বলতে যেমন ভাল লাগত তেমনি কেউ বললে
 ভাততেও ভাল লাগত। কখনও কখনও ছোট্ট বোনকে দোলনায় বসিয়ে দোল দিতে
 দিতে এইসব ছড়া বলা হত। ওই বয়সে সব ছড়া-গানের সব অর্থ যে বোকা যায়, তা
 বিস্মৃত নয়। একে ধরনের ভাল লাগা থেকে এরকম বলা-কওয়া।

কতু বলায়, শরীর বলায়, মনও বলায়। ভরা কিশোর যা উচ্চিৎ যৌবনে বোঝা যায়, কতুরাজ বসন্ত প্রকৃত অর্থে মন কেমনের বাতু। প্রকৃতিতে বাসন্তী সাজ বাতাসে বসন্তের সদ্য ফোঁটা পল্লীবাগার মৃদু-মন সুবাস। ছড়িয়ে পড়ে নিকু নিগন্তে। যা শরীর ও মনকে আঙ্গোড়িত করে। যৌবন বাহে যৌবনের মোহে। হাওয়ার বসন্ত। বসন্তের আঙন মনেও। সে হল, মনে-প্রাণে কাউকে যৌজাখন্ডির সময়। সে কাছে আছে কিংবা দূরে। তাকে দু-চোখ ভরে দেখছি। কিংবা প্রাণ ভরে দেখা হয়নি। তাই ভয়, না পাওয়ার ভয়। হারিয়ে ফেলার ভয়। ভয়-বিরহের জ্বালা। হলয় জুড়ে বিন্দু বিন্দু বাখা। বুক ভরি, মন ভরি, এই ভার হল অবাক। অসেধা অশ্রু-নদরি।

মনের মধ্যে অজস্র জিজ্ঞাসা, কুরে কুরে খায়। তেমনাকে যে ভালবাসি, একথাটি বলেছি কতবার। তুমি কি সত্যি সত্যি বুকেছো? আমার ভালবাসা যে কত মর্মস্পর্শী তা বোঝানোর মত কোনও শব্দ আমার জানা নেই। কোনও অভিযুক্তির ক্ষমতা নেই। নেই কোনও আচরণের ভাষা। শুধু চেয়ে থাকা দুটি চোখ, চোখের মণি। কসতে হাঁওয়া বাড়ে। হাওয়ার বাড়ে দেহ-গন্ধ। হ... হ... করে বেরিয়ে পাড়ে দগা পাকানো কপাল।

কবি এক চিরন্তন আর্তি থেকে গেয়ে গুঠে 'সবি', ভালবাসা কাপে কয়। সে কি কেবলই যাতনা নয়।' এত যাতনার মধ্যেও বসন্তের সবুজ ও বাসন্তী রঙ হাতে বলাতে

এনে যায়। অসিত-পলিতে ব্যাঙের ছাতার মত গজিরে উঠেছে অগণিত গাঁজা মনের ঠেক। শুধু কলকাতাটুকুই ঘুরে গেছে বুঝতে পারা যায়। মশা আর ব্যাঙটির মত ভাং-গাঁজা আর মনের ঠেক। জন্মাচ্ছে আর মরছে। সকালে জন্মাচ্ছে তো বিকেলে মরছে, রাতে জন্মাচ্ছে তো সূর্যের আলোয় মরছে। বিজ্ঞানের বাড়ি-বাড়িতে মানুষ আর রোগ ব্যাধিতে মরছে না, তাই মানুষ বাড়ছে। আর লোভ-লালস-ভোগবাদের ফলে ভাং-গাঁজা-মনের ঠেক বাড়ছে।

দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা বাবুর ঠেক, মনোজের ঠেক, চাচার ঠেক, সজুভাইয়ের ঠেক, পেটি মাসির ঠেক অথবা বিকেলে চালু হওয়া আমার পোকান, কাঁটা ভোলার পোকান, বউদির পোকানের মত ঠেক-সেকানের খবর পাওয়া যাবে। নাম শুনে বোকা যায় সেকানি আর খরিকারদের জীবনলীলা। এসব ঠেক-সেকানে বেশি-বিসেসি সব পান করা যাবে। চিজরঞ্জন অ্যান্ডিনিউ-র উপরে, বি. কে. পাল অ্যান্ডিনিউ বলা যায় গোটা সোনাগাছি জুড়ে রঙ খেচার লিলি চলে উন্মত্ত বেলানাপনা। একটু চড়া দাম দিতে হয় এই আর কি? নিমন্তলা শশান ও তার আশপাশে তো ভুতুনাথের এলাকা। রাস্তার উপরেই গাঁজা-চরস-আকিম-সিদ্ধির গুলি ও ফট সফেক্সের পোকান। বিবেকানন্দ রোডে বিবেকানন্দকে দেখা যাবে না, গীরিশ যোষের প্রতিভার সন্ধান মিলবে না। যা পাওয়া যাবে তাইল সিদ্ধি আর ভাং। তিন রকমের গুলি। বড়-মাঝারি-ছোট। বেশি পরসার লোভ দেখালে গোপন ডেরা থেকে তামার পরসার ঘষে এনে দেবে। বেশা চড়ানোর জন্য রয়েছে প্যাড়া আর সন্দেশ। গাঁজা আর সিদ্ধিপাতা দিয়ে বানানো।

খবরের কাগজের পাতায় বা টেলিভিশন চ্যানেলে চোখ পড়লেই ধর্ম্মের ছবি বা নিনেন পক্ষে, শ্রীলতাহানির ছবি ভেসে উঠবে। এই তো গত বঙ্গর সোলের লিলি কাগজে খবর বেরল—‘গঙ্গার শ্রীলতাহানি। তখন ডারনুর। অনেকেরই রঙ খেলা শেষ। কারো কারো হানি করা শেষ। গঙ্গা দিলি নিজের হাতের ভাল ভাল রান্না রাস্তার ওপারের বাড়িতে নতুন ডাড়াটিয়া দিলির ছোট বাচ্চাটির জন্য নিয়ে বাড়িল। পাশের তাসপাটির কয়েকজন মদ খেয়ে চুর হয়ে য়িমোছিল। রাস্তা পার হওয়ার আগেই কয়েকজন পিছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে যাচ্ছে তাই ব্যবহার। তাই নিয়ে থানা কোর্ট। কেন রে, অতাই যদি ইচ্ছে তবে গাঁজা পার্ক, যদুবাবুর বাজার, কাণ্ডাডাউলার আশপাশ, সোনাগাছি, কালিঘাট, পোটো পাড়া, আলিপুর জেলের উন্টদিবকের

গলিতে ঢুকে পড়, কে বারশ করেছে? কিছু কলতে গেলে, গলা উচিয়ে ব্যঙ্গ সূত্রে বলবে—‘কেন, শ্রীকৃষ্ণ করলে গীতা আর আমরা করলে...। নবীন বিশারদী গোপালীরা যখন নগ্ন হয়ে যমুনার জলে হান বা জলকেলি করছিল, তখন তাদের নগ্ন অবস্থায় ওপরে উঠে শাড়ি চাইতে বাধ্য করেনি? রঙ খেলার নামে মুখে বুকে রঙ মাখানি? নিজের বউ হলে তাও নয় কিছু করার ছিল। রাধাতো পরের বউ। সম্পর্কে মামি। সম্পর্কের মুখে চুনকালি দিয়ে যদি সবার পুজো পেতে পারে তবে আমাদের সোব লাও কেন? তেই - চকিশটা তো বউ ফিই তার ওপর রাধাসহ বোলশ গোপিনী ফাউ। এ কোল শাস্ত্রীয় উদ্ভট ব্যাখ্যা। আর আমাদের কোল জেল-বাজত-গণ বোলাই? সর্বনাশ। এ মুখপোড়ার লজ বসে কি? ভগবানের নামে এরকম কথা। ভয় ডর বলে কিছু নেই?

বর্তমান বঙ্গবের পরিস্থিতি থেকে চোখ ফেরাই কেন-পুরাণে। ইতিহাসের পাতায় পাতায়। আমাদের পাতায় দোলভিটে আছে। উঁচু তিন থাক বৌদির মতো দেখতে। সবাই যাকে সোলমজ বলে। গ্রামের ছেলে-ছোকরা রাঙ-বেরঙের কাগজ কেটে শিকল বানায়। সকাল থেকে পুজো শুরু হয়। এখানে রং খেলা মানে অগাধ আনন্দের। প্রায় সব বাচ্চারা এই বয়সে বড় ওরুজনদের পায়ে আঁবির দিয়ে প্রণাম করে। এর নাম রঙ প্রণাম।

উনিশ শতকের কলকাতায় বাবু সমাজ হোলি হায় বলে হেলোপানা আর বিলাসের মধ্যে ভুবিয়ে রাখতেন। দোল উৎসবে বাংলার বাবু সমাজের চলত আকট মদ্যপান, বাইজি নাচ আর সাহেব তোষণ। দোল উৎসব উপলক্ষে ব্রিটিশ সাহেবদের সুন্দরী নারী উপঢৌকন দেওয়া হত।

বাঙালির কাছে দোল উৎসব মানে শান্তিনিকেতনের ‘বসন্ত উৎসব’। প্রথমে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হত আশ্রুকুলে। সে সময় প্রবল ভিড়ের চাপে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায় বসন্ত উৎসবকে নিয়ে যাওয়া হয় বড় প্রাঙ্গণে সিংহ সলনে। ভিড় সামাল দিতে না পারায় নিয়ে যাওয়া হয় মেজার মাঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলায় কবে থেকে রঙ খেলা বা দোল উৎসব বা বসন্ত উৎসব শুরু তা বলা যায় না। ফাঙ্কনের পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যার সময় শচীমাতা জন্ম দিলেন নিমাইয়ের। নিমাই নাম দিয়েছিলেন অইজত-আচার্যের স্ত্রী সীতা দেবী। ইতিপূর্বে শচীদেবী বেশ কয়েকটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এবং তারা অকালে মারা গেছে। বলা যায়, এই অকালমৃত্যু

ঠেকানোর জন্য নিমাই নাম। মা নেই, এই অর্থে নিমাই, আর তিঙ্ক নামে যমের অকৃত ভাবেও এরকম নামকরণ হতে পারে। পাড়ার মেয়েরা ফরসা ছেলটিকে গোরা বলে ডাকত। গোরা থেকে গৌরান্ন। পরে যার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য। ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারির দোল পূর্ণিমায় চৈতন্যের জন্ম হল। জগৎ হিমোলিত হল। দোল উৎসব হল না। প্রচুর পুঁথিপত্র খাটানো হল দোল উৎসবের কোনও খবর পাওয়া গেল না। এই বার মাসের তের পার্বন প্রিয় বাংলার। এমনকি সে সময়ে বৈষ্ণবতীর্তন বর্ষীপে কোনও দোল উৎসব হত না। পুঁথিপত্র বা পাথরের গায়ে কোথাও দোল উৎসব লিপিবদ্ধ নেই। ইতিহাস বলছে, ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে পুরীধাম ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন পথের যাত্রী হলেন। তাঁর সময়ের আগে পর্যন্ত বাংলায় রঙ নিয়ে দোল খেলা হত না। শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে গিয়ে রঙ খেলা দেখে অভিভূত হলেন। এরপর বাংলায় হোলি খেলার প্রচলন করেন। শ্রীচৈতন্যের পূর্বে বাংলায় হোলি বা রং খেলা না হলেও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে হোলি খেলা হত। বসন্ত সমাগমে 'হোলিকা' উৎসবের উল্লেখ আছে প্রাচীন, বেদ এবং পুরাণেও। 'নারদ পুরাণে' এবং 'ভবিষ্য পুরাণে' খুব নির্দিষ্ট করেই 'হোলিকা উৎসব'-এর উল্লেখ আছে। বিদ্যা অঞ্চলের একটি উচ্চারণ হওয়া শিলালিপিতে খ্রিস্টপূর্ব তিনশত বছর পূর্বেও হোলি উৎসব হত তার বর্ণনা পাওয়া গেছে। পরিত্রাজক আলবিরুনির ভারত ভ্রমণের যে সব পুঁথিপত্র পাওয়া গেছে তাতেও হোলি উৎসবের বর্ণনা পাওয়া গেছে। এমনকি ৭০০ শতাব্দীর রাজা হর্ষের 'রত্নাবলি' কাব্যেও হোলি উৎসবের উল্লেখ রয়েছে।

লোকপুঁথিতে রয়েছে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুরের বোন হোলিকা'র নাম অনুসারে হোলি নাম এসেছে। স্ত্রী কয়াদুর গর্ভে হিরণ্যকশিপুরের চারটি ছেলে জন্মায়। তাদের নাম অনুহাদ, সংহাদ, হ্রাদ ও প্রহাদ। ছোট ছেলে প্রহাদ ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। বিষ্ণু ছিলেন হিরণ্যকশিপুরের চরম শত্রু। দাদার আদেশে হোলিকা প্রহাদকে কোলে নিয়ে আঙনে পুড়ে মরতে গেলে, আঙনে হোলিকা মরে গেলেও প্রহাদ বেঁচে যায়। পরদিন বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুরকে হত্যা করে, তার বুকের রক্ত দিয়ে উৎসব করে, যা হোলি উৎসব নামে চলে আসছে। সর্বনাশ। সখি, ভালবাসা করে কর; সেকি, কেবলি যাতনাময়।

ঘাতন

স্বপন বিশ্বাস

ওঃ। আর পারছি না। হাত-পা-সমস্ত শরীর ক্রমশ অসাড় হয়ে যাচ্ছে। সাঁড়াশির মত শক্ত একজোড়াহাত, আমার গলাটাকে চেপে ধরেছে। আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করছি। কিন্তু না। পারছি না। শরীরটাকে কে যেন চেপে ধরে রেখেছে। আমি কি মরে যাচ্ছি। কিন্তু, মরবই বা কেন? আমার সাধ অনেক। আমি আরো দেখতে চাই, ছুঁতে চাই। তাদের স্থান কেমন বুঝতে চাই। কিন্তু, আঃ। না। আর বোধ হয় হল না।

বনাৎ করে কিছু একটা পড়ার শব্দ হলো। এবং তার সঙ্গে মনে হল বহু পুরোনো একটা মরচে ধরা দরজার পাল্লার মতো আমার দমটা হঠাৎ খুলে গেল। সারা শরীর ঘামে সপ্ সপ্ করছে। তাকিয়ে দেখি মেঝেতে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে, পার্কিঙ্কট থেকে সদ্য আনা শৌখিন কাঁচের গ্লাস দুটির একটা। জানলার ফাঁক গলে বর্ষার ফলার মতো সূর্যের আলো সোজা আমাকে বিদ্ধ করছে।

গতরাতে দো-তলায় বাড়িওয়ালার ছেলে ও ছেলে-বোয়ের চিৎকারের মতো এতটাই উচ্চস্বরে ছিল যে, ঘুমানো বড় কঠিন হয়ে যায়। তাই ঘুমের জন্য একটা স্লিপিং ট্যাবলেট খেতেই হয়েছিল। মাঝে মাঝে ফেলে আসা চিন্তা ঘুমের দরজায় জোঁড়া পোস্টারের মত উড়তে থাকে। অস্থির আমাকে আমি ঠিক রাখতে, মাঝে মাঝে এক-আধটা স্লিপিং ট্যাবলেট খেতেই হয়। সিনড্রোম দেখে মনে হচ্ছে ওষুধের প্রভাবেই এমনটা হয়েছে। মাথাটা অস্বাভাবিক খিম খিম করছে। তার ওপর কেমন ফন ফন খিম খিম ভাব। রাতে শোয়ার আগে প্রতিদিনের রুটিন, হেল্প বডিতে গ্রিন স্প্রে ও মেসাজ করতে বেশ কিছু সময় যায়। থাক, সময়ের কথা ভাবলে এ-সময়কে হারাতে হবে। নাঃ, আর শুয়ে থাকা ঠিক হবে না। নাইটিটা ঘামে ভিজ়ে গেছে। এক ঝটকায় চাদরটা সরিয়ে বাথরুমের দিকে ছুটলাম। বাথরুমেই ফেনওয়াস, টোনার, হেয়ার রিমুভার, ময়েচারেঞ্জ, গোলাপজল, সফট সাবান, ভাইব্রেটর প্রভৃতি ফ্রেন্স সরঞ্জাম ঠিক ঠিক জায়গায় আছে কিনা একবার চোখ বুলিয়ে নিই। হেনার যা স্বভাব! কোথাকার জিনিস কোথায় যে রাখে; ও

নিজে জানে না।

বাৎসর্য থেকে পুরো ফ্রেস হয়ে বার হতে, প্রায় ঘণ্টা দুয়েক লোগে যায়। সে-তুলার ওপরের চিলেকোঠার ঘরটা থেকে প্রতিদিনের মত আজও একটা চাপা কান্নার মতো ভায়োলিনের একটা সুর বাজতে থাকে। যেন সকালকে ঘুম ভাঙছে।

হেনা আর আমি শেষার করে দুজনে এ-ঘরটা ভাড়া নিয়েছি। কলেজের ছুটিতে ও বাড়ি গেছে। খারাপ লাগলেও সকালের বেড়-টিটা একা একাই যেতে হচ্ছে। ওর কথা ভাবতেই মনটা ধরাপ হয়ে গেল। কিন্তু ও তো একবারও ফোন করল না। ফোনটা ফোনটা কোথায় গেল। এদিক ওদিক তাকাই। না, কোথাও চোখে পড়ল না। তবে কী কাঁচের শাসটার মত ঘুমের ঘোরে ফোনটাকেও। সোফার নিচটা ভালো করে দেখি। না, কোথাও নেই। তবে গেল কোথায়। মনে করার চেষ্টা করি। না, মনে পড়ছে না। আলমারির ওপর থেকে ব্যাগটা নামাই। পুরোনো ফোনটা বার করে ডায়াল করি। হ্যাঁ, রিং হচ্ছে। কিন্তু আওয়াজ পাচ্ছি না তো। ঘরের কোথাও পড়ে থাকলে নিশ্চয়ই আওয়াজ পেতাম। তবে ফোনটা রিং হচ্ছে, কিন্তু কেউ ধরছে না। এবার সত্যি ভয় হল। যোনে প্রচুর ব্যক্তিগত দুহুতের ইমেজ সেত করা রয়েছে। রিং হচ্ছে, কিন্তু কেউ ধরছে না।

কাল পার্কস্ট্রিটের ঠিক কর্নারের গোটেলটার অমিত আর আমি, রাতের খাওয়াটা সারার পর, হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি পার্কস্ট্রিট মেট্রো স্টেশন। তারপর সেখান থেকে পরস্পর বিপরীতদুই ট্রেন ধরি। কিন্তু। আবার ডায়াল করলাম। একটু রিং হওয়ার পরই ফোনটা কেউ ধরল।

— হ্যালো, আপনি কে বলছেন?

— আপনি কে বলছেন? উন্টেনিক থেকে পুরুষ কণ্ঠ কেউ বলল। কেন জানি না, হঠাৎ যৈর্য হারালাম। আপনি যে ফোনটায় কথা বলছেন, সেটার মালিক বলছি।

— সেটা আপত্তি করলো কে? ওদিক থেকে দীর হির একটা কণ্ঠ ভেসে এল। গলাটা কেন্দ্র নেন একটু স্নো-চেনা মনে হল।

— বাজে কথা রাখুন। ফোনটা এখন কোথায় বলবেন?

১৬২ **৫৩২**

— আপনি কেন ধরনের মালিক? নিজের জিনিসের খবর রাখতে পারেন না। মনে হল আমাদের নিয়ে উনি একটু মজা করছেন। খুব রাগ হল। যতটা সম্ভব সামলে নিজে বললাম, প্লিজ, জায়গাটা বলবেন? নাকি, অন্য ব্যবস্থা ভাবতে হবে?

— বুঝলাম আপনার রাগ হয়েছে। কিন্তু কার ওপর রাগ হয়েছে সেটা বুঝলাম না। যাক, ওসব ছেড়ে এক প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে চলে আসুন।

— কী বললেন! যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে বললাম, কোথায়?

— আপনারা স্টেশনের কাছেই। নিরাময় ওয়ুথের দোকানে।

ওয়ুথের দোকান। মনে করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ মনে পড়েছে। স্টেশন থেকে নেমেই কয়েক পা হাঁটার পরই দোকানটা। এখানে আসার পর, প্রায়ই ওখান থেকে কিছু না কিছু ওয়ুথ কিনেছি। কালও ফেরার সময় গেলিলাম —

‘নিরাময়’। দোকানের ছেলেরা প্রায় আমাদেরই বয়েসি। ব্যবহার বেশ ভালো। অনুমানে হয়তো ও আগেই যুকেছিল। তাই দোকানে যেতেই একগাল হেসে, বিনা বাধ্য ও ফোনটা বার করে দিল। তবে আমি সত্যিই এক প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে গেলিলাম। কিন্তু না, ছেলেরা অনেক অনুরোধেও নিল না। ওর কথা এক ব্যবহার যথেষ্ট ভালো। নিজেকে খুব খেঁট মনে হল। ফোন হারানোর দুর্ভাগ্য ওকে কতগুলো বাজে কথা বলে ফেলি। কিন্তু ওর কথায় একবারও তার আভাস পেলাম না। অথচ সুন্দর ব্যবহার দিয়ে ও আমাদেরকে বোকা বানিয়ে দিল।

এভাবেই দোকানের ছেলেরা অর্থাৎ অনিমেথের সঙ্গে আলাপ হয়। তবে কেন জানি না, প্রায় ফেরার পথে ক্লাস্ট অকস্ম মনটা একবার অন্তত দোকানটাকে খুঁয়ে যেতে চাইত। অনিমেথের সুন্দর আন্তরিক ব্যবহার। নাকি স্মৃতির পাতায় ফেলে আসা কারোর সাথে মেলাতে চাইতাম, জানি না। তবে এটাও ঠিক, দোকান থেকে কোনো না কোনো ওয়ুথ কিছু আমি প্রায়নি কিনতামই। কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে যেতাম। চলমান মানুষ কেবতাম। অনিমেথের অককালেশের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে কথাও বলতাম।

একদিন ওয়ুথ চাইতেই ও বলল, দেখুন এবার কিন্তু আপনাকে প্রেসক্রিপশন দেখাতে হবে।

১৬৩ **৫৩৩**

লাগে না। যখন খুব কষ্ট হয়, কোন উপায়
র পড়ে। তবে আমি কিন্তু লো-পাওয়ারের

পশন আপনাকে করতেই হবে। নাহলে আমি

আমাকে বিপদে ফেলব না। একটা যুদু ঠান্ডা
আকাশে বিদ্যুৎ চমকচ্ছে। দোকানেও একটু
ল ভাই। আবার অন্যদিন কথা হবে —

ম। গেলাম বাড়ছে। তার মধ্যে কৌতুহলী কিছু
রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম। সময়ের সাথে
দাঁকা আর কোনটা সোজা! একটা সময় খুব
ভয়ে গুটিয়ে রাখতাম। সুযোগ সন্ধানে থাকা
ক, মনে হত এক ছুটে নিরাপদ কোন দূরত্বে
অনেক জন বয়ে গেছে। সমস্যা ও বিপন্নতায়
জ বুঝেছি ঐ ইন্দিবাহী চোখের রোগটা
ই। ঐ চোখগুলোকে জদ করতে শরীরের
রলেস হতে দিই।

সঙ্গে ছড়মুড় করে সব উঠতে লাগল। এক
তম সাইজের খিস্তি খেউড় ও কামরার এপ্রান্ত
সহস্র দম বন্ধকরা এক মুহূর্ত। জীবনে সেই
গেছিলাম। কিন্তু ফেরার পথে ট্রেনের মধ্যে
পয়ে, এক অস্বাভাবিক চাপাচাপি এবং নানা
ম। এরই মাঝখানে হঠাৎ লক্ষ করলাম,
নিদ্রা চাপাচাপির হাত থেকে আমাকে সেক
শে মুখের বিপর্যস্ত আদল দেখে ওর চোখে
ক ধরনের মামতা এবং রাগ। তারপর আমার
ক পাতলা ভাষায় বলল, 'কী হল কাকবাবুরা,
যায়ে গা না ঘষলে ঠিক মজাটা জমে না, কী

বলেন? ওর হল ফোটানো কথায় হঠাৎ দেখলাম, অস্বাভাবিক চাপটা একটু বেন
পাতলা হল। এভাবেই ঐ মেয়েটি অর্থাৎ হেনার সাথে পরিচয়। ও জানালিজম
নিয়ে পড়ছে। বড়লোক বাপের আদুরে শিক্ষিতা মেয়ে। কথায় কথায় পরিচয়ে
জনলাম, আমাদের পাশের গ্রামেই ওর বাড়ি। ছুটিতে বাড়ি ফিরছে। পড়াশুনার
জন্য যাদবপুরে একটি মেসে পেইংস্টেট হিসাবে থাকে।

পাকা রাস্তা ছেড়ে দুজনে কাঁচা রাস্তায় নেমে পড়লাম। যেটা সোজা আমাদের
গ্রামটাকে সিঁথির মত দু'ভাগ করে নিয়ে দক্ষিণ দিকে বেকে গেছে। পথ চলতে
চলতেই আমার জড়তা কাটবার চেষ্টা চালিয়ে গেল হেনা। বয়সে আমার থেকে
ও অনেক ছোটো। তবে আলাপ ও ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরে পরে বুঝেছি, অভিজ্ঞতায়
ও আমার থেকে অনেক বড়ো। বহু রোগে জর্জরিত, সংসারে একমাত্র অর্থ
উপার্জনকারী মানুষ ছিল আমার বাবা। কিন্তু বিনা নোটিশে তিনিও একদিন চলে
গেলেন। একেই পাতলা শরীর। তার ওপর অন্ধকার আর আমার গায়ের রং
কেউ পার্থক্য করতে পারে না। সংসারে নুন আনতে পাস্তা ফুরিয়ে যায়! সেই
সংসারের জন্য অর্থ জমিয়ে যাওয়া বাবার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে বিয়েটাও
আর এগোল না। সংসারে এই মুহূর্তে বৃদ্ধা মা আর আমি। চাকরির আশায় শহরে
আয়া সেন্টারে নাম লেখাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সব দেখে-শুনে বুঝলাম
জটিলতা এখানেও কম নেই। তবুও এক সহায় ব্যক্তি সামনের মাস পড়ার
কয়েকটিদিন আগে দেখা করতে বললেন। অগ্রহায়ণের শেষ। ঠাণ্ডার দাপট বেশ
বেড়েছে। আমাদের ট্রেনটা বেন কুয়াশা ভেদ করে বেরিয়ে এল। ভোরের
দ্বিতীয় এই ট্রেনটাকে অনেকে 'বি-ট্রেন' বলে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে এই ট্রেনে
চেপেই বেশিরভাগ বি-সাপ্লাই হয়। তাই আমিও একজন আয়ার মর্যাদা নিয়ে
চুকে, যিয়ের সমস্ত কাজে পারদর্শী হয়ে উঠলাম। তাই দিনে দিনে এই ট্রেনটাও
একদিন আমার একান্ত আপন হয়ে গেল। তবে সেটাও আমার জীবনে বেশিদিন
স্থায়ী হলো না। নিঃশব্দে বেলা চলে যাওয়ার মত বয়সে এসে নিখিলের সঙ্গে
দেখা হয়ে গেল। অল্পদিনেই সম্পর্ক গাঢ় থেকে গাঢ়তর হলো। তারপর
বিপন্নবোলের কথা ভেবে একদিন ওকে বিয়ের কথা বলি। বেলা চলে যায়, কিন্তু
ও দেখেও দেখলো না, শুনেও শুনলো না! আমি অনেক আশায় ওর হাত দুটো
চেপে ধরি। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই দেখলাম, নিখিল জনারণ্যে হারিয়ে গেল।

